উনিশ-বিশ শতকে ঢাকার জমিদার বাড়ির ধরণ ও অলংকরণঃ দেশজ ও ইউরোপীয় উপাদান

গবেষক

মোঃ মাসুদ রানা খান

রেজিস্ট্রেশন নং-৭৩

সেশন - ২০০৯-২০১০

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক

ড. নাজমা বেগম

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

467334

Dhak University Library

467334

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ফেব্রুয়ারী-২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার পত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, "উনিশ-বিশ শতকে ঢাকার জমিদারবাড়ির ধরণ ও অলংকরণ: দেশজ ও ইউরোপীয় উপাদান" শিরোনামের এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব রচনা। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য প্রণীত। আমার জানামতে, পূর্বে এ শিরোনামে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। অভিসন্দর্ভটি অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্য জমা দেয়া হয়নি, অথবা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে এর কোন অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হয় নি।

.02.2014

মোঃ মাসুদ রানা খান
রেজিস্ট্রেশন নং - ৭৩
সেশন - ২০০৯-২০১০
পিএইচ ডি গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

467334
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, মোঃ মাসুদ রানা খান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিসেবে পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য আমার তত্ত্বাবধানে "উনিশ-বিশ শতকে ঢাকার জমিদার বাড়ির ধরণ ও অলংকরণ: দেশজ ও ইউরোপীয় উপাদান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রনয়ণ করেছেন। গবেষণাটি মৌলিক তথ্যের ভিত্তিতে, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে রচিত। আমি সম্পূর্ণ পান্ডুলিপিটি পাঠ করেছি এবং পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার সুপারিশ করছি।

Najma Begum 01.02.2014

ড. নাজমা বেগম

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক।

467334

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
অঙ্গীকার পত্র	i
প্রত্যয়ন পত্র	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iv-v
ভূমি নকশার তালিকা	vi
আলোক চিত্রের তালিকা	vii-x
মানচিত্র	xi-xiii
প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা	১-১৩
দ্বিতীয় অধ্যায় : উনিশ বিশ শতকে ঢাকার রাজনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশেস্নষন	১৪-৩৫
তৃতীয় অধ্যায় : উনিশ বিশ শতকে ঢাকার জমিদারবাড়ী সমূহের ধরণ ও স্থাপত্যিক বিশেস্নষন	৩৬-১৫১
চর্তুথ অধ্যায় : জমিদার স্থাপত্য সমূহের অলংকরণ	১৫২-১৬৮
পঞ্চম অধ্যায় : উপসংহার	১৬৯-১৭৬
গ্রন্থপঞ্জি	১৭৭-১৯৬
পরিশিষ্ট-১ : স্থাপত্য পরিভাষা	১৯৭-২০৬
পরিশিষ্ট-২ : জমিদারবাড়ির তালিকা	২০৭-২০৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণা কর্মটি আমার দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. নাজমা বেগমের সদয় নির্দেশনাধীনে এবং সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে আমার এই গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। তথ্য- উপাত্ত সংগ্রহ থেকে শুরু করে তার বিশ্লেষন্ পর্যন্ত গবেষণার প্রতিটি স্তরেই তিনি আমাকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এই অভিসন্দর্ভের প্রতিটি পৃষ্ঠা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করেছেন এমনকি প্রয়োজনীয় বই-পত্র কোথায় পেতে পারি তাও জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর উৎসাহ উপদেশ এবং অনুপ্রেরণা ব্যতীত এ সুদীর্ঘ এবং জটিল গবেষণা সমাপ্ত করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। কৃতজ্ঞচিত্তে আমি তাঁর কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণের কথা স্মরণ করছি। স্থাপত্য নিয়ে গবেষণা অত্যন্ত দুরুহ। কেননা শুধু তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ নয়, এর জন্য প্রয়োজন বাস্তব পর্যবেক্ষনমূলক জ্ঞানের। এই জ্ঞান আহরণের জন্য আমাকে যেতে হয়েছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। আর এই দুঃসাধ্য কাজটি সম্পদনে যে শুভানুরাগী আমাকে সহায়তা করেছেন, বিশেষ করে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নকশাবিদ জিয়াউল হায়দার। তিনি আমার সাথে প্রতিটি ইমারত পর্যবেক্ষণ করে সঠিক মাপ গ্রহণ করে সবগুলি ভূমি নকশা অত্যন্ত যত্নসহকারে সম্পাদন করায় জিয়া ভাই সহ তাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. তৌফিকুল হায়দার সহ বিভাগের সকল শিক্ষক বিশেষ করে ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, প্রফেসর ড. মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূইয়া, প্রফেসর আতাউর রহমান বিশ্বাস, প্রফেসর ড. আব্দুল বাছির, খাদেমুল হক, নুসরাত ফাতেমা ও সুরাইয়া আক্তার বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। গবেষণা কর্মটি সম্পদন করার জন্য যে সকল গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার এবং বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে দিয়ে তারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার ও এম আর তরফদার স্মৃতি জাদুঘরের সংগ্রহশালা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার। উক্ত গ্রন্থাগারের কর্মচারীরা আমাকে নানা ভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বিভাগের সকল কর্মচারী বিশেষ করে কবির আহমেদ, ছরোয়ার আহমেদ ও সাজেদা সব সময় এ ব্যাপারে আমাকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা দিয়েছেন। এছাড়া শিল্পকলা একাডেমী গ্রন্থাগার, সুফিয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অফ বাংলাদেশ ষ্টাডিজ (আইবিএস) গ্রন্থাগার এবং বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস গ্রন্থাগার থেকেও সহায়তা নিয়েছি।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আমাকে অর্থায়ন করায় আমি তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।পূর্ণকালীন গবেষণার জন্য প্রেষণ মঞ্জুর করায় শিক্ষামন্ত্রণালয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

ব্যাক্তিগত ভাবে যাদের সহযোগিতা আমার গবেষণার পথকে সুগম করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে জনাব মুহাম্মদ মাসুম আলী খান মজলিস, প্রফেসর আবুয়াল ইসলাম, অধ্যক্ষ নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজ, বড় ভাই ড. আসাদুজ্জামান খান মজলিশ, এ.কে.এম মাহবুবুল হক, ফজলে রাব্বি, কে.এম.এ.এম সোহেল, আশরাফুল কবির হেলাল, মোঃ শাহজাহান, বাবু আহমেদ, মাহমুদ ভাই, বন্ধু আসাদুজ্জামান আসাদ, নাসির উদ্দিন গনি, মাহমুদা খানম, ছোট ভাই জাকির, শামীম, রনি, গালিব, জাকির মন্ডল, হেদায়েত, সোহেল, মিজান, শাকিল, নাসির, জাহাঙ্গীর এবং সাঈদ। অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন আমার বন্ধু নাজলী চৌধুরী। তাঁর ঋণ শোধ হবার নয়। এই অভিসন্দর্ভ কম্পিউটার কম্পোজ করে দিয়েছে ড্রীমল্যান্ড কম্পিউটার এর রাজু ভাই, সেজন্য তার প্রতিও আমার ঋণ অসামান্য।

আমার কন্যা রিউনা রাইসিয়ান এ গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে; আমি তাকে সবিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আরো একজনের কথা হয়তো বলা উচিত ছিলো- আমার স্ত্রী কানিজ ফাতেমা ছন্দা, নিজের শত ব্যস্ততার মধ্যেও রাতের পর রাত জেগে এই অভিসন্দর্ভের যে কোন বিষয়ে সংশয় হলে সব সময় সহযোগিতা পেয়েছি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এমন, তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো যায় না।

মোঃ মাসুদ রানা খান
পিএইচ ডি গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি নকশার তালিকা (নির্বাচিত)

১. রূপলাল হাউজ,ঢাকা

২. ভাওয়াল রাজ প্রাসাদ,গাজীপুর

৩. মুরাপাড়া জমিদারবাড়ি, নারায়ণগঞ্জ

৪. তেঁওতা প্রাসাদ, মানিকগঞ্জ

৫. কাশিনাথ ভবন,নারায়ণগঞ্জ

৬. বালিয়াটি জমিদারবাড়ি,মানিকগঞ্জ

৭. মুরাপাড়া জমিদারবাড়ি মন্দির, নারায়ণগঞ্জ

৮. তেঁওতা নবরত্ন মন্দির, মানিকগঞ্জ

৯. রোজগার্ডেন,ঢাকা

১০. আহসান মঞ্জিল,ঢাকা

১১. বলধা জমিদারবাড়ি, গাজীপুর

১২. পুবাইল চৌধুরী বাড়ি, গাজীপুর

১৩. কাশিমপুর জমিদার প্রাসাদ,গাজীপুর

১৪. বলিয়াদি জমিদারবাড়ি,গাজীপুর

১৫. শ্রীফলতলী জমিদারবাড়ি,গাজীপুর

১৬. পানাম প্রাসাদ (৩নং বাড়ি), নারায়ণগঞ্জ

১৭. রাধারমন রায়ের বাড়ি, ঢাকা

১৮. জজবাড়ি, ঢাকা

১৯. যদুনাথ প্রাসাদ, মুন্সীগঞ্জ

Dhaka University Institutional Repository

আলোক চিত্রের তালিকা

১. রূপলাল হাউজের অঙ্গণের উপর থেকে উঠানো, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।

২. রূপলাল হাউজ, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।

৩. কাঠের ব্যালাসট্রেড সিঁড়ি, রূপলাল হাউজ, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।

৪. ভাওয়াল রাজবাড়ি সম্মুখদৃশ্য, গাজীপুর।

৫. ভাওয়াল রাজবাড়ি, পশ্চাৎভাগ, গাজীপুর।

৬. ভাওয়াল রাজবাড়ি, রানীমহলের একাংশ, গাজীপুর।

৭. ভাওয়াল রাজবাড়ি, খিলান বারান্দা, গাজীপুর।

৮. মুরাপাড়া জমিদারবাড়ী, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

৯. মুরাপাড়া জমিদারবাড়ী, অভ্যন্তরীন মন্দির, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

১০. মুরাপাড়া জমিদারবাড়ী, অন্দরমহল, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

১১. সিংহ দুয়ার, মুরাপাড়া জমিদারবাড়ী, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

১২. তেওতাঁ প্রাসাদ, শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

১৩. তেওতাঁ প্রাসাদ, শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

১৪. ধ্বংসপ্রায় অভ্যন্তরীণ মন্দির, তওতাঁ প্রাসাদ, শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

১৫. কাশীনাথ ভবন (৩৩নং বাড়ি), সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ।

১৬. কাশীনাথ ভবন (৩৩নং বাড়ি), সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ।

১৭. বালিয়াটি জমিদারবাড়ির অমলক ভিত্তি, মানিকগঞ্জ।

১৮. বালিয়াটি জমিদারবাড়ির উচুঁ ভিত্তি, মানিকগঞ্জ।

১৯. বালিয়াটি জমিদারবাড়ির সম্মুখ দৃশ্য, মানিকগঞ্জ।

২০. cast-iron এর অলংকরণ, বালিয়াটি জমিদারবাড়ি, মানিকগঞ্জ।

২১. মুরাপাড়া জমিদারবাড়ী (ইট নির্মিত) মন্দির, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

২২. মুরাপাড়া জমিদারবাড়ী (ইট নির্মিত) মন্দির, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

২৩. মুরাপাড়া জমিদারবাড়ী (বেলে পাথর নির্মিত) মন্দির, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. মুরাপাড়া জমিদারবাড়ী (বেলে পাথর নির্মিত) মন্দির, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

২৫. মুরাপাড়া জমিদারবাড়ী (বেলে পাথর নির্মিত) মন্দিরে প্যানেল নকশা, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

২৬. মুরাপাড়া জমিদারবাড়ী (বেলে পাথর নির্মিত) মন্দিরের চূড়া, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

২৭. তেওতাঁ নবরত্ন মন্দির, শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

২৮. তেওতাঁ নবরত্ন মন্দির, শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

২৯. ধ্বংসপ্রায় গরুড় মূর্তিও নকশা, তেওতাঁ নবরত্ন মন্দির, শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

৩০. রোজ গার্ডেনের সম্মুখ দৃশ্য, টিকাটুলী, ঢাকা।

৩১. খিলানের উপরে স্টাকো নকশা, রোজগার্ডেন, টিকাটুলী, ঢাকা।

৩২. আহসান মঞ্জিল, ইসলামপুর, ঢাকা।

৩৩. আহসান মঞ্জিল, ইসলামপুর, ঢাকা।

৩৪. আহসান মঞ্জিল, ইসলামপুর, ঢাকা।

৩৫. বলধার জমিদারবাড়ি খিলান বারান্দা ও কড়ি-বর্গারীতির ছাদ, গাজীপুর।

৩৬. পূর্বাইল চৌধুরী বাড়ি কাছারি ভবন, পূর্বদিকের দৃশ্য, গাজীপুর।

৩৭. পূর্বাইল চৌধুরী বাড়ি বৈঠকখানা, গাজীপুর।

৩৮. ধ্বংসপ্রায় পূবাইল চৌধুরী বাড়ি রংমহল, গাজীপুর।

৩৯. পূবাইল চৌধুরী বাড়ি অন্দরমহলের দক্ষিণ দিকের দৃশ্য, গাজীপুর।

৪০. কাশিমপুর জমিদার প্রাসাদ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

৪১. কাশিমপুর জমিদার প্রাসাদের পূর্বদিকের দৃশ্য, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

৪২. কাশিমপুর জমিদারদের অন্দর মহলের স্টাকো অলংকরণ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

৪৩. কাশিমপুর জমিদার বাড়ির রংমহল, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

৪৪. কাশিমপুর জমিদার বাড়ি প্রবেশ তোরণ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

৪৫. বলিয়াদি জমিদার প্রাসাদ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

৪৬. বলিয়াদি জমিদার বাড়ির কাছারি ভবন (ক), গাজীপুর।

৪৭. বলিয়াদি জমিদার বাড়ির কাছারি ভবন (খ), গাজীপুর।

৪৮. বলিয়াদি জমিদার বাড়ির কাছারি ভবন (গ), গাজীপুর।

৪৯. বলিয়াদি জমিদার বাড়ির গম্বুজ,গাজীপুর।

৫০. শ্রীফলতলী জমিদার প্রাসাদ (ক) এর ফাসাদ, কালিয়াকৈ, গাজীপুর।

৫১. শ্রীফলতলী জমিদার প্রাসাদ (খ) কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

৫২. শ্রীফলতলী জমিদারবাড়ির কাছারি ভবন (ক) কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

৫৩. শ্রীফলতলী জমিদারবাড়ির কাছারি ভবন (খ) কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

৫৪. শ্রীফলতলী জমিদারবাড়ির কাছারি ভবন (গ) কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

৫৫. শ্রীফলতলী জমিদারবাড়ির অন্দর মহল, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

৫৬. শ্রীফলতলী জমিদারবাড়ির প্রবেশ তোরণ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

৫৭. পানাম প্রাসাদ (৩নং বাড়ি), সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ।

৫৮. পানাম প্রাসাদ (৩নং বাড়ি), সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ।

৫৯. রাধারমন রায়ের বাড়ি, কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

৬০. রাধারমন রায়ের বাড়ি, কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

৬১. রাধারমন রায়ের বাড়ি, কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

৬২. করন্থিয় স্তম্ভ, রাধারমন রায়ের বাড়ি, কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

৬৩. জজবাড়ি, কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

৬৪. জজবাড়ি, কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

৬৫. পেডিমেন্ট, জজবাড়ি, কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

৬৬. যদুনাথ প্রাসাদ, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।

৬৭. যদুনাথ প্রাসাদ (রাজলক্ষী মন্দির), শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।

৬৮. তুসকান স্তম্ভের উপরে উল্টানো কলস ও অমলক এর ব্যবহার, যদুনাথ প্রাসাদ, মুন্সিগঞ্জ।

৬৯. স্তম্ভ ভিত্তিতে কলস এর ব্যবহার, রাধারমন রায়ের বাড়ি, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

৭০. স্তম্ভ ভিত্তিতে কলস ও অমলক এর ব্যবহার, রোজগার্ডেন, ঢাকা।

৭১. স্তম্ভ ভিত্তিতে কলস ও অমলক এর ব্যবহার, বালিয়াটি প্রাসাদ, মানিকগঞ্জ।

৭২. উচ্চ স্তম্ভ ভিত্তি, বালিয়াটি প্রাসাদ, মানিকগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

৭৩. খিলানের কি স্টোনে মুকুট ও সিংহের মুখাবরয় উপনিবেশিক শাসনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, রাধারমন রায়ের বাড়ী, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

৭৪. আনারসসহ দেশজ উদ্ভিদের উপস্থাপন, ঠাকুর দালান, মুরাপাড়া, জমিদারবাড়ি, নারায়নগগঞ্জ।

৭৫. উঁচু ড্রামের উপর শিরাল গম্বুজ, আহসান মঞ্জিল, ঢাকা।

৭৬. সরু স্তম্ভের গম্বুজ, রোজগার্ডেন, ঢাকা।

৭৭. ভিত্তি ভূমিতে বদ্ধ খিলানের ব্যবহার, আহসান মঞ্জিল, ঢাকা।

৭৮. বন্ধনী বা ব্রাকেট, শ্রীফলতলী জমিদারবাড়ী, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

৭৯. পেডিমেন্ট, মুরাপাড়া জমিদারবাড়ী, নারায়নগঞ্জ।

৮০. মুকুট বা তাজ নকশা পেডিমেন্ট, বালিয়াটি জমিদার বাড়ী, মানিকগঞ্জ।

৮১. কর্ণারে চতুস্কোনাকার স্তম্ভে ইটের উদগত অনুপ্রবিষ্ট নকশা, আহসান মঞ্জিল, ঢাকা।

৮২. ডেনটিল ও মোল্ডিং নকশা, মুরাপাড়া জমিদারবাড়ী, নারায়নগঞ্জ।

৮৩. লতানো নকশার মাঝে উৎকীর্ণ পরির প্রতিকৃতি, বালিয়াটি, মানিকগঞ্জ।

৮৪. সূর্যের আলো ও বৃষ্টির ছাট নিরোধক, যদুনাথ প্রাসাদ, মুন্সিগঞ্জ।

৮৫. উদ্ভীজ নকশাকৃত লোহার দরজা, মুরাপাড়া জমিদারবাড়ি, নারায়নগঞ্জ।

৮৬. ফ্যানলাইটে কাষ্ট আয়রনের ফ্রেম, মুরাপাড়া জমিদার বাড়ী, নারায়নগঞ্জ।

৮৭. লোহার লাইট পোস্ট, আহসান মঞ্জিল, ঢাকা।

৮৮. ভাস্কর্য, রোজগার্ডেন, ঢাকা।

৮৯. প্রবেশ তোরণের উপরে সিংহ প্রতিকৃতি, বালিয়াটি প্রাসাদ, মানিকগঞ্জ।

৯০. ট্যাবলেট অলংকরণ, রোজগার্ডেন, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র

ঢাকা জিলার মানচিত্র: ১৮৮২-১৯২১

Dhaka District 1882-1921

সৌজন্যে: Yatindra/ Jatindra Mohan Roy *Dhakar Itihas* [History of Dhaka]. rpt. (Kolkata: Shaibya Prakashani, 2000).

মানচিত্রে উনিশ-বিশ শতকে ঢাকা অবস্থান

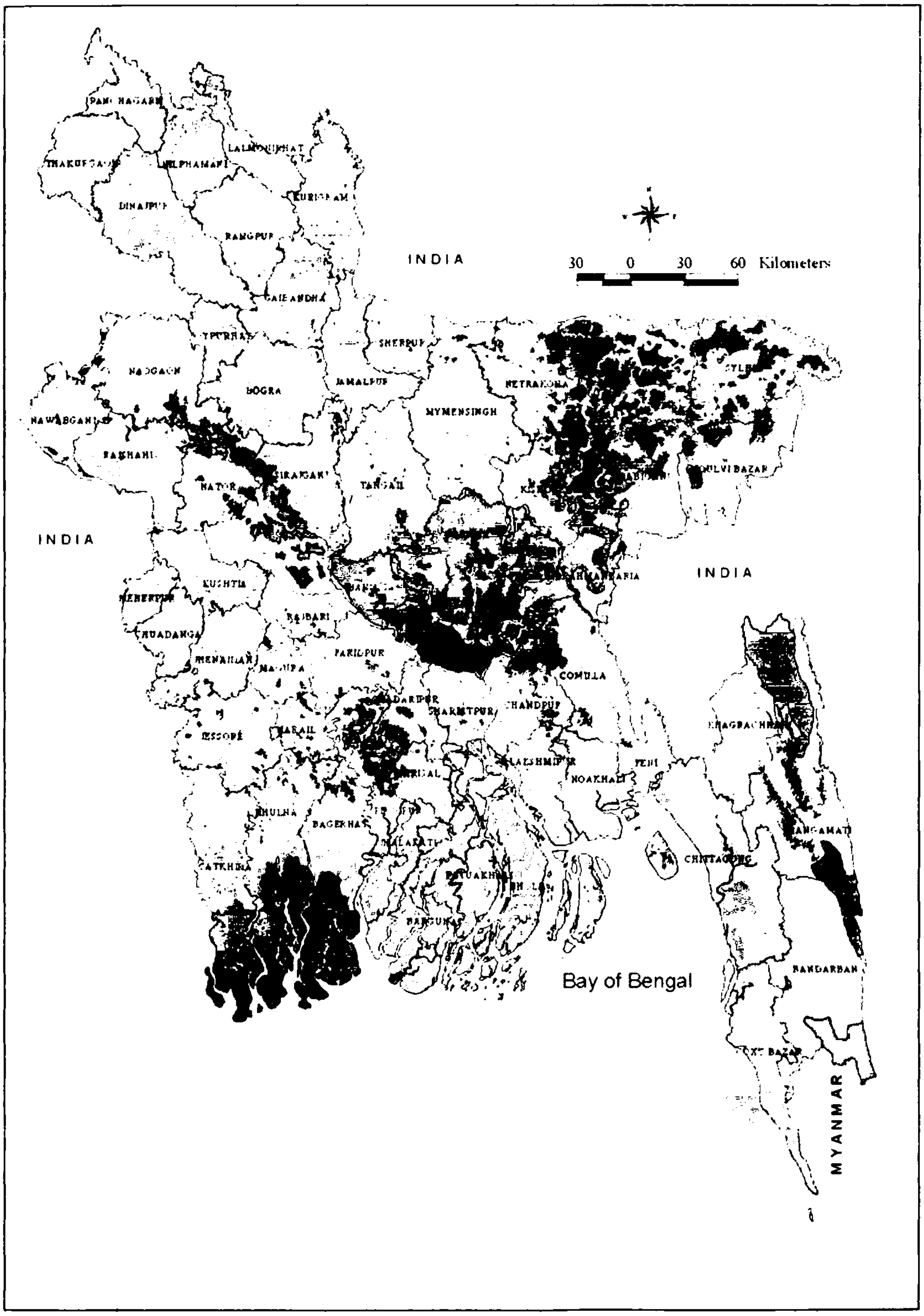

মানচিত্রে উনিশ-বিশ শতকে ঢাকার জমিদার বাড়ির অবস্থান

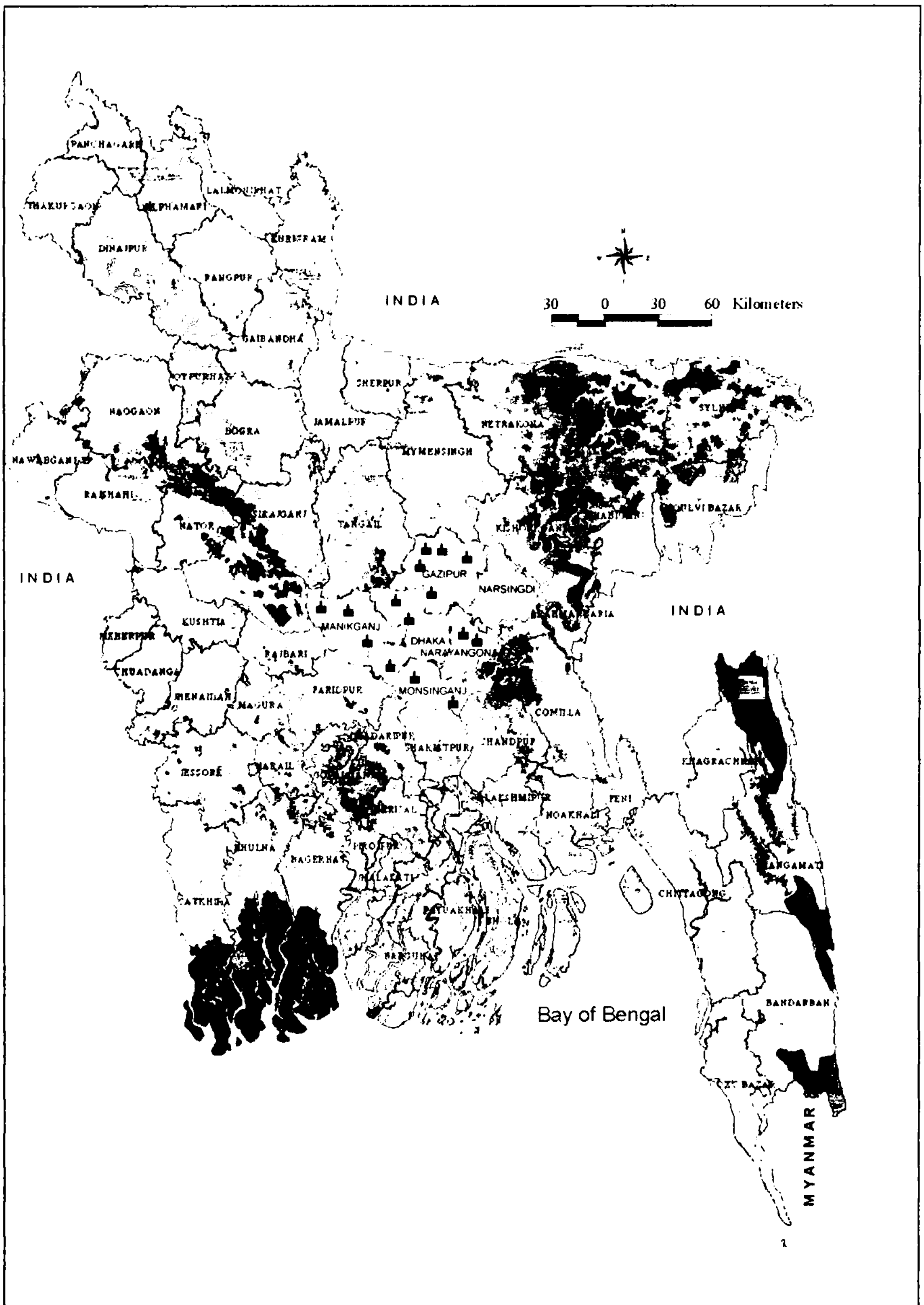

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

বাংলার ইতিহাসে উনিশ-বিশ শতক এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়ে বাংলার সংস্কৃতিতে চলছিল এক রূপান্তর প্রক্রিয়া- বাংলার হাজার বছর ধরে চর্চিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে ইউরোপীয় ঐতিহ্যের মিথস্ক্রিয়ায় বদলে যাচ্ছিল বাংলার সংস্কৃতি। ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠির নৈকট্য লাভ, কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের সন্তুষ্ট করতেও বাংলার জমিদার শ্রেণি তাদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করতো। সেই সূত্রে, তাদের হাত ধরেই বাংলার সংস্কৃতিতে ঢুকে পড়ছিল ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণার প্রভাব। এই পরিবর্তনের স্বাক্ষী হয়ে আছে উপর্যুক্ত সময়ের স্থাপত্য, বিশেষ করে জমিদার বাড়িগুলো।

উনিশ শতকে অবিভক্ত বাংলার রাজধানী হিসেবে কলকাতা যদিও ছিল বাংলার সমস্ত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, তবে ঢাকার গুরুত্বও কোনো অংশে কম ছিল না। ঢাকা ও এর আশপাশের বড় বড় জমিদার পরিবারগুলো এই সময়েই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত রায়তদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়কারী একটি বৈধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলার জমিদারি প্রথা অত্যন্ত প্রাচীন। বাংলায় মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এই প্রথার সাথে জড়িত শ্রেণি সাধারণত ছিল সামন্ত শ্রেণির ব্যক্তিরা, 'ভূঁইয়া', 'বিষয়ী', 'চৌধুরী', 'মণ্ডল' বা 'মুকাদ্দাম' ইত্যাদি নামে তাঁরা পরিচিত হলেও মুসলিম শাসনামলে বিশেষ করে মোগল আমলে তারা ফার্সি নামকরণ যমিন্দার হিসেবে অভিহিত হতে থাকেন। 'যমিন্দার' শব্দেরই অপভ্রংশ হলো জমিদার। পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসনামলে বর্তমান ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অবশেষে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলে এদেশের জমিদাররা জমির স্থায়ী মালিকানা স্বত্ব লাভ করেন। ১৯৫০ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার জমিদাররা এদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তারাই ছিলেন সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং সাধারণ প্রজাবর্গের দৃষ্টিতে সরকারের নিকট জনপ্রতিনিধি স্বরূপ। এসব জমিদারের অনেকেই স্বীয় জমিদারি এলাকায় সুশাসন ও প্রজা কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে জনগণের নিকট যেমন শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করেছেন, তেমনি

Dhaka University Institutional Repository

অনেকেই আবার স্বীয় অনৈতিক কার্যকলাপ ও প্রজাপীড়নের কারণে এদেশবাসীর নিকট অত্যাচারী জমিদার হিসেবে কুখ্যাত হয়েছেন।

ফারসি 'যমীন্দার' শব্দের বাংলা অপভ্রংশ হলো 'জমিদার'। 'জমীন্' শব্দের অর্থ 'ভূমি' এবং 'দার' শব্দের অর্থ হলো 'ধারণকারী', 'অধিকারী','রক্ষক' বা 'মালিক' কিন্তু স্থায়ী স্বত্বাধিকারী নয়। সুতরাং আভিধানিক অর্থে 'জমিদার' বলতে বোঝায় ভূমির মালিক ভূপতি বা ভূম্যধিকারী। তবে বাংলার জমিদারদের ক্ষেত্রে ফারসি 'যমীনদার' শব্দটি ভূমির রক্ষণাবেক্ষণকারী অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা মোগল আমলে সুবা বাংলার জমিদাররা ভূমির প্রকৃত মালিক বা স্বত্বাধিকারী ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন কেবল নির্দিষ্ট ভূসম্পত্তির রাজস্ব আদায়কারী বা রাজস্ব আদায়ের স্বত্বাধিকারী।[১]

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স প্রাচ্য দেশীয় কতকগুলো পরিভাষার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জমিদারের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, জমিদার হলেন মুহাম্মাদান সরকারের (মুসলিম প্রশাসনের) অধীনস্থ এমন একজন কর্মকর্তা যিনি একটি জেলার (পরগনা বা মহল) ভূমি তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত হন, তিনি তাঁর এলাকার কৃষকদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং তাঁদের কাছ থেকে উৎপাদনের একটি অংশ নগদ অর্থ কিংবা পণ্য আদায় করে সরকারের নিকট প্রেরণ করেন, বিনিময়ে তিনি সরকারের কাছ থেকে শতকরা দশ ভাগ কমিশনপ্রাপ্ত হন এবং কখনো কখনো জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি *নান-কর* (নিষ্কর ভূমি) হিসেবে কয়েকটি গ্রামের ভূমি বন্দোবস্ত লাভ করেন। তাঁর (জমিদার) উপর অর্পিত ভূমির তিনি প্রকৃত মালিক ছিলেন না। উইলকিন্স আরো বলেন, তাঁদের (জমিদারদের) নিযুক্তিপত্র কখনো কখনো নবায়ন করা হতো এবং এই নিযুক্তি শাসনকর্তার সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে বংশপরম্পরায় চলতো।[২]

---

১. শিরীণ আখতার, "নবাবি আমলে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমিভিত্তিক সমাজ", সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, ***বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১৭০৪-১৯৭১**, ৩য় খণ্ড, গ্রন্থে সংকলিত (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০০), পৃ ৩০-৩১; সিরাজুল ইসলাম এবং শিরীন আখতার, জমিদার, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাপিডিয়া, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৪৫৮ (পরবর্তীতে *বাংলাপিডিয়া*, ৩য় খণ্ড রূপে উল্লিখিত)।

২. ১৮১৩ সালে Fifth Report এর Appendix এ চার্লস উইলকিন্স Oriental terms এর একটি Glossary সংকলন করেছেন, সেখানে তিনি জমিদারদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন: দ্রষ্টব্য- Anil Chandra Banarjee, *The Agrarian System of Bengal,* vol-1 (Culcutta : K.P. Bagchi & Company, 1980) pp.19-20.

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার নায়েব নাজিম মুহাম্মদ রেজা খানের বর্ণনা মতে, জমিদার এবং তালুকদাররা ছিলেন ভূমির বংশগত মালিক, সরকার সমীপে নির্ধারিত রাজস্ব প্রেরণে ব্যর্থ হলে তাঁরা সাময়িকভাবে বরখাস্ত হতেন এবং তাঁদের জমিদারি এস্টেট সরকারি কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হতো কিন্তু তাঁরা স্থায়ীভাবে জমিদারি থেকে উচ্ছেদ হতেন না।[১] এসব তথ্য দ্বারা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, মোগল আমলের রাজস্ব ব্যবস্থায় 'জমিদারদের' কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা ছিল না। তবে সরকারি তালিকায় একজন জমিদারকে চিহ্নিত করা হয় সরকারি রাজস্ব আদায়কার্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা হিসেবে।[২] মোগল আমলের প্রাথমিক পর্যায়ে জমিদারি বন্দোবস্তে কোন সনদ ব্যবহার করা হতো কি না সে সম্পর্কে আইন-ই-আকবরিতে কোন তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমনকি জন সোরও আকবরের রাজত্বকালে ভূমি বন্দোবস্তে সনদ প্রদানের কোন তথ্য দিতে পারেননি।[৩] কিন্তু আকবরের আমলে জমিদারি ব্যবস্থায় সনদ প্রদান করা না হলেও পরবর্তীতে যে এর প্রবর্তন হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই ।[৪] ফলে মোগল শাসনামলে জমিদারি প্রথা দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যথা- (ক) সনদ ও (খ) প্রথা। জমিদারি বন্দোবস্ত দেয়া হতো সনদের মাধ্যমে এবং প্রথানুযায়ী এটি ছিল বংশগত।[৫] ব্রিটিশ শাসনামলে প্রবর্তিত ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে বাংলার জমিদাররা ভূমির স্থায়ী স্বত্বাধিকারী বা মালিক ছিলেন না বটে, কিন্তু সরকারকে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে বংশপরম্পরায় জমিদারি ভোগ-দখলেরও কোন ব্যাঘাত ঘটতো না। গুরুতর কোন অপরাধ না করলে সাধারণত কোন জমিদারকে তাঁর জমিদারি থেকে উচ্ছেদ করা হতো না। প্রকৃতপক্ষে মোগল আমলে জমিদারি স্বত্ব ক্রমান্বয়ে ব্যক্তিগত সম্পদেই পরিণত হয় জমিদারি স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয় কিংবা ইজারাদানে সরকারিভাবে কোন বাধা-নিষেধ আরোপিত ছিল না।[৬] তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব পর্যন্ত জমিদারদের ভূসম্পত্তির উপর স্থায়ী মালিকানা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ছিল না ।[৭]

---

১. *Ibid*, pp.20-21. হুগলীর কানুনগো কৃপারাম সিনহা মোগল রাজস্ব ব্যবস্থায় জমিদারদের অবস্থান সম্পর্কে ঠিক একই ধরনের বর্ণনা দিয়েছেন। Narendra Krishna Sinha, *The Economic Hisory of Bengal*, Vol-11 (Culcutta : Firma K.L. Mukhopadhayay, 1962),PP.4-5.

২. শিরীণ আখতার, "নবাবি আমলে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমিভিত্তিক সমাজ", *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩১।

৩. Anil Chandra Banerjee, *op.cit.*, p.17.

৪. ১৭৩৫ ও ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী জমিদার (নাটোর) রাজা রামকান্তকে প্রদত্ত সনদ তার দৃষ্টান্ত; শিরীন আখতার, "নবাবি আমলে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমিভিত্তিক সমাজ" *পূর্বোক্ত*. পৃ. ৩০।

৫. Anil Chandra Banerjee, *op.cit.*, pp.25-27.

৬. *Ibid.*, p.26

৭. Bankim Chandra Ray, *The Bengal Zamindars* (Calcutta : Backland Press, 1904), p.2.

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় রায়ত বা সাধারণ কৃষক ছিল ভূমির ভোগদখলকারী, জমিদারগণ ছিলেন রাষ্ট্রের অধীনস্থ ভূমি রাজস্ব আদায়কারী এবং রাষ্ট্র ছিল ভূমির প্রকৃত মালিক। পক্ষান্তরে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী জমিদাররা হন ভূমির প্রকৃত মালিক বা স্বত্বাধিকারী। এর ফলে জমিদাররা ইচ্ছামত তাঁদের জমিদারি ভূসম্পত্তি সরকারের কোন অনুমোদন ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর বা বন্ধক দেয়ার অধিকার লাভ করেন।[১] 'জমিদার' পদবি দ্বারা এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হতো যিনি খালসা বা রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক বন্দোবস্তকৃত একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী হয়ে উক্ত ভূখণ্ডের রাষ্ট্র নির্ধারিত রাজস্ব রায়তদের কাছ থেকে আদায় করে সরকার প্রধানের নিকট প্রেরণ করতেন।[২] অর্থাৎ 'জমিদারি' ছিল রাষ্ট্রীয় রাজস্ব আদায়ের একটি বৈধ প্রতিষ্ঠান এবং জমিদার ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত একজন তত্ত্বাবধায়ক বা মালিক। আরো ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে জমিদার ছিলেন সরকার ও সাধারণ প্রজাদের মাঝে ভূসম্পত্তির উপর অবস্থানকারী এক শ্রেণির মধ্যস্বত্বভোগী প্রতিনিধি। যাদের কাজ শুধু রাজস্ব আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং স্বীয় এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, ভূমির উন্নয়ন সাধন, বিচারকার্য পরিচালনা, প্রয়োজনে সরকারকে সামরিক সহায়তা দেয়া, জনকল্যাণমূলক কাজ করা ইত্যাদিও তাঁদের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ভূমির উপর কর্তৃত্বকারী এ ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীর অস্তিত্ব বঙ প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় বিদ্যমান ছিল।[৩] বাংলার হিন্দু রাজত্বকালের পূর্বে এঁরা সামন্তরাজ বা সামন্তধিপতি নামে পরিচিত ছিলেন। গুপ্ত ও পাল যুগের পরে সুদীর্ঘ হিন্দু শাসনামলে এসব সামন্তরাজ বা ভূম্যধিকারীরা 'ভূইয়া', ভৌমিক, 'চৌধূরী', 'মণ্ডল' বা 'মুকাদ্দাম', বিষয়ী ইত্যাদি নামে পরিচিত হন। বাংলায় মুসলমানদের আগমনকালে ও স্বাধীন সুলতানি আমলের মুসলিম শাসকবর্গ রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় বাংলার সেই প্রাচীন প্রথাকেই বহাল রাখেন এবং তাদেরকে ভুমি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পন করেন।

---

১. *বাংলাপিডিয়া*, ৩য় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬২।

২. Shirin Akhter, *The Role of the Zamindars in Bengal* (Dacca : Asiatic society of Bangladesh, 1982) pp. 3-4; Irfan Habib, "Agrarian Relations and Land Revenue",Tapan Ray Chaudhuri and Irfan Habib (ed), *The Cambridge Economic History of India,* vol-I (Cambridge: Cambridge University Press, 1987) p. 245.

৩. Shirin Akhter, *op.cit.,* p 4; Anil Chandra Banerjee, *op.cit.,* p.21; Subhas Chandra Mukhopadhyay, *The Agrarian Policy of the British in Bengal* (Allahabad : Chugh publcations, 1987), p.10.

Dhaka University Institutional Repository

তবে মুসলিম শাসনামল থেকেই ঐ সব ভৌমিক বা ভূম্যধিকারীরা মুসলিম অমুসলিম সকলেই ক্রমান্বয়ে 'জমীন্‌দার' বা 'জমিদার' নামে আখ্যায়িত হতে থাকেন। পরবর্তীতে মোগল শাসনামলের রাজস্ব ব্যবস্থাতেও বাংলার সেই প্রচলিত রীতিই বহাল থাকে। কিন্তু ইংরেজ শাসনামলের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব পর্যন্ত মোগল শাসনামলে ভূমিতে ভূঁইয়া বা জমিদারদের স্থায়ী স্বত্বাধিকার ছিল না যদিও তাঁরা প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী বংশপরম্পরায় জমিদারি ভোগ করতেন। অন্যদিকে সকল রাজস্ব আদায়কারী মধ্যস্বত্বভোগী প্রতিনিধি আবার সমান সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। এটি নির্ভর করতো তাঁদের উৎপত্তি, বংশ এবং আয়ের উপর।[১] তবে সামগ্রিকভাবে সকল রাজস্ব আদায়কারী মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি সাধারণত 'জমিদার' নামে পরিচিত ছিলেন।

জমিদারদের শ্রেণি বিভাগ

সামগ্রিকভাবে বাংলার জমিদারদেরকে কর প্রদানের উপর ভিত্তি করে প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে যথা-(ক) পেশকাসি (ট্রিবিউট) জমিদার এবং (খ) চুক্তিবদ্ধকৃত ভূমি রাজস্ব প্রদানকারী বা মালওয়াজিবি জমিদার ।[২] প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হলো বাংলার সেই সকল জমিদার যাঁরা প্রাচীন হিন্দু আমলে ক্ষুদ্র রাজা বা নৃপতি ছিলেন, সুলতানি আমলে তাঁরা তাঁদের স্বাধীনভাব বজায় রাখেন এবং মোগল আমলে মোগলদের প্রতি নামমাত্র আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ একটি নির্দিষ্ট বাৎসরিক রাজস্ব বা নজরানা বা উপঢৌকন সরকারের নিকট প্রেরণ করতেন। তাঁদের প্রেরিত করসমূহ ভূমি জরিপের মাধ্যমে নির্ধারিত ছিল না এবং তাঁদের রাজস্ব আদান-প্রদান নিয়মিতকরণের জন্য তদারককারী হিসেবে তাঁদের ভূখণ্ডে কোন কানুনগোও (সরকারি রাজস্ব কর্মচারী) নিয়োজিত ছিলেন না ।[৩] এসব জমিদারের সংখ্যা বাংলার সীমান্তবর্তী স্বায়ত্তশাসিত জমিদার বা করদ রাজাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। উদাহরণস্বরূপ ত্রিপুরা (Tippera), কাছাড় (Cachar), জৈন্তিয়া (Jaintia), কুচবিহার ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে ।[৪] তাঁদের কাছ থেকে কর সংগ্রহের দায়িত্ব বাংলার নাজিমদের উপর ন্যস্ত ছিল।

---

১. Sirajul Islam, *Bengal Land Tenure* (Culcutta : K.P. Bagchi & Company, 1988) p.1.

২. Shirin Akhter, *op.cit.,* p.7.

৩. *Ibid.;* Narendra Krishna Sinha *op.cit.,* p.12.

৪. Anil Chandra Banerjee *op.cit.,* p.24.

Dhaka University Institutional Repository

মালওয়াজিবি জমিদার হলো বাংলার সেসব জমিদার যাঁরা মোগল সরকারের ভূমি জরিপ ও রাজস্ব চুক্তি অনুযায়ী তাঁদের জমিদারির অন্তর্ভূক্ত ভূমি রাজস্ব ও সায়ের (পণ্য দ্রব্য ও দোকানের উপর ধার্যকৃত শুল্ক) রায়তদের কাছ থেকে আদায় করে সরকার সমীপে প্রেরণ করতেন। বাংলায় প্রত্যক্ষ মোগল শাসনাধীন এলাকার অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন এই শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত এবং এঁরাই ছিলেন বাংলার মোগল রাজস্ব ব্যবস্থার মেরুদণ্ডস্বরূপ।[১] প্রকৃতপক্ষে এঁরা ছিলেন রাজস্ব ইজারাদার এবং কালক্রমে এই ইজারাদারিও বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে জমিদার নামে আখ্যায়িত হয়। কিন্তু এই দুটি শ্রেণি দ্বারা বাংলার জমিদারদের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া গেলেও তাঁদের মধ্যকার ক্ষমতা, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা এবং সরকারের নিকট বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত প্রকারভেদ প্রকাশ পায় না। তাই বাংলার জমিদারদের বিভিন্ন ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ, সরকারের নিকট বাধ্যবাধকতা, জমিদারির আয়তন ও বার্ষিক আয় ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে এদেশের জমিদারদেরকে মোট চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে দেখানো যেতে পারে- (ক) স্বায়ত্ত বা স্বয়ংশাসিত জমিদারবর্গ (The autonomous chiefs); (খ) সীমান্ত জমিদারবর্গ (The frontier zamindars); (গ) বৃহৎ জমিদারবর্গ (The big zamindars) এবং (ঘ) ক্ষুদে বা উঠতি জমিদারবর্গ (The petty or the primary zamindars) [২]

(ক) স্বায়ত্ত বা স্বয়ংশাসিত জমিদারবর্গ

প্রাচীন হিন্দু রাজত্বকালে উদ্ভুত ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা বা নৃপতিরা ছিলেন এই শ্রেণির অন্তর্গত। উদাহরণস্বরূপ কুচবিহার, কোকহাজো, আসাম ও ত্রিপুরার রাজাদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

(খ) সীমান্ত জমিদারবর্গ

এই শ্রেণির জমিদারগণও স্বায়ত্তশাসিত জমিদার বা রাজাদের ন্যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক স্বাধীনতা ভোগ করতেন। রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে বহু দূরে সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তের জমিদারদেরকে সর্বদা মোগলদের নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হতো না। নামমাত্র বাৎসরিক কর (পেশকাস) প্রদান ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে বাংলাকে নিরাপদ রাখার জন্য মোগলরা সীমান্তের বড় বড় জমিদারদেরকে অনেকাংশে স্বাধীন রেখেছিলেন।[৩]

---

১. Shirin Akhter, *op.cit.*, p.7.

২. *Ibid, p-8.*

৩. Narendra Krishna Sinha, p.12; Shirin Akhter, *op.cit.*, p.10.

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম সীমান্তের বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের রাজারা পূর্বের সামন্ত নরপতির মতই তাঁদের স্ব-স্ব এলাকায় কার্য পরিচালনা করতেন।

(গ) **বৃহৎ জমিদারবর্গ**

এই শ্রেণির জমিদারগণ মোগল রাজস্ব ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণির জমিদারগণই ছিলেন মোগল সরকার ও অধীনস্থ রায়ত এবং কখনো কখনো ক্ষুদ্র জমিদারদের মধ্যে মধ্যবর্তী শ্রেণি। এ সকল বৃহৎ জমিদারির প্রতিষ্ঠাতাগণ ক্রমান্বয়ে ভূমি অর্জন করে এক বিরাট এলাকার মালিক হন এবং তাঁদের জমিদারি-স্বত্ব ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত হয়।[১] জমিদারিতে তাঁদের বংশগত উত্তরাধিকারী মর্যাদা মোগল সরকারের সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করতো।

বিদ্রোহ কিংবা চুক্তি মোতাবেক রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হলে এ সকল জমিদারি হস্তান্তরিত হয়ে অন্যের নামে বন্দোবস্ত হতো।

(ঘ) **ক্ষুদে বা উঠতি জমিদারবর্গ**

বার্ষিক আয়, প্রভাব প্রতিপত্তি ও সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে বৃহৎ জমিদারির পরেই ক্ষুদ্র জমিদারের স্থান। যদিও বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয় জমিদারই সাধারণত রায়তদের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীস্বরূপ এবং উভয়ই দৃশ্যত জমিদার নামে পরিচিত হলেও তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। রাজনৈতিকভাবে ক্ষুদ্র জমিদারবর্গ রাষ্ট্রের জন্য কম বিপদজনক মনে হওয়ায় মোগল আমলে রাজধানীর দূরবর্তী স্থানে বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও সিলেটে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারির সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, ফরিদপুর, রংপুর ও যশোরে ক্ষুদ্র জমিদারির সংখ্যাই সর্বাধিক।[২]

সুবাদার মুর্শিদকুলী খানের সময় সমগ্র বাংলা ১৩টি চাকলা ও ১৬৬০টি পরগণনায় বিভক্ত হয়। পরগণাসমূহের মধ্যে ১২৫৬টি, পঁচিশটি জমিদারিতে এবং বাকী ৪০৪টি জায়গিরে (সৈন্য বিভাগাদিসহ) বন্দোবস্ত দেয়া হয়। নবাব সুজাউদ্দীন মুহাম্মদ খানের সময় (১৭২৭-১৭৩৯) এই বন্দোবস্তই কিছু সরকারি সংশোধনসহ বলবৎ থাকে। মূলত এই জমিদারি বন্দোবস্তকেই পরবর্তী বন্দোবস্তগুলোর, এমনকি দশসালা বন্দোবস্তের ভিত্তিস্বরূপ বলে আখ্যায়িত করা যায়।[৩]

---

১. *Ibid*, p.13.
২. *Ibid*, p.4.
৩. কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা ইতিহাস (নবাবী আমল)*, ২য় সংস্করণ (কলিকাতা: ১৩১৫), পৃ. ৪৮৬।

স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও এদেশের জমিদারদের অবদান অনস্বীকার্য। মূলত তাদেরই একনিষ্ঠ পৃষ্ঠকোষকতায় বাংলার মন্দির স্থাপত্যের বিকাশ ঘটে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারার যে অনুপ্রবেশ ঘটে তা বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও প্রভাবিত করে। আর বাংলার সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটানোর ধারক ও প্রবর্তক ছিলেন এদেশের জমিদার ও শহুরে ব্যবসায়ীরা। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে আহার-বিহার, আচার-আচরণ, পোশাক-আশাক ইত্যাদিতে ইংরেজ প্রভুদের যেমন অনুকরণ করেন তেমনি সংস্কৃতির বৃহত্তর পরিমণ্ডলে ব্রিটিশ স্থাপত্য ঐতিহ্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এদেশের স্থাপত্যকলায় এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করেন। তাদের নির্মিত মিশ্ররীতির স্থাপত্যসমূহ ইন্দো-ইউরোপীয় বা ইন্দো-ব্রিটিশ বা ঔপনিবেশিক স্থাপত্য নামে পারিচিত। যদিও এ ধরনের স্থাপত্যরীতির বিকাশ ঘটান স্বয়ং ব্রিটিশ শাসকরা কিন্তু যথাযথ লালন-পালন ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে একে জনপ্রিয় করে তোলেন বাংলার জমিদার ও শহুরে ব্যবসায়ীরা। বিশেষ করে জমিদাররা বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় নির্মিত অসংখ্য জমিদারি প্রাসাদ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান যেগুলোর অধিকাংশই বর্তমানে ভগ্নদশাগ্রস্ত ও অবহেলিত।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গ-ভঙ্গের ঘটনাপ্রবাহ ঢাকার গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দেয়, রাজধানী কলকাতার বাইরে বাংলার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে এ নগরী। ব্রিটিশদের প্রবর্তিত চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের হাত ধরে নগর ঢাকার আশে-পাশে গড়ে ওঠা জমিদার পরিবারগুলো ঢাকা, তথা পূর্ব বাংলার এই নব-বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। তাই উনিশ-বিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্যতম স্বাক্ষী এই জমিদারবাড়িগুলো, আর সেগুলোর স্থাপত্যিক বিশ্লেষণ ওই সময়ের ইতিহাস অন্বেষণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

পরিধি

ঢাকা জেলা বাংলাদেশের ২৩°১৪' এবং ২৪°২০' উত্তর এবং ৮৯°৪৫' ও ৯০°৫৯' পূর্ব অক্ষাংশে অবস্থিত। ১৯১৬ সালে ঢাকা জেলার আয়তন ছিল ২৮৩২ বর্গমাইল।[১] যা ১৯২১ সাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকে। ঢাকা জেলার পূর্বে মেঘনা নদী যা একে কুমিল্লা জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। দক্ষিণ এবং পশ্চিমে যমুনা নদী, যা গঙ্গার সাথে মিলিত হয়ে পদ্মা বা কীর্তিনাশা নামে একে পাবনা, ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জ থেকে আলাদা করেছে। পদ্মা নদী ঢাকার দক্ষিণ পশ্চিম সীমানা নির্দেশক।

---

১. Rai Monohan Chakrabarti Bahadur, *A Summery of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal 1757-1916* (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1918), P.47

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার উত্তরে ময়মনসিংহ জেলা। ঢাকা জেলার এই সীমানা বর্তমান অভিসন্দর্ভের আলোচ্য পরিধি। কিন্তু জেলা প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই ঢাকার এই সীমা বেশ কয়েকবার পরিবর্তিত হয়েছে। যে সমস্ত কারণ এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী ছিল তা নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

ভৌগলিক গঠনানুসারে ঢাকা জেলাকে মূলত দুইভাগে ভাগ করা যায়। ১. মধুপুরের উচ্চভূমি : যা পূর্বে বংশীনদী, দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা এবং পূর্বে লক্ষ্যানদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা সীমাবদ্ধ। ২. নিম্নাঞ্চল : যা পূর্বোল্লেখিত উচ্চভূমি ছাড়া ঢাকা জেলার বাকী অংশ নিয়ে গঠিত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮৬৫ সালে এ দেশীয় শাসকদের নিকট হতে যে ঢাকা জেলা পেয়েছিল তার আয়তন ও সীমা এর চেয়ে অনেক বড় ও বিস্তৃত ছিল। তৎকালীন ঢাকা জেলা বা রাজস্ব প্রশাসনিক কেন্দ্রটি মোগল সুবেদার নবাব মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক ১৭২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন অবশ্য ঢাকা জেলার নাম ছিল জাহাংগীরনগর। সে সময় সম্রাট শের শাহের প্রতিষ্ঠিত যে সরকারগুলি ঢাকা জেলার অন্তর্গত ছিল সেগুলো হল (১) বাজুহা (২) সোনারগাঁ (৩) বাকলা (৪) ফতেহাবাদ (৫) মাহমুদাবাদ (৬) ঘোড়াঘাট।[১]

মূলত এ পলাশীর যুদ্ধের পর হতে বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এক বিশাল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটি বাণিজ্য সংগঠন হয়েও এ সময় হতে বাংলার প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত হয়। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী লাভের পর হতে ঢাকায় বৃটিশ শাসনের সূচনা ঘটে। সেই সময় ঢাকা ছিল নায়ের-ই-সুবাদারের (Deputy Governor) কর্মক্ষেত্র। তার কর্তৃত্ব সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর, খুলনা ও যশোরের কিয়দংশ, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও গারো পাহাড়ের পশ্চিমাংশসহ প্রায় ৬৫০১৬ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল।[২]

ঢাকা জেলার বিশাল পরিধি এবং একই সাথে আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার দুর্বলতা এ জেলার সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল খুবই দুরূহ। ডাকাতি, সন্ত্রাস, হত্যা ইত্যাদি অপরাধ হর-হামেশায় জলে স্থলে সংগঠিত হতো। যার ফলে জনগণের জীবন ও সম্পদ সকল সময়ে হুমকীর মুখে থাকতো। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার যে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার মধ্যে একটি হলো সীমান্তবর্তী এলাকায় নতুন জেলার সৃষ্টি করা। মালদাহ, বগুড়া, পাবনা জেলাসমূহ এভাবেই গঠিত হয়েছে। জলপথে ডাকাতি নিয়ন্ত্রনের জন্য বাকেরগঞ্জ জেলাকে ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। আদিবাসীদের বিশৃঙ্খলা ঢাকা জেলার সীমা পরিবর্তনের আর একটি কারণ। সীমান্তবর্তী এলাকায় আদিবাসীগণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, প্রতিশোধ বা স্বার্থন্বেষী ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রায়ই বিদ্রোহ করতো। তারা বিভিন্ন জনপদে আক্রমণ করে লুটতরাজ ধ্বংসসাধন ও হত্যাযজ্ঞ চালাত।

---

১. ঢাকা জেলা গেজেটীয়ার,(বৃহত্তর ঢাকা), উপনিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯৩,পৃ.৭

২. Bahadur, *Jurisdiction of Districts*, p.47

Dhaka University Institutional Repository

এরা ছিল অশিক্ষিত অতি সাধারণ কিন্তু দুর্ধর্ষ ও বন্য প্রকৃতির। সরকার এদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের একটি পৃথক প্রশাসনের আওতায় আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এই ফলশ্রুতিতে সিলেটকে ঢাকা থেকে আলাদা করে নতুন জেলার সৃষ্টি করা হয়। কাজের ব্যাপ্তি কমানোর উদ্দেশ্য ঢাকা জেলার সীমানা পুনর্গঠনের আর একটি কারণ ছিল। এই বিশাল এলাকায় প্রশাসনিক কর্ম পরিচালনা একজন ব্যক্তির পক্ষে ছিল অসম্ভব। জেলার বিশাল ব্যাপ্তির কারণে প্রায়ই রাজস্ব আদায় ও বিচার ব্যবস্থা বিঘ্নিত ও বিলম্বিত হত। জেলার পরিধি কমিয়ে সরকারি কাজের গতি সঞ্চারণের জন্য বাকেরগঞ্জ এবং ফরিদপুর জেলাকে ঢাকা থেকে আলাদা করা হয়। নদীর গতি পরিবর্তনের কারণেও অনেক ক্ষেত্রে জেলা সীমারেখা পরিবর্তিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ব্রহ্মপুত্র নদীর খাত পরিবর্তন পূর্বে ময়মনসিংহ, ঢাকা এবং পশ্চিমে রংপুর, বগুড়া এবং পাবনা জেলার সীমা পরিবর্তিত হয়েছে।

১৭৭২ সালে ১৮টি জেলা সঙ্গে নিয়ে প্রথম ঢাকা কালেক্টরেট প্রতিষ্ঠিত হয় যার পরিধি ছিল প্রায় পূর্বোক্ত সীমার অনুরূপ। বেশ কয়েকবার সংযোজন ও বিয়োজনের পর ১৭৮২ সালে ঢাকা থেকে সিলেট জেলাকে পৃথক করা হয়। ১৭৭৩ সালের শেষদিকে সমগ্র বাংলাকে পাঁচটি বিভাগে ও ২৮টি জেলায় বিভক্ত করা হয়। ১৭৮৬ সালে ঢাকা জেলাকে ঢাকা, ব্রজগোমেদপুর, ভুলুয়া ও ময়মনসিংহ এই চারটি ভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত রাজস্ব কমিটি কর্তৃক গৃহিত হয়।[১]

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ঢাকা জেলার সীমানার পুনঃনির্ধারিত হয়। ১৭৯৭ সালের সপ্তম রেগুলেশনের দ্বারা বাকেরগঞ্জ জেলাকে ঢাকা-জালালপুর জেলা থেকে পৃথক করা হয় এবং কোণী নদী (যা বর্তমানে যমুনা নদীর মধ্যে চলে গেছে) ঢাকার পশ্চিম সীমানা হিসেবে নির্ধারিত হয়। একই রেগুলেশনের আওতায় গৌর নদী থানাকে ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাকেরগঞ্জের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। প্রশাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ১৮০৭ সালে এক প্রজ্ঞাপনের দ্বারা ঢাকা জেলাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ঢাকা (যার সীমা মানিকগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ও ধামরাই ছাড়া বর্তমান ঢাকার সমগ্র এলাকা) ও ঢাকা-জালালপুর যার হেডকোয়ার্টার ছিল ফরিদপুরে।[২]

---

১. Proceedings of the Board of Revenue, 7th June 1786, PP.93-94.

২. Bahadur, Jurisdiction of Districts, P-47.

Dhaka University Institutional Repository

১৮৩৩ সালে পঞ্চম রেগুলেশনের দ্বারা ঢাকা জালালপুরকে ঢাকার সাথে যুক্ত করে তা একজন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের অধীনে রাখা হয়। নদীর গতি পরিবর্তনের কারণে ১৮৫৬ সালে মানিকগঞ্জ জেলাকে ঢাকার সাথে সংযুক্ত করা হয়। একই সালে রাজশাহী হতে ১২৭টি এস্টেট ঢাকা জেলার সাথে যুক্ত করা হয়। ১৮৬৬ সালে এক সরকারি অধ্যাদেশ দ্বারা আটিয়া থানাকে ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ময়মনসিংহের সাথে যুক্ত করা হয়। একই অধ্যাদেশ দ্বারা মুলফতগঞ্জ থানাকে ঢাকা থেকে পৃথক করে বাকেরগঞ্জ জেলার মাদারীপুর মহকুমার সাথে সংযুক্ত করা হয়।[১]

১৮৬৭ সালের জেনারেল রিঅ্যারেঞ্জ নোটিফিকেশন (সাধারণ পুনর্নির্ধারন প্রজ্ঞাপন) দ্বারা ঢাকা জেলার মহকুমা ও থানাসমূহের সীমা নির্ধারিত হয়। ইতিমধ্যে পদ্মা নদীর গতি পরিবর্তনের কারণে মুনফতগঞ্জ থানা ঢাকার সাথে পুনঃসংযোজিত হয়। ১৮৬৭ সালে তা আবার একই কারণে বাকেরগঞ্জের সাথে তা যুক্ত করা হয়। ১৮৭৫ সালে দাপ্তরিক কর্ম ও প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য ফরিদপুরের বিচার ব্যবস্থাকে ঢাকা থেকে পৃথক করা হয় এবং নারায়ণগঞ্জ থানাকে ১৮৮২ সাল নাগাদ মহকুমায় উন্নীত হয়।

বিভিন্ন সময় সীমা পরিবর্তনের পর ঢাকার বর্তমান সীমানা ১৮৮৬ সাল হতে বিদ্যমান। ১৮৮৬ সালে কিংবা তার পরে তৎকালীন ঢাকা জেলার মধ্য থেকে অংশ বিশেষ বিচ্ছিন্ন করে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ জেলার সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮৪ সালে বৃহত্তর ঢাকা জেলার মহকুমাগুলি জেলায় উন্নীত হওয়ার পূর্বে বৃহত্তর ঢাকা জেলা ছিল ২৩৩৪ বর্গমাইল বা ৭৫৯৯ বর্গ কি.মি.। ঢাকা শব্দটি দিয়ে এই গবেষণায় কেবল মহানগরী ঢাকা, কিংবা বর্তমানের ঢাকা জেলার ভৌগলিক সীমারেখাকে বোঝানো হয়নি- পূর্বতন ঢাকা জেলা, তথা বর্তমান ঢাকা, গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলাকে বোঝানো হয়েছে।

উদ্দেশ্য

বাংলার স্থাপত্যিক ইতিহাস নিয়ে প্রকৃত অর্থে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি; ঔপনিবেশিক আমলের স্থাপত্য নিয়ে এই গবেষণা হয়েছে আরো কম। এ বিষয়ে একমাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নাজিমউদ্দিন আহমেদের 'Buildings of the British Raj in Bangladesh', যেখানে এই সময়ের স্থাপত্য নিয়ে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে সেই আলোচনায় স্থান পেয়েছে কেবলই ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠির পৃষ্ঠপোষকতায়, তাদের প্রশাসনিক প্রয়োজনে তৈরি করা ইমারতসমূহ। জমিদারবাড়িগুলোর স্থাপত্যিক বিশ্লেষণ নিয়ে সেখানে তেমন বর্ণনা নেই। ঢাকার জমিদার বাড়িগুলো নিয়ে আলাদা করে আলোচনা তো নেই-ই। এ বি এম হোসেন

১.W.W.Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol-5, rpt,(DK Publishing House 1973),p.76

সম্পাদিত, Sonargaon-Panam গ্রন্থে বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার কেবল সোনারগাঁ- পানামের ইমারতসমূহের বিবরণ পরিলক্ষিত হয় এবং এ বি এম হোসেন সম্পাদিত Architecture, Cultural Survey of Bangladesh(vol-2) গ্রন্থে এদেশের জমিদারি প্রাসাদগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া প্রফেসর ড. কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এর 'রাজশাহী জমিদারদের প্রাসাদ- স্থাপত্য' (১৭৯৩-১৯৫০) এই গ্রন্থে রাজশাহী অঞ্চলের জমিদার বাড়ীগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেই বিবেচনায়ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদারবাড়িগুলোর স্থাপত্যিক ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

ঢাকা অঞ্চলের জমিদারবাড়িসমূহের স্থাপত্যিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উনিশ-বিশ শতকে এই অঞ্চলের ইতিহাসের নতুন দিগন্ত উন্মোচন এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। উল্লেখিত সময়ের স্থাপত্যে সম-সাময়িক কালের সংস্কৃতির ছাপ পাওয়া যায়, আর ঢাকা যেহেতু বাংলার সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল, তাই এই গবেষণায় ঢাকার ইতিহাসের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়ারই ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় প্রধানত বাস্তব পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হবে। এছাড়া ঐতিহাসিক পদ্ধতিও অনুসরণ করা হবে। গবেষণার পরিধির মধ্যে যে সকল স্থাপত্য নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়, সেগুলো বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করে তার সঙ্গে সমকালীন ও পূর্বাপর সময়ের স্থাপত্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে একটি উপসংহারে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হবে। তবে সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারভিত্তিক তথ্য-উপাত্তকেও এই গবেষণায় সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে।

প্রাথমিক উৎস

এই গবেষণার প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে মূলত ব্যবহৃত হবে বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া স্থাপত্যিক বিশ্লেষণ। এছাড়া উল্লেখিত স্থাপত্য নির্মাতা জমিদারবর্গ সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে জমিদারি মহাফেজখানা ও জাতীয় আর্কাইভ, জাদুঘরের উপকরণ ব্যবহার করা হবে। এছাড়া জমিদারদের বংশধর ও কর্মচারীদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হবে।

দ্বৈতীয়িক উৎস

পূর্বে উল্লেখিত প্রাথমিক উৎসসমূহের বাইরেও সংশ্লিষ্ট কালপর্বের ইতিহাস ও স্থাপত্য বিষয়ক বই-পুস্তক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই গবেষণার দ্বৈতীয়িক তথ্য-উপাত্তের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

উনিশ-বিশ শতকে ঢাকার রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

ঢাকার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন । তবে এই প্রাচীন ইতিহাসের তেমন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। প্রাচীন ঢাকার কিছু অংশ প্রাক-জ্যোতিষ রাজ্যের অর্থাৎ কামরূপের অন্তর্গত ছিল। যোগনীতন্ত্র[১] থেকে জানা যায় এই রাজ্যের দক্ষিণ সীমা ছিল ব্রহ্মপুত্র ও লক্ষ্যা নদীর সংযোগস্থল যা বর্তমানে নারায়ণগঞ্জের শহরের নিকটেই অবস্থিত।[২] কিংবদন্তী অনুসারে এই জেলার দক্ষিণাংশে রাজা বিক্রমাদিত্যের দরবার ছিল। তাঁর নামানুসারে বিক্রমপুর পরগনার নামকরণ করা হয়।[৩] ঢাকা এবং তার আশে পাশের জেলাগুলো প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধ রাজাদের শাসনাধীন ছিল।[৪] বিক্রমপুর নামটি ইতিহাসে পাল, চন্দ্র, বর্ম এবং সেন রাজাদের সঙ্গে জড়িত যারা নবম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এই অঞ্চল শাসন করেছেন। সপ্তম শতকের দ্বিতীয় অধ্যায় সমতট অঞ্চল বিক্রমপুর পরগনার অংশ ছিল। নবম শতক পর্যন্ত এই অঞ্চলটি বৌদ্ধ শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। নবম শতকে আদিশুর বংশীয়গণ যারা পাল রাজাদের সমসাময়িক ছিলেন তারা বিক্রমপুর থেকে বৌদ্ধ রাজাদের বিতাড়িত করে নিজেদেরকে মুন্সিগঞ্জের রামপালে প্রতিষ্ঠিত করেন। পাল বংশের পতনের পর বিজয় সেন নামের জনৈক ব্যক্তি ১০৯৫ খ্রি. ১১৫৮ খ্রিস্টাব্দে বরেন্দ্র রাজ্য স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি কামরূপ, কলিঙ্গ এবং মিথিলা জয় করে বাংলার এক বিশাল ভূ-ভাগের অধিপতি হন। সেন রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বিজয়সেনের পুত্র বল্লাল সেনের (১১৫৮-১১৭৯ খ্রি.) বাড়ি সাহিত্য ও কিংবদন্তি অনুসারে মুন্সিগঞ্জের রামপালে অবস্থিত ছিল (বল্লালবাড়ি) ।[৫] এই অনুযায়ী এই সময় ঢাকা মুসলিম শাসনের সূচনা পর্যন্ত সেনরাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। বল্লাল সেন তাঁর মৃত্যুর দু'বছর পূর্বে পুত্র লক্ষণ সেনের হাতে শাসন ভার ছেড়ে দেন এবং এর দু'বছর পর ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। বখতিয়ার খলজী কর্তৃক নদীয়া এবং বরেন্দ্র বিজিত হলে লক্ষণ সেন বঙ্গে (পূর্ব বাংলা) তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বখতিয়ার খলজী গৌড় লক্ষ্মৌতিতে শাসন

১.B.C. Allen, *Eastern Bengal District Gazetteers,* (Dacca, Allahabad: The Pioneer Press 1912) P.18
২. *Ibid,*p.18
৩. W.W.Hunter, *A Statistical Account of Bengal,* Vol-5, rpt, (Dk Publishing House 1973), P.18
৪. *Ibid,*p.18
৫. B.C. Allen, *op. cit,* P-19

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার পরেও ঢাকা কিছুদিন সেন রাজাদের শাসনাধীনে ছিল। লক্ষণ সেনের পুত্র মাধব, কেশব এবং বিশ্বরূপ সেন আরো একশ বছর ঢাকাসহ পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেন।[১] সেনদের সঙ্গে মুসলমানদের অনবরত সংঘর্ষ চলতে থাকে। পরবর্তীতে সোনারগাঁয়ের দেব বংশীয়দের উত্থানে সেনরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

সুলতানি আমলে ঢাকা জেলা

ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে ঢাকায় মুসলমানদের আগমনের বিষয়ে খুব বেশি জানা যায় না। ১২২৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শাসক গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজী কামরূপ এবং পূর্ব বাংলা জয়ের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর রাজধানী আক্রান্ত হওয়ায় তিনি ফিরে যেতে বাধ্য হন। এর পরবর্তীতে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দুর্বল প্রশাসনের কারণে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার রাজ্য সম্প্রসারণ তেমন একটা হয়নি। গিয়াসউদ্দিন বলবনের শাসনকালে আমির খানকে অযোদ্ধা এবং বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করা হয় এবং মুগিজ উদ্দিন তুঘরিল বাংলার গভর্নরের সহযোগি হিসেবে নিযুক্ত হন। কিন্তু তুঘরিল গভর্নরের চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। রাঢ়, জাজনগর, আধুনিক ফরিদপুর ও ঢাকা জেলায় তার শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করেন।[২] তিনি নরকিল্লার দূর্গ (যা কিনা 'তুঘরিল কিল্লা' নামে বেশি পরিচিত) নির্মাণ করেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে সুলতান মুগিজউদ্দিন নাম ধারণ করেন। সুলতান বলবন তুঘরিলের বিরূদ্ধে তিনটি অভিযান প্রেরণ করেন। ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে বলবন নিজে তাঁর বিরূদ্ধে অগ্রসর হন এবং ঢাকায় উপস্থিত হয়ে সোনারগাঁয়ে তাঁর শিবির স্থাপন করেন।[৩] নদী পথে পলায়নের সময় তুঘরিল ধৃত ও নিহত হন। এভাবে সোনারগাঁ সহ ঢাকা এয়োদশ শতকে সত্তরের দশকে মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তখন থেকে এটা মুসলমানদের দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। মওলানা শেখ সাইফুদ্দিন আবু তায়ামার সোনারগাঁয়ে আগমনের পর থেকে মূলত সোনারগাঁয়ে মুসলিম ইতিহাসের সূচনা হয়। তিনি এখানে একটি মাদ্রাসা এবং খানকা স্থাপন করেছিলেন।[৪]

---

১. B.C.Allen, *Bengal Gazetters, Dacca,* P-20; Minhaj-US-Siraj in Tabaqat-1-Nasiri Speaks about the existence of the Sena rule at Bikrampur including Dhaka till at least A.D. 1242, during his visit to Lakhnauti.

২. Qanungo, *History of Bengal,* Vol-2 (Dhaka : University of Dhaka, 19), P.54

৩. K. Ali, *History of India, Pakistan and Bangladesh* (Dhaka: Ali publications, 1972), P-177

8. For details see Abdul Karim, *Social History of the Muslims in Bengal* (Dhaka: 1959) PP. 67-76

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন তাঁর পুত্র বুখরা খানকে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করেন। বুঘরা খান ১২৮০ থেকে ১২৯১ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেছিলেন। ১২৮৭ সালে গিয়াসউদ্দিন বলবনের মৃত্যু হলে পুত্র বুখরা খান দিল্লী সালতানাতের সুলতান পদ গ্রহনে অস্বীকার করেন এবং সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ নামে বাংলা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। বুঘরা খানের পুত্র রোকনুদ্দিন কায়কাউস পিতার মৃত্যুর পর ১২৯১-১৩৬১ সাল পর্যন্ত বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর পরবর্তী শাসক সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ সোনারগাঁ ও সাতগাঁ সহ সমগ্র বাংলা ও বিহার ২১ বছর শাসন করেন। ইতিমধ্যে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খলজী (১২৯৬-১৩১৬) বাংলা প্রদেশের অত্যাধিক ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শংকিত হয়ে ফিরোজ শাহের পুত্র বাহাদুর খানকে সোনারগাঁসহ পূর্ব বাংলার শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৩২২ সালে পিতার মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ সমগ্র বাংলার শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন এবং নিজে বাহাদুর শাহ উপাধি ধারণ করে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাহাদুর শাহ ও তাঁর ভাই নাসির উদ্দিন ইব্রাহিম এর মধ্যকার দ্বন্দ্বের সুযোগে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুখলক ১৩২৪ সালে বাংলা আক্রমন করে বাহাদুর শাহকে পরাজিত করেন। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক তাঁর পালিত পুত্র তাতার খানকে সোনারগায়ের গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং নাসির উদ্দিন ইব্রাহিমকে বাংলার শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।[১] তাতার খানের শাসনকালে তাঁর শিলাহদার ফকরুদ্দিন ১৩৩৮ সালে সুলতান ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ নাম ধারণ করেন এবং সোনারগায়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ দশ বছরের বেশি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সোনারগাঁ তথা ঢাকার সাথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটান। সোনারগাঁ ১৩৫২ সাল পর্যন্ত ফকরুদ্দিন মুবারক শাহের পুত্র ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহের অধীনস্থ ছিল। ইতিমধ্যে হাজী ইলিয়াস নামে আলাউদ্দিন আলী শাহ (তৎকালীন বাংলার শাসক) এর সৎ ভাই বাংলার দক্ষিণ অঞ্চল দখল করেন এবং ১৩৪২ সালে আলাউদ্দিন আলী শাহকে হত্যা করে লখনৌতির সিংহাসন দখল করেন এবং সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নাম ধারণ করেন। ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ সালের মধ্যে সোনারগাঁ ও ঢাকা সহ সমগ্র পূর্ব বাংলায় নিজের শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। পরবর্তী প্রায় দেড়শ বছর তা ইলিয়াস শাহী বংশীয় শাসকদের শাসনাধীনে ছিল।[২] এর পর থেকে সোনারগাঁ পূর্ব বঙ্গের প্রাদেশিক সাশনকর্তার বাসস্থানে পরিণত হয়। তখন থেকে সোনারগাঁ এবং পূর্ববঙ্গের জেলাগুলো বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৩৫৮ সালে ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দর শাহ বাংলায় সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হন (১৩৫৮-১৩৯৩)।

---

১. Allen, *Bengal Gazetters : Dacca*, P-20

২. Allen, *Bengal Gazetters : Dacca*, P-20

Dhaka University Institutional Repository

একজন যোগ্য শাসক হওয়া সত্ত্বেও সিকান্দার শাহ তাঁর পুত্র ও তৎকালীন সোনারগাঁয়ের গভর্নর গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের নিকট ঢাকার মানিকগঞ্জের গড় পাড়ায় এক যুদ্ধে নিহত হন। গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ সোনারগাঁয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৩৯৩-১৪১০ সাল পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। তিনি মুয়াজ্জামাবাদ থেকে নিজের নামে মুদ্রা জারি করেছিলেন যা সোনারগাঁয়ের অদূরে অবস্থিত। আযম শাহের উত্তরাধিকারীগণ রাজা গণেশ কর্তৃক অপসারিত হন এবং তার উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক প্রায় উনত্রিশ বছর বাংলা শাসিত হয় (১৪-১৪-১৪৪২ সাল পর্যন্ত)। এই সময় পূর্ব বাংলাসহ ঢাকা টিপ্পেরা, আসাম এবং আরাকানের শাসকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল।[১] ১৪৪২ সালে বাংলা পুনরায় পরবর্তী ইলিয়াসশাহী বংশের শাসক প্রথম মাহমুদ শাহ কর্তৃক একত্রভুত হয়। ১৪৮৭ সাল পর্যন্ত তাঁর বংশধরদের দ্বারা শাসিত হয়। তাদের শাসনকালে পূর্ব বাংলার জেলাগুলো নিয়ে মুয়াজ্জামাবাদ প্রদেশ গঠন করা হয় যা মেঘনা থেকে সিলেটের লোর(Laur) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঢাকা ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ নিয়ে গঠিত পরগণা জালালাবাদ এবং ফতেহাবাদ নামে পরিচিত ছিল।[২] পরবর্তী ইলিয়াসশাহী শাসকদের পতনের পর বাংলা কিছুদিন হাবসী ক্রীতদাসদের দ্বারা শাসিত হয়। ১৪৯৩ সালে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ হাবসীদের বিতাড়িত করে পূর্ব বাংলাসহ সমগ্র বাংলা নিজের অধিনে নিয়ে আসেন। হুসেনশাহী সুলতানগণ ৪৫ বছর (১৪৯৩-১৫৩৮) বাংলার শাসন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৫৩৮ সালে শেরশাহ (১৫৩৮-১৫৪৫) মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে বিতাড়িত করে দিল্লীর সাম্রাজ্যের অধিপতি হন এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত শাসনকালে শুর প্রশাসন ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর সময়ে সৈয়দ আহমদ রুমী (১৫৪২) সম্ভবত সোনারগাঁয়ের প্রশাসক ছিলেন। তিনি সোনারগাঁ থেকে দিল্লী পর্যন্ত গ্র্যান্ড ট্র্যাংক রোড নির্মাণ করেছিলেন। শুরীদের আফগান উত্তরাধিকারীগণ ষোড়শ শতকের সত্তরের দশকে মোগল দ্বারা অপসারিত হন।

মোগলদের অধীনে ঢাকা

১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদখান কররানিকে পরাজিত করে মোগল প্রশাসকগণ যথাক্রমে গৌড়, তান্ডা ও রাজমহল থেকে বাংলা শাসন করেন। সম্রাট আকবরের সময়ে বেশ কিছু প্রশাসক বাংলায় নিযুক্ত হন। এর মধ্যে খান-ই-জাহান, হোসেনকুলী খান (১৫৭৩-১৫৭৯) এর সময়ে ঢাকার উত্তরে অবস্থিত ভাওয়াল বিজিত হয়। তিনি বারো ভূইয়াদের নেতা ঈসা খানকে ১৫৭৮ সালে পরাজিত করেন।

---

১. W.W.Hunter, *op. cit,* P-119

২. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী প্রশাসক মুজাফ্ফর খান তুরগতি (১৫৭৯-৮০), রাজা টোডরমল (১৫৮০-৮২) ও মির্জা আজিজ কোকা (১৫৮২-৮৪) এবং শাহবাজ খান (১৫৮৪) সালে ভাওয়ালের যুদ্ধে ঈসা খানের নিকট পরাজিত হয়ে তান্ডায় পলায়ন করেন।[১]

১৫৮৭ সালে রাজা মানসিং বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং ১৬০৬ পর্যন্ত এই অঞ্চল শাসন করেন। তিনি রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন এবং তার নাম দেন আকবরনগর।[২] মানসিং ঈসা খানের রাজ্যের কিয়দংশ দখল করেন। তাঁর পুত্র দুর্জন সিং ঈসা খানের প্রাসাদ কাত্রাভূ দখল করতে সমর্থ হয়। কিন্তু ১৫৯৭ সালে দুর্জন সিং এর নৌবহর ঈসাখান এবং মাসুম খান কাবুলী কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং যুদ্ধে দুর্জন সিং নিহত হন এবং বহু মোগল সৈন্য ধৃত হয়। পরবর্তীতে ঈসা খান আকবরের অধীনতা মেনে নিয়ে নিজের নিরাপদ অবস্থান নিশ্চিত করেন। এরপর মোগল সৈন্যবাহিনী পূর্ব বাংলায় বারো ভূইয়াদের অন্তর্গত অন্যান্য জমিদারদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। মোগলরা অনেক যুদ্ধে জয়ী হলেও আকবরের শাসনকালে তাদেরকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করা সম্ভব হয়নি। সম্রাট জাহাংগীর ১৬০৫ সালে মোগল সিংহাসনে আরোহন করেন এবং ইসলাম খানকে ১৬০৮ সালে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করা হয়। ইসলাম খান শুধু জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব করেই ক্ষান্ত হননি বরং বারো ভূইয়াদের মূল ঘাঁটি পূর্ব বাংলায় বাংলা সুবার(প্রদেশের) রাজধানী স্থাপন করেন। বারো ভূইয়াদের মধ্যে ঈসা খান এবং মুসা খান ছিলেন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের জমিদারী প্রায় ঢাকার অর্ধেকাংশ বর্তমান কুমিল্লার অর্ধাংশ এবং প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলার এবং রংপুর, বগুড়া, পাবনা জেলার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ছিল। সোনারগাঁ ছিল তাদের সুরক্ষিত রাজধানী এবং গুরুত্বপূর্ণ বন্দর।[৩] মুসা খানের অপর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল মানিকগঞ্জের নিকটে যাত্রাপুর। ইসলাম খান সমস্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করে ঢাকা থেকে মুসা খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলা সত্ত্বেও মুসা খানের ঘাঁটিগুলে মোগলদের হস্তগত হতে থাকে। মোগল আক্রমণের ভয়ে মুসা খান রাজধানী সোনারগাঁ ত্যাগ করে মেঘনার একটি দ্বীপ ইব্রাহীমপুরে (বর্তমানে বিলুপ্ত) আশ্রয় গ্রহণ করেন। সোনারগাঁর পতনের পর মুসাখানের বিরূদ্ধে যুদ্ধাভিযান আংশিকভাবে সম্পূর্ণ হয়। যুদ্ধচলাকালে ঢাকা ছিল মোগল শাসনের কেন্দ্র বিন্দু। ইসলাম খানের আগমন এবং বারো ভূইয়াদের বিরূদ্ধে তাঁর সফলতা প্রাপ্তির পর ইসলাম খান ১৬১২ সালে রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। তবে ১৬০৮ সালে ঢাকাকে নতুন রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

---

১. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস:মোগল আমল, প্রথম খন্ড*, ইনিস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী, পৃ.১৪০-১৪২

২. J.N.Sarkar(cd.), *The History of Bengal*, vol-2, (The University of Dhaka, 1948),p. 211

৩. A. H. Dani, *Dacca A Record of Its Changing Fortunes,* Dacca, (Dhaka Asiatic Press 1962),p.29

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম অনুসারে ইসলাম খান ঢাকার নামকরণ করেন জাহাংগীরনগর। ১৬০৮ থেকে ১৭১৭ পর্যন্ত ঢাকা মোগল রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল তবে মাঝখানে কিছুদিন ১৬৩৯-১৬৫৯ পর্যন্ত যুবরাজ শাহ সুজা ঢাকা থেকে রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তর করেন। মোগল শাসনামলে ঢাকা সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়। ঢাকার এই উন্নয়ন ১৭০০ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। যুবরাজ আজিমুশ্শান ঢাকা থেকে রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তর করেন যা মুর্শিদকুলী খানের সময়ও এটি প্রার্দেশিক রাজধানী হিসেবে বলবৎ ছিল। ইসলাম খানের (১৬১৩-১৮) পর তাঁর ভাই কাশিমখান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। এই সময় থেকে যুবরাজ সুজা পর্যন্ত অর্থাৎ ১৬৩৯ পর্যন্ত ঢাকার ইতিহাস অভ্যন্তরীন যুদ্ধ বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়। নবাব ইব্রাহীম খানের সুবাদারী আমলে (১৮১৮-২৪) বাণিজ্যিক দিক দিয়ে ঢাকার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায় এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইব্রাহীম খান ১৬২৪ সালে বিদ্রোহী যুবরাজ খুররম (পরবর্তীতে সম্রাট শাহ জাহান) কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। অব্যাহতি প্রাপ্তির পর খুররম ১৬২৫ সালে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং দরব খানকে ঢাকার ভার অর্পন করেন। এই সময় অস্থিতিশীলতার সুযোগে ঢাকা মগদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পর্তুগীজ পর্যটক ম্যানরিক ১৬40 সালে ঢাকায় আসেন এবং ১৬২৬ সালে মগ আক্রমণের বিবরণ প্রদান করেন। [১]

The Mugh king spent three days sacking the city, the sufferings of its wretched inhabitants acting as gruesome obsequies. After setting fire to it in various parts, he had the Nababo's palace destroyed and leveled to the ground, as he had received the news that a great force of cavalry had been mustered........ Accordingly, he re-embarked in his fleet, leaving in ruins the greater part of that beautiful city which owing to the weakness of the fleet, the Mughs so easily entered.

পরবর্তীতে সুবাদার ইসলাম খান মাসহাদী (১৬৩৫-১৬৩৯) এর সময় ঢাকার ক্ষতিগ্রস্ত দূর্গ ও প্রাসাদগুলো পুনঃনির্মিত হয় এবং জীবনযাত্রা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। যুবরাজ শাহ সুজার সময়ে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ঘটে (১৬১৬-৬০)। তিনি নিজের রাজমহলে বাস করতেন। তাঁর সহকারি মীর আবুল কাসিম সেই সময়ে ঢাকার প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৬৬০ সালে মীর জুমলা বাংলার সুবাদার হিসেবে ঢাকায় আগমন করেন। মীর জুমলার সমেয় ঢাকার সর্বোচ্চ উন্নয়ন সাধিত হয়। মগদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মীর জুমলা ঢাকায় বেশ কিছু দূর্গ নির্মাণ করেন। উদাহরণস্বরূপ মুন্সিগঞ্জের ইদ্রাকপুর ও নারায়ণগঞ্জের হাজীগঞ্জ দূর্গের নাম করা যায়।

১. Haider, *A City and its Civic Body*, P.4

মীর জুমলা ঢাকার বহু রাস্তাঘাট ও ব্রীজ নির্মাণ করেন। এর মধ্যে পাগলা ও টঙ্গী ব্রীজ দুটি মীর জুমলার কীর্তি। মীর জুমলার সময়ে আসামে অভিযান প্রেরণ করা হয়। প্রথম দিকে সাফল্য অর্জন করলেও পরবর্তীতে তাঁর সৈন্যবাহিনী মহামারিতে আক্রান্ত হলেও অভিযানটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মীর জুমলা নিজে অসুস্থ হয়ে ১৬৬৩ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। মীর জুমলার পর আমেরুল উমারা শায়েস্তা খান সুবাদার হিসেবে বাংলায় আসেন। তাঁর সুবাদারী আমলে ঢাকার উন্নতি চরম শিখরে উপনীত হয়। তিনি সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের মগ ও আরাকানদের বিরুদ্ধে ১৬৬৪ সালে অভিযান প্রেরণ করেন। ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিজিত হয় এবং নতুন নামকরণ করা হয় ইসলামাবাদ। শায়েস্তা খান সুবাদার হিসেবে প্রথম দফায় ১৩ বছর এবং দ্বিতীয় দফায় ৯ বছর মোট ২২ বছর সুবাদার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।[১] মাঝখানে দুই বছর ফরিদ খান, আজিমখান এবং যুবরাজ মুহাম্মদ আজম (আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র) বাংলার সুবাদারের দায়িত্ব পালন করেন। শায়েস্তা খানের সময়ে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং দ্রব্যমূল্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে যায়। বলা হয় তাঁর সময়ে এক টাকায় আট মন চাউল পাওয়া যেত। সেই সময়ে ঢাকা ৪৮ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছিল। 'ঢাকায় মসলিন' তাঁর সময়ে ইংল্যান্ডে রপ্তানি হত। যুবরাজ মুহাম্মদ আজম (১৬৫৩-১৭০২) ঢাকার লালবাগ দূর্গ নির্মাণ কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে শায়েস্তা খান এই দূর্গের ভিতর তাঁর কন্যা বিবি পরীর স্মরণে একটি সমাধি নির্মাণ করেছিলেন। শায়েস্তা খানের সময়ে ঢাকায় বহু মসজিদ ও অন্যান্য ইমারত নির্মিত হয়েছিল। তাঁর সময়কাল যুদ্ধ বিদ্রোহের চেয়ে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বেশি প্রসিদ্ধ ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে তিনি ইংলিশ কারখানা উচ্ছেদ সাধন করেন এবং তাদের প্রতিনিধিদের ঢাকায় বন্দি করে রাখেন। শায়েস্তা খানের পর খান-ই-জাহান, ইব্রাহীমখান (১৬৮৮-৮৯) ঢাকায় সুবাদার নিযুক্ত হন। ইংরেজদের সাথে সম্পর্কের উন্নয়নে সচেষ্ট হন। তিনি ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অনুমতি দেন। এর পরে আওরঙ্গজেব তাঁর পৌত্র যুবরাজ আজিমুশ্শান (১৬৯৭-১৭০৪) কে বাংলার সুবাদার হিসেবে নিযুক্ত করেন।

১৭০২ পর্যন্ত আজিমুশ্শান ঢাকা আসেননি। তাঁর স্থলে রহমত খান সহকারী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। ইতোমধ্যে আওরঙ্গজেব ১৭০৩ সালে মুর্শিদকুলি খানকে বাংলায় দেওয়ান নিযুক্ত করেন। বিভিন্ন কারণে সুবাদারের সঙ্গে দিওয়ান মুর্শিদকুলি খানের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় দেওয়ানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। যুবরাজ আজিমুশ্শানকেও ঢাকা থেকে পাটনা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর পুত্র ফররুক শিয়ারের অধীনে ১৭১০ সাল পর্যন্ত ঢাকা শাসিত হয়।

---

১. Hunter, Statistical Account, p.121

মুর্শিদকুলী খান 'নাজিম' হিসেবে আওরঙ্গজেবের সময় নিযুক্ত হন তবে ফররুখ শিয়ারের সম্রাট হওয়ার পূর্বপর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে তা কার্যকারিতা পায়নি। ১৭০৪ সাল থেকে ঢাকার প্রাদেশিক সরকারের রাজধানীর গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং 'নায়েব-ই-নাজিম' এর সহকারীর কর্মস্থলে পরিণত হয়। সহকারী নাজিম এর কার্য সীমা উত্তরে গাড় পাহাড় হতে দক্ষিণে সুন্দরবন এবং পূর্বে টিপ্পেরা হতে পশ্চিমে যশোর পর্যন্ত নির্ধারিত হয় যা বর্তমান ঢাকার সীমানার চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত ছিল। ১৭১৭ সালে মুর্শিদকুলি খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত ঢাকা বাংলা প্রদেশের রাজধানী হিসেবে বলবৎ ছিল। ১৭১৭-১৮৪৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা নায়েব-ই-নাজিম বা সুবাদারের সহকারীর কর্মস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ঢাকা শহর তথা এই জেলার প্রশাসনিক অবস্থার ব্যাপক অবনতি ঘটে। ব্যবসা বাণিজ্য বেশিরভাগই মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে ঢাকা একটি পরিত্যাক্ত শহরে পরিণত হয়। নবাব মুর্শিদকুলী খান ১৭১৩ সালে লুৎফুল্লাহ কে ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম নিযুক্ত করেন। তিনি ১৭৩৪ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর পরবর্তীতে সরফরাজ খান ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম নিযুক্ত হলেও তিনি বেশির ভাগ সময় মুর্শিদাবাদই থাকতে পছন্দ করতেন। তাঁর স্থলে গালিব আলী খান ঢাকা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। সেই সময়ে যসওয়ান্ত রায় ঢাকার দেওয়ান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। নায়েব-ই-নাজিম অধিকাংশ সময় মুর্শিদাবাদে কাটাতেন এবং তার অধস্তন কর্মচারীগন ঢাকার প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করতেন। গালিব আলী খানের পরে সৈয়দ রেজা খান অথবা মুরাফ আলী খান তার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৭৪০ সালে আলীবর্দী খান মুর্শিদাবাদের নবাব পদে আসীন হয়ে তাঁর জামাতা নওয়াজিশ আলী খানকে ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি তাঁর স্থলে হোসেনকুলী খানকে তাঁর সহকারি হিসেবে প্রেরণ করেন (১৭৫৩)। হোসেনকুলী খান তাঁর ভাতিজা হোসেন উদ্দিন খানকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান (১৭৫৪)। এভাবে ঢাকা নবারের সহকারীর সহকারীর সহকারী দ্বারা শাসিত হতে থাকে।[১] এভাবে ঢাকার সমৃদ্ধি নায়েব-ই- নাজিম তাঁর সহকারির চরিত্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করলেও বাকীরা আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য অধিক মনোযোগী ছিল। এদের মধ্যে রাজবল্লভ সেই সময়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে রাজনগরের জমিদারীর মালিক হন।[২] তাঁর উপার্জিত অংশের একটি বড় অংশ তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাস এর মাধ্যমে কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে ঢাকা থেকে পাচার হয়ে যায়।

---

১. Dani, *Dacca: Changing Fortunes* , P. 18

২. Hunter, Statistical Account, p. 123

পরবর্তীতে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট সিরাজদৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার নবাবী শাসনের অবসান ঘটে।

বৃটিশ আমলে ঢাকা

বাংলায় বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর বাংলার নবাবগণ ইংরেজদের বেতনভোগী নবাবে পরিণত হন। তবে তখনও তারা নবাব উপাধিটি পরিহার করেননি। ১৭৬৪ সালে লেফটেল্যান্ট সুইনটন(Swinton) এর ঢাকা আগমনের মধ্যে দিয়ে এখানে বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত হয়। সেই সময়ে মুহাম্মদ রেজা খান (১৭৬৩-৬৪) ঢাকার রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। যশরত খান পুনরায় ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম পদে এ সময়ে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৭৬৫ সাল থেকে তিনি পুনরায় ঢাকার প্রশাসনিক ক্ষমতা লাভ করেন। ১৭৮১ সালে যশরত খান মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ১৭৭৮ সালে তাঁর পৌত্র নবাব হাসমত জং নায়েব-ই-নাজিম নিযুক্ত হন এবং ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত মোট সাত বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর পরবর্তীতে তাঁর ভাই নবাব নসরত জং ১৭৮৫-১৮২২ সাল মোট সাঁইত্রিশ বছর নায়েব-ই-নাজিম হিসেবে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নসরত জংয়ের পর তাঁর ভাই সামসুদ্দৌহা নায়েব-ই-নিজামতের উত্তরাধিকারী হন। সামসুদ্দৌহা এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ নবাব পরিবারের প্রধান হিসেবে সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁরা ঢাকা থেকে মাসিক সাড়ে চার হাজার রুপি এবং মুর্শিদাবাদ নিজামত হতে এক হাজার রুপি পেতেন এবং তাদের স্ত্রীরা মাসিক পাঁচশ রুপি মুর্শিদাবাদ নিজামত হতে লাভ করতেন। ১৮৩১ সালে নবাব সামসুদ্দৌহা মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে হোসাইনি দালানে সমাহিত করা হয়। অর পুত্র কামরুদ্দৌলা তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন এবং একই পরিমাণ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাজিমউদ্দৌলা গাজী উদ্দিন হায়দার খান বাহাদুর জং পরিবারের প্রধান নিযুক্ত হন। তিনি মদ ও নারীর প্রতি আসক্ত ছিলেন এবং উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করতেন। তাকে পাগলা নবাব বলেও ডাকা হতো। গাজী উদ্দিন হায়দার ১৮৮৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাকেও হোসাইনি দালানে সমাহিত করা হয়। তাঁর কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় নবাব উপাধি ও মর্যাদার বিলুপ্তি ঘটে। মাসিক বৃত্তিও প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারের মহিলা এবং কর্মচারীদের ভরণ পোষণের জন্য খুব সামান্য পরিমাণ বৃত্তি বলবৎ থাকে।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়কালে ঢাকা

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ছিল ইংরেজদের ঢাকা দখলের পরবর্তীকালের একমাত্র রাজনৈতিক সংকট। ১৮৫৭ সালে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সিপাহীদের মধ্যেও এক প্রকার জাগরণের সৃষ্টি হয়। মিরাটে সিপাহীগণ বিদ্রোহী হলে এর প্রভাব ঢাকায় অবস্থানরত সিপাহীদের উপরেও পরিলক্ষিত হয়। ঢাকায় সিপাহী বিদ্রোহ দানা বাঁধতে শুরু করলে বৃটিশ সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য

এবং ঢাকা শহরের সুরক্ষার জন্য একজন নৌ সেনা প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে চট্টগ্রামে এই সংবাদ পৌঁছালে ২০ নভেম্বর সিপাহীরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেন। তারা ঢাকায় বিদ্রোহী সিপাহীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ঢাকার দিকে অগ্রসর হন। লালবাগ দূর্গটি তখন সেনা ছাউনি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। নৌবাহিনীর সদস্যরা ঘুমের মধ্যে সিপাহীদের নিরস্ত্র করার লক্ষ্যে খুব ভোরে লালবাগ দূর্গে পৌঁছায়। কিন্তু ইতিমধ্যে সিপাহীগণ বিদ্রোহের জন্য একতাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বৃটিশ সেনানায়ক তাদেরকে শান্তিপূর্ণ ভাবে অস্ত্র জমা দেওয়ার আহবান জানালে সিপাহীদের একজন বৃটিশ সেনার উপর গুলি চালায় এবং পরবর্তীতে অন্যরা তাকে অনুসরণ করে। এভাবে নৌ, সেনা ও সিপাহীদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এই সংঘর্ষে বেশ কিছু সিপাহী মৃত্যুবরণ করেন এবং অনেক আহত ও ধৃত হন। পরবর্তীকালে অভিযুক্ত সিপাহীদের ভিক্টোরিয়া পার্কে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়। এভাবে ঢাকায় সিপাহী বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত হয়।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশ সরকার ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রশাসন বিশেষ করে জেলা প্রশাসন ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। জেলা কালেক্টর পদকে পূর্ব অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী করা হয়। এতে করে তিনি একাধারে রাজস্ব, আইনী ও বিচার ব্যবস্থার প্রধান ক্ষমতা ধারক এবং জেলা প্রশাসনের সর্বেসর্বায় পরিণত হন। তাঁর অধীনে ঢাকায় প্রায় ৯০০০ জমিদার ও তালুকদার ছিল এবং তাদের নিকট থেকে বছরে প্রায় ৪,০৫,০০০ রুপী রাজস্ব আদায় করা হত।[১]

সামাজিক প্রেক্ষাপট

বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই বৃটিশ সরকার ধর্মীয় সামাজিক ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখে। প্রচণ্ড চাপ সত্বেও তাঁরা খ্রিস্টান মিশনারী আন্দোলনকে উৎসাহিত করেনি। একই নীতির বশবর্তী হয়ে তারা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মীয় সামাজিক সংস্কারের জোয়ার পরিলক্ষিত হয় যার যাত্রা রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকে শুরু হয় (১৭৭৪-১৮৩৩)। এই সংস্কার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু লোক অতি আধুনিকতার দিকে পা বাড়ায় এবং এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ধর্মভীরুগণ এর বিরূদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয়। এই দুই চরমপন্থীদের মাঝামাঝি অবস্থান করে সংস্কারবাদীগণ তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে।[২]

---

১. Allen, *op. cit*,p.141

২. R.C. Majumdar, H.C. Ray Chaudhuri, and K.K. Datta, An *Advanced History of India*, rpt. (Delhi: MICE, 1978) ,P. 867.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা এবং এই অঞ্চলে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক এবং বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার এবং প্রশাসন ও ব্যবসা বাণিজ্যের ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষা প্রচলনের ফলে জনগণ বিশেষ করে ঢাকার জনগণ বুঝতে পারল যে, উন্নত সামাজিক আচার আচরণই সাফল্যের চাবিকাঠি। ইংরেজি ভাষা এবং বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক শিক্ষা ও উদারনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু তাদের পেশাগত উন্নয়নই নয় বরং একটি বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান চর্চা ও সম্ভবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। বৃটিশদের উদারনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা সকলের জন্য উন্মুক্ত হওয়ায় বসাক, নমশুদ্র, নন্দি, তাঁতি, শাখারী ইত্যাদি ঢাকার নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রসারে এখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয় যা সমাজকে আধুনিকীকরণ করতে নিরন্তর সচেষ্ট ছিল এবং শেষ পর্যন্ত পত্রিকা, প্রবন্ধ, গ্রন্থ, ক্লাব, সংস্কারমূলক সংগঠন এর মাধ্যমে সফলতা অর্জন করে যাকে আধুনিকতার "হৃদ স্পন্দন" হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সমাজ থেকে রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ডের সাধারণ জনগণ সম্পৃত্ত যেমন বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের অংশগ্রহণ, সামাজিক অবক্ষয়ের বিরূদ্ধে আওয়াজ তোলা এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা ইত্যাদি। সমাজ পরিবর্তনের এই প্রচেষ্টায় উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাই মূলত নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং তাদের চেষ্টায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়। এছাড়া ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর নিম্নবর্ণের হিন্দুদের পাশাপাশি ঢাকার মুসলমানরাও এই উন্নয়ন ধারার সাথে সম্পৃক্ত হন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রচেষ্টায় এ সময় পশ্চাৎপদ সমাজকে আধুনিকীকরনের জন্য তারা পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে সরকারের পাশাপাশি ঢাকায় বহু স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেশ কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন।[১] এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি তাদের শিক্ষার্থীরা সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং শহরের বুদ্ধিবৃত্তিক চরিত্রে নতুন দ্বার উন্মোচন করেন।

ধর্মীয় সামাজিক সংস্কারে সর্ব প্রথম ভূমিকা রাখেন ব্রহ্মগণ। ১৮৮৬ সালে প্রথম ঢাকায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে ঢাকার শিক্ষিত সমাজ, জমিদারগণ, স্থানীয় অধিবাসী, অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছল কৃষক শ্রেণি এবং দার্শনিকদের নেতৃত্বে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, ক্লাব এবং সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৪ সাল থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে এ ধরনের ষোলটির বেশি সামাজিক সংগঠনের উহাহরণ ঢাকায় পাওয়া যায়।[২]

---

১. Sharif Uddin Ahmed. *A Study in urban History and Development 1840-1921* (Dhaka : Academic Press and Publishers Limited, 1986), P.89

২. *Ibid*, P.89

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা ক্লাব

ঢাকার সামাজিক পরিবর্তনের অপর একটি বহিঃপ্রকাশ হলো ঢাকা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা। যা তৎকালীন অভিজাত শ্রেণির একটি সামাজিক সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকা পূর্ববঙ্গ এবং আসামের রাজধানীতে পরিণত হয়। এই প্রদেশ শাসনের জন্য যারা ঢাকায় আসেন তারা কোলকাতার বাংলা ক্লাবের ন্যায় ঢাকাতেও একটি সামাজিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। অতঃপর তাঁরা ১৯১১ সালের ১৯ আগষ্ট ঢাকার স্থানীয় অভিজাতদের সঙ্গে নিয়ে ঢাকা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন ঢাকার তৎকালীন সিভিল সার্জন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ই.এ হল। ঢাকার মিলিটারী পুলিশ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক সি আর ব্রায়ান এইচ.জি বেইলী এবং ঢাকার পি.ডব্লিউ, ডি জে.ও. রেনী। ১৮৮২ সালে ইন্ডিয়ান কোম্পানির আইন অনুযায়ী ১৯১৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ক্লাবটি আইনগত বৈধতা পায়। ঢাকার নওয়াব স্টেট থেকে ক্লাবের জন্য জায়গা বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি স্থানীয় এবং বিদেশি অভিজাতদের একটি সংগঠনে পরিণত হয়।

মুসলিম সমাজের উন্নয়ন

উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজে সামাজিক বুদ্ধিভিত্তিক, রাজনৈতিক ধ্যান ধারণায় পশ্চিমা প্রভাব যেভাবে প্রভাবিত করেছিল মুসলিম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে ভিন্ন ছিল। তাঁরা রাজনৈতিক এমন কি বুদ্ধিভিত্তিক চর্চায় বৃটিশ দাসত্বকে মেনে নিতে পারেনি। বরং তাদের ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চাতেই সম্মানিত রোধ করতো। ইন্ডিয়ান মুসলমানস[১] (The Indian Musalmans) গ্রন্থের লেখক Sir W.W. Hunter মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে 'Backward' বা পশ্চাৎপদ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি খুব সহজ ছিল না। কেননা বৃটিশদের চোখে তখনও পর্যন্ত মুসলমানগণ বিদ্রোহী হিসেবে পরিচিত ছিল। উনবিংশ শতকের ষাটের দশকে মুলনমানগণ তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, আধুনিক বিজ্ঞান, ইংরেজী শিক্ষা এবং উন্নতর আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নতাকে তাদের সামাজিক পশ্চাৎপদতার কারণ বলে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে আলী গড়ের স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) এবং কোলকাতার নওয়াব আবদুল লতিফ অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন।

---

১. W.W. Hunter, *Indian Musalmans,* 3rd ed. (1st in 1878) (Delhi: Ideological Book House, 1969), P.41.

নওয়াব আব্দুল লতিফ (১৮২৭-৯৩) ১৮৪৬-৮৪ পর্যন্ত বৃটিশ সরকারের অধীনে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৮৬৩ সালে "মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা করেন। এই সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে নব জাগরণের সৃষ্টি করা। ঢাকার রক্ষণশীল, উচ্চশ্রেণির মুসলমানগণও এই সংগঠনের মূলধারার সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেন এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই সোসাইটির সমর্থনে ঢাকায় এর একটি শাখা খান মোহাম্মদ আসগর এবং মৌলভী এলাহাবাদ খান এর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] এই সোসাইটির প্রচেষ্টায় মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার লাভ করে এবং পুরাতন মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার সাধন করে ১৮৭৪ সালে ঢাকায় 'ঢাকা গভর্মেন্ট মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসলমান সংগঠন

ঢাকার প্রথম সংগঠন ছিল "সমাজ সম্মিলনী সভা" যা ১৮৭৯ সালে উবাইদুল্লাহ আল উবাইদী সোহরায়ার্দী (১৮৩২-১৮৮৫) এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন ঢাকা গভর্মেন্ট মাদ্রাসার সুপারিন্টেনডেন্ট। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ছিল এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। নওয়াব আহসানুল্লাহ এই সোসাইটিকে ৩০০ রুপি দান করেছিলেন বলে জানা যায় তবে প্রতিষ্ঠানটি কতদিন পর্যন্ত সক্রিয় ছিল সে সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। ঢাকার অপর একটি প্রতিষ্ঠান ছিল 'ঢাকা সুহৃদ সম্মিলনী' এটি একটি সংস্কারবাদী এবং সাম্প্রদায়িক উন্নয়ন ভিত্তিক সংঘ যা ঢাকা কলেজের মুসলিম ছাত্রদের দ্বারা ১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনটি "আঞ্জুমান-ই-আহবাব-ই ইসলামীয়া" নামেও পরিচিত ছিল। এর মুল উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় বিশেষ করে ঢাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধন। সংগঠনটি নারী শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিল এবং প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত উন্মুক্ত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাংলা ও উর্দু শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।[২] ছয় বছর পরে ঢাকার মুসলমান নাগরিকগণ ছাত্রদের নিকট থেকে এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে নেন। এবং আবুল খায়ের মোহাম্মদ সিদ্দিক তৎকালীন ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেনডেন্ট এর সভাপতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

---

১. Sharifuddin Ahmed, *Study in Urban History*, P.82

২. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*, প্রথমখন্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ২০০৩) পৃষ্ঠা-৩২৪

Dhaka University Institutional Repository

তবে প্রয়োজনীয় অনুদানের অভাবে সংগঠনটি তেমন কোন সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৭৭ সালে "সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোশিয়েশনের" প্রতিষ্ঠা করেন। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণ করেন। ১৯১১ সালের প্রচারপত্রে এর ৪৮টি শাখা সংগঠনের নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে ঢাকা ছিল একটি। তবে সংগঠনটি সাধারণ মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।[১]

বিংশ শতকের প্রথমদিকে কোলকাতা ভিত্তিক মোজলেম ইন্সটিটিউট ছিল এই ধরণের আর একটি সামাজিক ও শিক্ষামূলক সংগঠন। এই ধরনের আরো কিছু সংগঠন ঢাকাসহ বাংলার অন্যান্য জেলাগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি মূলত কোলকাতা কেন্দ্রিক হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঢাকার অংশ গ্রহণ ছিল। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ মুসলিম ইন্সটিটিউটের সম্মেলনে যোগদান করেন এবং ঢাকার বহু মুসলিম ছাত্র ও জনগণ এই সংগঠনের কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত হন। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ঢাকা নর্থ ব্রুক হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় "মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন" নামে একটি নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহ ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের দিন থেকে বাংলার ইতিহাসে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এ সময় থেকে ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের প্রধান নেতা ছিলেন। এই সময় ঢাকায় যে সকল সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয় সে সম্বন্ধে আহমদ হাসান দানী লিখেছেন,

These students, who were coming from the villages, had Bengali as their mother- tongue and rural manners and customs in day-to-day behaviour. They were almost ignorant of the ways of life that old Dacca had nurtured for centuries. For the first time do we get here a meeting ground of the old sophisticated urban people with the new rising rustic blood- the one which was pulling to the past and the other, untrained in the old tradition, was marching forward to the revolutionary ideas of the West. In the beginning the class of old nobility showed a patronizing attitude to this rising generation, and the newly educated, coming from humbler houses, had no higher aim than to be deputy magistrate or at best to get a place in the Indian Police service. Many of them got married in the older class and thus a little bit of cultural fusion did result. But very soon that class was outnumbered, and in the growing tide of the student movement new ideas and idealism superseded the dead superstitions of the past.[2]

---

১. See pamphlet on the Central Natoinal Mohmmedan Association, 1911, P-1.
২. Dani, *Dacca*, P-141.

Dhaka University Institutional Repository

এই ভাবে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং দেশের সংস্কৃতিবোধ সম্পন্ন সম্প্রদায়ের সমগ্র ঢাকা জেলা সর্বোপরি পূর্ব বাংলা বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সামাজিক নব জাগরণের সূত্রপাত্র ঘটায়।

অর্থনৈতিক অবস্থা

মোগল আমলে ঢাকা ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। সেই সাথে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প নগরী। রাজধানী ভোগ বিলাসের কেন্দ্র এবং অভ্যন্তরীণ বাদশাহী শুল্ক কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা দেশি-বিদেশি বনিক, সওদাগর ও ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। মোগল প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে ঢাকার বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধির সাথে সাথে নগরে আগমন ঘটে অনেক কারিগর, শিল্পী বিভিন্ন পেশাজীবী সম্প্রদায় যারা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। স্থানীয় চাহিদা মাফিক তারা নানা ধরনের জিনিসপত্র তৈরী করতো। ধনীদের বিশেষ করে অভিজাত মোগল, উচ্চ কর্মকর্তা, ধনী জমিদার, ব্যাংকার ও ব্যবসায়ীদের জন্য বিলাস সামগ্রী যেমন- সোনা, রূপার অলংকার, হাতীর দাঁতের কাজ, সুগন্ধী দ্রব্য ও এমন ধরনের অনেক সামগ্রী তারা প্রস্তুত করতো যা দেশের অন্যান্য অঞ্চলসহ বিদেশে রপ্তানী করা হতো।

ঢাকার প্রধান ও বিখ্যাত শিল্প ছিল সুতী কাপড়। ঢাকা ও আশেপাশের তাঁতীরা অতি সূক্ষ্ম মসলিন তৈরী করতো দেশে বিদেশে যার ছিল বিপুল চাহিদা। উপরন্তু নগর ঢাকা ছিল সমগ্র পূর্ব বাংলার মুসলিম ও অন্যান্য সুতি ও রেশম বস্ত্রের প্রধান বিপণী কেন্দ্র যার একটি বিরাট অংশ যেতো ইউরোপে। ১৭৬৫ সালের পর থেকে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসনকর্তা হয়ে উঠে এরপর থেকেই ঢাকার ব্যবসা বাণিজ্যের পতন শুরু হয়। দেশের নতুন রাজধানী কোলকাতার উদ্ভবের সাথে সাথে সেই শহরে ও তার আশে পাশে সকল ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রিভূতীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। সকল ব্যবসা বাণিজ্য কোম্পানি ও এর কর্মচারীদের একচেটিয়া দখলে চলে যাওয়ার সাথে সাথে ঢাকার ব্যবসা বাণিজ্য নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের সার্বিক মন্দার কারণে ঢাকার বড় বড় আর্মেনীয়, গ্রীক, কাশ্মীরী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অনেকে ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে তাদের মূলধন অন্যত্র যেমন- জমি, জমিদারী ও অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি কেনায় বিনিয়োগ করেন। ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের মারাত্মক অবনতি সত্ত্বেও ব্যবসা ও শিল্পের একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও বন্দর হিসেবে ঢাকার গুরুত্ব বজায় থাকে। ১৮৪৮ সালের দিকে ঢাকার আমদানী রপ্তানী সামগ্রীর যে তালিকা টেইলর দিয়েছিলেন তা থেকে পুরো দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলা অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সহজেই প্রতীয়মান হয়।[১]

---

১. James Taylor, *A sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, Calcutta, 1840, PP-184-185

ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি এর বাণিজ্যিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব আনে। এই বৃদ্ধির ফলে ঢাকার বাজারগুলো উনবিংশ শতকের শেষের দিকে পুনরায় চাঙ্গা হতে দেখা যায়। নতুন নতুন দোকান খোলা হয় আর ব্যবসার প্রকৃতিও বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে। বিলেতি প্রতিযোগিতায় একদিকে যেমন লোকজ শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি আবার ইংল্যান্ড থেকে বিপুল পরিমান সুতা আমদানীর ফলে তাঁতীদের জন্য তা সংগ্রহ করা সহজ লভ্য ও সুলভ হয়। দেশে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে প্রভাবিত নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির আর্বিভাব ঘটে যারা বিলেতি সামগ্রী সংগ্রহে উৎসাহী হয়ে উঠে। দেশের বিত্তবান জমিদারদের মধ্যে অনুকরণপ্রিয়তা অতিমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে ঢাকা হয়ে উঠে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় সকল বিলেতি জিনিস পত্রের সরবরাহকারী এক বাণিজ্যিক কেন্দ্র যা নগরীটির জন্য একটি বিশেষ গুরুত্ব সংযোগ করে। ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারের লোকেরা তাদের বাড়ি-ঘর ইউরোপীয় আসবাবপত্র দিয়ে সাজাতে থাকেন। এরা প্রায় সকলেই বিলেতি কাপড় ও জুতা পরতেন। তাঁরা উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মকর্তা ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্য প্রাসাদে বল নাচের ব্যবস্থা করতেন এবং ঘোড়-দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়াশাল ও ঘোড়া দৌড়ের জন্য ইংরেজ ঘোড়া সওয়ার নিযুক্ত করতেন। নবাব খাজা আব্দুল গণি ও তাঁর পুত্র আহসান উল্লাহকে সমসাময়িক এক ইংরেজ কর্মকর্তা এদেশের বিশিষ্ট পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ব্যক্তি বলে অভিহিত করেন।[১]

এই সময় সবচেয়ে বেশি যে শিল্পটি প্রসার লাভ করেছিল তাহলো চামড়া শিল্প। অতীতে এটি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বংশগত পেশা থাকলেও ১৮-শতকের শেষের দিকে ঢাকার আর্মেনীয়, ইরানী ও মুসলমান কাশ্মীরী ব্যবসায়ীরা এই ব্যবসা শুরু করেন। ১৯ শতকের প্রথমার্ধে চামড়া ব্যবসা করে ঢাকার অনেকে বিত্তবান হয়ে উঠে। এই নতুন ব্যবসায়ীদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ব্যক্তি ছিলেন নবাব খাজা আবদুল গণির পিতা খাজা আলিমুল্লাহ যিনি তার চামড়ার ব্যবসা থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা আয় করেন। ১৮৫০ এর দশকের মধ্যেই ঢাকার সকল আর্মেনীয়, ইরানী ও কাশ্মীরী চামড়ার ব্যবসায়ী বড় বড় জমিদারে পরিণত হন।

---

১. A.L. Clay, Principal Heads of the History and Statistics of the Dacca Division (Report on Dhaka was written by A.L. Clay the officiating collector and Magistrate of Dhaka in July, 1867), Calcutta, 1868, P.129

১৮৫০ এর দশক থেকে ঢাকা জেলাসহ পূর্ব বাংলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলায় নীল, জাফরান ইত্যাদি চাষ শুরু হয়। ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নীল, চা, চাল, আফিম আখ ও পাট বাংলার প্রধান বাণিজ্যিক কৃষি পণ্য হিসেবে বিশ্ববাজারে পরিচিতি লাভ করে। ১৮৫৫ সাল থেকে কোলকাতায় পাটকল স্থাপনের সাথে সাথে পূর্ব বাংলায় পাটের চাষ দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর আর ত্রিপুরার কৃষকরা ধান রোপণ কমিয়ে তাদের জমিতে বেশি করে পাট চাষ করতে শুরু করে। উল্লেখ্য যে, এই জেলাগুলি পরবর্তীতে পূর্ব বাংলায় পাট উৎপাদনের প্রধান এলাকা হিসেবে গড়ে উঠে। ১৮১৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট পাসের পর থেকেই বেশ কিছু ইউরোপীয় মূলত ব্রিটিশ বেসরকারী স্বতন্ত্র ব্যবসায়ীরা ঢাকায় আসেন। এরা প্রধানত নীলকর বা তাদের সহকারী হিসাবেই আসেন এবং ঢাকা জেলার বিভিন্ন জায়গায় নীল চাষ এবং নীলকুঠি স্থাপন করেন। বেশিরভাগ নীলকররা ঢাকা শহরেই বাস করতেন এবং নীল রপ্তানীর কাজ তদারক করতেন। নীল রপ্তানী ব্যবসায় ঢাকার কিছু দেশি ব্যবসায়ীও মূলধন যোগাত। ঢাকার বিখ্যাত নীলকরের মধ্যে যোশিয়া পেট্রিকওয়াইজ এবং জর্জ ল্যাম্ব নীল ব্যবসা করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন এবং বড় বড় জমিদারীর মালিক হন। জেমস ওয়াইজের জমিদারী ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর এবং বরিশাল জেলায় বিস্তৃত ছিল।

পেশাগত ভাবে ঢাকার জনগণকে এসময়ে মোটামুটিভাবে পাঁচটি শ্রেণি ভাগ করা যায়। যথা (১) জমিদার ও বিষয় সম্পত্তির মালিক (২) ব্যবসায়ী বণিক ও ব্যাংকার (৩) পেশাজীবী চাকুরে (৪) কারিগর, শিল্পী ও উৎপাদনকারী এবং (৫) শ্রমিক ও দিনমজুর। ঢাকাতে বেশ কিছু জমিদার ও সম্পত্তির মালিক ছিলেন যারা গ্রামাঞ্চলের জমিদারী থেকে এবং নগরে বাড়ীঘর ও অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতেন। এই শ্রেণিটি স্বাভাবিক ভাবে ছিল স্বচ্ছল। ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের সাথে সাথে ব্যবসায়ী বণিক ও ব্যাংকারদের মুনাফা বেড়ে যায়। এদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন ঢাকার ধনাঢ্য ব্যাক্তিদের অন্যতম বিভিন্ন ধরনের চাকুরীজীবী, পেশাজীবী, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী স্কুল শিক্ষক, অধ্যাপক এবং নবাবদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নির্ধারিত মাসিক বেতন পেতেন। নিম্ন শ্রেণির লোকদের আয় ছিল নিতান্তই কম। নিম্নমানের কেরানী ও কর্মচারীর বেতন শহরের সংখ্যা গরিষ্ঠ কারিগর, শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র দোকানদার ও কারিগরদের আয় ছিল প্রায় সমান সমান। এই সময়ে ঢাকার বেশির ভাগ কারিগর, ক্ষদ্র ব্যবসায়ী শ্রমিক এবং অন্যান্য মজুর কেবল গতর খেটে খেয়ে বেঁচে থাকত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শ্রমিকদের চাহিদাবৃদ্ধি পেলেও সত্যিকার অর্থে তাদের জীবনযাত্রায় মানের কোন পরিবর্তন হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর উন্নয়ন

ঢাকার নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠে। ১৮৭০ সালে দীনা নাথ সেন এবং অভয়দত্ত প্রমুখের প্রচেষ্টায় "অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা" প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা বছরে ১৫০ রূপী অনুদান সরকারের নিকট হতে লাভ করতো। তারা গৃহ অভ্যন্তরে পরীক্ষা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করে নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করেন। জগন্নাথ স্কুলের শিক্ষক নবক্রান্ত চট্টোপাধ্যায় এই আন্দোলনকে ঢাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের দিকে ধাবিত করে। তিনি ১৮৭১ সালে ঢাকা সুভোস্বাধীনি সভা প্রতিষ্ঠা করে এবং এর ছত্রছায়ায় প্রাপ্ত বয়স্ক নারী শিক্ষার স্কুল চালু করেন। ১৮৭৬ ইন্ডিয়াস প্রোগেসিভ মুভমেন্টের একজন সমর্থক এবং একজন ইংরেজ সংস্কারক মেরী এন্ডারসন তাঁর প্রতিবেদনে ঢাকার নারী শিক্ষা সম্বন্ধে যে বক্তব্য পাওয়া যায় তা হলো Dacca, the capital of east Bengal, though somewhat remote, is considerably in advance of other places in female education, through the efforts of many enlightened native Gentlemen. Here I found a small adult school, unique in its character, which is Chiefly attended by married ladies, whose husbands desire for them intellectual movement. Some of them learnt English.[১] তাঁর এই প্রতিবেদনে উৎসাহী হয়ে সরকারী টাকায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা সে বিষয়ে Philanthropic সোসাইটির নিকট একটি প্রতিবেদন চায়। নবক্রান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রাপ্ত বয়স্ক নারী শিক্ষা স্কুলটি সেই সময়ে সরকারের নিকট হস্তান্তর করেন এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার এ্যাসলে ইডেন এর নাম অনুসারে স্কুলটির নাম ইডেন গালর্স স্কুল রাখা হয়। ঢাকার নারী শিক্ষা উন্নয়নে অন্য যে সব সংগঠন কাজ করেছিল তাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ নিবারণী সভা, শুভকারী সভা, ঢাকা সুহৃদ সম্মিলনী এবং ঢাকা মাতৃ নিকেতন ইত্যাদি প্রধান। ঢাকা মাতৃ নিকেতন ছিল মূলত একটি পতিতা পুনর্বাসন কেন্দ্র। যার পূর্ব নাম ছিল ঢাকা বালিকা উদ্ধার আশ্রম। ১৮৯৬ সালে শশী ভূষণ মল্লিক কর্তৃক তাঁর নিজের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে তা ঢাকা মাতৃনিকেতন হিসেবে পরিচিত হয়। ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠানটি ইস্ট বেঙ্গল এরং আসাম সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয়। নারী স্বাধীনতা ছিল উনবিংশ শতকের সামাজিক আন্দোলনের মুল প্রতিপাদ্য যা সতী এবং বাল্যবিবাহের বিরূদ্ধে কাজ করে এবং বিধবা বিবাহ ও নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করে। ১৮৯৫ সালে পতিতাদের বিরূদ্ধে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এতে অল্প বয়সী নারী অপহরণের বিরূদ্ধে জন সচেতনতার বৃদ্ধি করা হয়। তারা অপরাধীদের বিরূদ্ধে মামলা করে বিষয়টি আইন সভার দৃষ্টি গোচর করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পতিতাদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে পুনর্বাসন করা।

---

১. Mary carpenters Report to the secretary of state for india, August 1876, Bengal Education consultations, No.874 (May 1877): 204

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকাসহ বাংলার বিভিন্ন জায়গায় খ্রিস্টান মিশনারীজ অনুকরণে এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

রুচি ও পছন্দের পরিবর্তন

পশ্চিমা প্রভাব ও ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব জনগণের রুচি ও পছন্দের উপরেও প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ ক্রিকেট, হকি, ফুটবল, জিমন্যাস্টিক এবং এ্যাথলেথিক এর মতো খেলাগুলো জনগণের পছন্দের তালিকায় স্থান পায়। এলেনের বর্ণনা অনুযায়ী ক্রিকেট ফুটবল ও হকির মতো খেলা গ্রামেও প্রচলিত ছিল।[১] ঢাকা শহরের লোকজন বিভিন্ন ধরনের ইউরোপীয় পোশাক যেমন- প্যান্ট, শার্ট, টাই পরতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্যুট, বুট পরিধান করতেন। বিশেষ করে শহরে চামড়ার জুতো উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির পছন্দের বিষয় ছিল। তবে গ্রামে সেই সময়ে এই ধরণের কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি। খাবারের ক্ষেত্রে ভাত, মাছ ইত্যাদি জনপ্রিয় ছিল। অষ্টাদশ শতক হতে বাকরখানি ঢাকার জনগণের অতি পছন্দের খাদ্য তালিকায় স্থান করে নিয়েছিল। চা-পাতি ঢাকাবাসীর খাদ্য তালিকায় উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে যুক্ত হয়। বিংশ শতকের বাগদাদী রুটি ঢাকাবাসীর পছন্দের খাদ্য তালিকায় যুক্ত হয়। এক ইঞ্চি পুরু এই রুটি মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব শবেবরাত-এ বিলি বণ্টন করা হতো। চা জনপ্রিয় পানীয় হিসেবে ঢাকায় প্রচলিত ছিল। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এই সময় ঢাকার সমাজ ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। ঢাকার রক্ষণশীল মনোভাবী জনমত এই পরিবর্তনের ধারায় শিথিল হতে থাকে। ঢাকার নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, আইনজ্ঞ, ডাক্তার, শিক্ষক, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, লেখক ও রাজনৈতিক হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে সামাজিক ক্ষেত্রে এক আঞ্চলিক বিপ্লবের সূচনা করে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর এই আন্দোলন তরুণ সমাজের মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হয়। তরুণদের অনেকেই এই সময় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদন, ব্যবসা ও শিল্পকে জীবন ধারণের অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করে। ঢাকা পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্নমুখী উন্নয়নের অগ্রযাত্রা আরও অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হতে থাকে।

ঢাকার জমিদারদের পরিচিতি

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বহু প্রাচীন জমিদার অবসানের পাশাপাশি নতুন এক জমিদার শ্রেণির উদ্ভব হয়। ঢাকায় এই ধরনের জমিদারদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিদেশি এবং অনুপস্থিত ভূ-স্বামী (যাদের ঢাকায় জমিদারী ছিল কিন্তু ঢাকার বাইরে অন্য জেলায় বসবাস করতেন এমন) তবে ঢাকার জমিদারদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন স্থানীয় এবং তাঁরা ঢাকা জেলাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন।

---

১. B.C. Allen, *Eastern Bengal Gazetteers*, P.59

ইউরোপীয় ভূ-স্বামীদের মধ্যে যারা প্রধান ছিলেন তাদের মধ্যে-জোসিয়া প্যাট্রিক ওয়াইজ, যিনি ঢাকায় বেশ কিছু নীল কুঠি ও জমিদারীর স্বত্ত্বাধিকারী ছিলেন। ডি. ডম্বল-এর একটি ফ্যাক্টরী এবং কিছু ক্ষুদ্র জমিদারী বা তালুক ছিল। এ. হ্যালো এবং আই কে. হিউম-এরাও ঢাকার বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। এদের মধ্যে হিউম ছিলেন একজন প্রখ্যাত নীল উৎপাদক।

ঢাকার সবচেয়ে প্রভাবশালী ইউরোপীয় জমিদারের মধ্যে উনবিংশ শতকে অর্মেনীয়ানরাই ছিলেন বিখ্যাত। এদের মধ্যে নিকি পোগজ, পি. আরাতুন, জে.জি পানিয়ার্টী, কোসা মাইকেল, জে.টি লুকাস, জে.এস ষ্টিফেন, মানুক, ডব্লিউ হার্নি এবং এম সারকাইজ এদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের অর্থবিত্তের প্রধান উৎসই ছিল জমিদারী এবং ব্যবসা। এই সময়ের সর্বাধিক সম্ভাবনাময় মুসলিম জমিদারী ছিল খাজা আলীমুল্লা প্রতিষ্ঠিত নওয়াব বা খাজা পরিবার। কাশ্মীর থেকে আগত খাজা আলীমুল্লার পরিবার প্রথমে ব্যবসায়ী হিসেবে সুনাম অর্জন করেও পরবর্তীতে জমিদার হিসেবে সুপরিচিত হন। খাজা আলীমুল্লার পুত্র খাজা আব্দুল গণির সময় এই জমিদারীর বাৎসরিক আয় ছিল এগার লক্ষ রুপি।[১] ঢাকার আর একজন নব্য জমিদার ছিলেন আমিরুদ্দিন দারোগা। যিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে দারোগা হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং প্রভূত অর্থ সম্পদ অর্জন করে টিপ্পেরা সহ অন্যান্য স্থানে জমিদারী ক্রয় করেছিলেন। মীর্জা গোলামপীর এবং নানকুমিয়া ছিলেন ঢাকার অপর দুইজন জমিদার। তবে নানকু মিয়া সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। মীর্জা গোলামপীর ছিলেন ঢাকার প্রাচীন জমিদারদের একজন। তিনি ঢাকার প্রভাবশালী জমিদার আবু সাইদের দৌহিত্র।

ঢাকার অনুপস্থিত ভূ-স্বামীদের মধ্যে ময়মনসিংহের দিওয়ান ইলাহী নেওয়াজ এবং ফরিদপুরের জালালদির শেখ এনায়েত উল্লাহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২] এনায়েত উল্লাহর জমিদারী ঢাকা, ফরিদপুর এবং বরিশাল জেলায় বিস্তৃত ছিল। তাঁর পুত্র শেখ মতিউল্লাহ নওয়াব জেসারত খানের সমসাময়িক ছিলেন।[৩] নবাব নসরত জং এর সময়ে মীর আশরাফ আলী ছিলেন ঢাকার অপর একজন প্রভাবশালী জমিদার।

---

১. Hridayanath Majumdar, *The Reminiscences of Dacca* (Kolkata: The author, 1926), P-79.

২. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal,* Vol.5, rpt. (Delhi: D.K. Publishing House, 1973), *P.*-106.

৩. মুন্সি রহমান আলী তায়েশ, *তাওয়ারিখ-ই-ঢাকা* (ঢাকার ইতিহাস) অনুদিত; এ.এম.এম. শরীফ উদ্দীন (ঢাকা: ইসলামিয়াত ফাউন্ডেশন, ১৯৮৫), পৃ-১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর পুত্র আলী মেহেদী খান এবং সাইয়েদ আলী হাসান খান দুজনই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট হতে খান বাহাদুর উপাধি লাভ করেছিলেন। মীর নওয়াব ছিলেন ঢাকার আর একজন প্রাচীন এবং ক্ষুদ্র জমিদার। তাঁর জমিদারী আব্দুল্লাহপুর এবং আটিয়া (ইটিয়া) পরগনায় ছিল। মুন্সিগঞ্জেও তাঁর জমিদারী ছিল যা পরবর্তীতে রামসদ্দার নামে একজন ব্যবসায়ী খরিদ করে নেয়। আঠার শতকে পারস্য থেকে আগত ঢাকার একজন জমিদার ছিলেন মীর আলী নকী কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর বংশধরদের সম্পর্কে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তবে ঢাকা শহরে আলী নকীর দেউড়ী নামে একটি মহল্লা এখনো রয়ে গেছে।[১] উনিশ শতকের প্রথম দিকে মানিকগঞ্জের বালিয়াটি পরগণার মীর আতাউর ছিলেন ঢাকার আর একজন প্রসিদ্ধ জমিদার। তবে কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁর জমিদারীটি হিন্দু মহাজনের নিকট বিক্রি হয়ে যায় এবং তাঁরা বালিয়াটির জমিদার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।[২] মানিকগঞ্জের অপর একজন প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন মৌলভী আব্দুল আলী। তাঁর জমিদারী নবাবগঞ্জ, মানিকগঞ্জ এবং ঢাকার হরিরামপুরে বিস্তৃত ছিল। তাঁর জমিদারীর কিছু অংশ সিরাজগঞ্জেও ছিল।[৩] ঢাকার অন্যান্য প্রসিদ্ধ জমিদারের মধ্যে শেখ মোহাম্মদ জান, আগা গোলাম আলী, মীর মোহাম্মদ তুর্কী, মীর্জা হাসান আলী, মীর্জা হায়দার আলীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।[৪] এই সময়ে ঢাকায় বেশ কিছু হিন্দু জমিদারও সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাদের মধ্যে রঘুনাথ দাস এবং রূপলাল দাস এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁরা হিন্দু জমিদারদের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ জমিদারীর অধিকারী ছিলেন।[৫] ঢাকার হিন্দু জমিদারদের মধ্যে মদনমোহনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করে প্রভুত প্রসিদ্ধি অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে ঢাকা ও এর আশে পাশে ভূমি ক্রয় করে জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন।মদনমোহন বসাক ঐ সময়ে ঢাকার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। নীল ব্যবসায় বিশেষ উন্নতি সাধন করে জগন্নাথ রায় উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

---

১. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৪১।
২. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৪২।
৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৪২।
৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৪২।
৫. Sharif uddin Ahmed, *Dhaka: A Study in Urban History and Development 1840-1921* (Dhaka: Academic Press and Publishers Limited, 1986), P-115

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর পুত্র জীবন কৃষ্ণ রায় ছিলেন তাঁর সময়ে একজন প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাধর জমিদার।[১] ঢাকার অন্যান্য হিন্দু জমিদারদের মধ্যে রাজা পরশুরাম, ভীখননাল পান্ডের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২] ঢাকার মনিকগঞ্জে বেশ কিছু ছোট বড় জমিদারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের বেশির ভাগই প্রথম জীবনে ব্যবসায়ী ছিলেন এবং পরে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করে জমিদারে পরিণত হয়। এদের মধ্যে সাটুরিয়ার বালিয়াটি জমিদার, শিবালয়ের তেঁওতা জমিদার, ধানকোয়া এবং বালেশ্বরের মাচাইন জমিদারদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩] এছাড়াও গাজীপুরের ভাওয়াল রাজ পরিবার, মানিকগঞ্জের রায় পরিবার, লৌহজংয়ের পাল-বাবুরা, ভাগ্যকুল পরিবার, কলাকোপার নাগ বাবুগণ, নারায়ণগঞ্জের গুপ্ত পরিবার, রূপগঞ্জের ব্যানার্জী পরিবার, বিক্রমপুর পরগণার শ্রীনগরের বাবুরা, ঢাকার ছোট এবং বড় জমিদার পরিবারের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

মূলত উনিশ বিশ শতকের ঢাকা জেলায় যে সমস্ত জমিদারদের উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের বেশির ভাগই ছিলেন ব্যবসায়ী শ্রেণির লোক। লবণ, পিতল, কাপড়, স্বর্ণ ইত্যাদির ব্যবসায় প্রভূত অর্থ উপার্জন করে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করে পরবর্তীতে জমিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

---

১. মুনতাসির মামুন, *ঢাকা সমগ্র* ,বই-১ (ঢাকা: অনন্য প্রকাশনা ২০০৩), পৃ-২৩৭-৩৮।

২. তায়েশ, *তাওয়ারিখ-ই-ঢাকা*, পৃ-১৪৩

৩. মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন (সম্পাদিত), *মানিকগঞ্জ জিলার ইতিহাস* (ঢাকা : অষ্ট্রিক প্রকাশক, ১৯৮৭), পৃ-১৬৮ এবং ৩৮০।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

উনিশ-বিশ শতকে ঢাকার জমিদারবাড়ি সমূহের ধরণ ও স্থাপত্যিক বিশ্লেষণ

প্রাচীনকাল থেকে ঢাকা একটি সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল হিসেবে গুরুত্ব পেয়ে আসছে। ভৌগলিক অবস্থানের দিক দিয়েও এই অঞ্চলটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ঢাকার ইতিহাস প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন । নরসিংদী জেলার উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত নিদর্শন ঢাকার প্রাচীন ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে। নবম শতক পর্যন্ত এই অঞ্চলটি বৌদ্ধ শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। বৃহত্তর ঢাকা জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রত্নসম্পদ থেকে এর যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায়। সাভারে প্রাপ্ত স্তুপ, হরিশ চন্দ্র রাজার ঢিবি ও অন্যান্য প্রত্ননির্দশন যেমন- নিবেদন স্তুপ, বিভিন্ন তাম্রশাসন থেকে এই অঞ্চলের অতীত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সত্যতা পাওয়া যায়। সেন রাজাগণ লক্ষণাবতী থেকে বিতাড়িত হয়ে ঢাকার বিক্রমপুরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেনরাজা বল্লাল সেনের বাড়ি কিংবদন্তি অনুসারে মুন্সিগঞ্জের রামপালে অবস্থিত ছিল। মুসলিম শাসনামলের প্রথম পর্যায় সুলতানী আমলে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ পূর্ব বাংলার রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সোনারগাঁয়ের প্রাপ্ত বিভিন্ন স্থাপত্য নির্দশন যেমন সোনারগাঁয়ের মোগড়পাড়া, দমদমা বা দূর্গ বিভিন্ন প্রাচীন মসজিদ (গোয়ালদি মসজিদ) ইত্যাদি, গিয়াসউদ্দিন আযম শাহর মাজার, প্রখ্যাত সুফী মওলানা শেখ সাইফুদ্দিন আবু তায়ামার মাদ্রাসা ও খানকা এখানে নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া পঞ্চদশ শতকে নির্মিত ঢাকার বিনত বিবির মাজার ও মসজিদ সুলতানী স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। মোগল শাসনামলে বিশেষ করে ইসলাম খান ঢাকায় বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপনের পর থেকে পরবর্তীকালে প্রায় সকল সময়েই ঢাকা বাংলার অতি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এসময় থেকে ঢাকায় ধর্মীয় ও লৌকিক উভয় ধরনের স্থাপত্যের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। দূর্গ (ইদ্রাকপুর দূর্গ, হাজীগঞ্জ দূর্গ, সোনাকান্দা দূর্গ), দূর্গ প্রাসাদ যেমন লালবাগ কেল্লা, জিঞ্জিরা প্রাসাদ ইত্যাদি। সমাধি- বিবি পরির সমাধি, বিবি মরিয়মের সমাধি, হাজী খাজা শাহবাজের সমাধি ও মসজিদ ইত্যাদি ছাড়াও সাত মসজিদ, ইসলাম খার মসজিদ, বেগম বাজার মসজিদ, মৃধার মসজিদ, লালবাগ দূর্গ মসজিদ সহ বহু ধর্মীয় স্থাপত্য ঢাকাকে সমৃদ্ধ করেছে। এসময় থেকে ঢাকায় মোগল প্রশাসক ছাড়াও বিভিন্ন জমিদার কর্তৃক নির্মিত স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় যেমন- মুসা খানের মসজিদ, দেওয়ানগঞ্জে অবস্থিত ঈসা খান নির্মিত মসজিদ ইত্যাদি। উপনিবেশিক শাসনামলেও এ অঞ্চলের গুরুত্ব কোন অংশে কম ছিল না। রাজনৈতিকভাবে ঢাকা যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে স্থাপত্য ক্ষেত্রেও এই অঞ্চল অনুরূপ গুরুত্বের অধিকারী। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ঢাকার যে সকল শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়েছে স্থাপত্য ক্ষেত্রে তারা সকলেই এই অঞ্চলে তাদের বিশেষ অবদান রেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

জমিদার আমলের স্থাপত্যের ধরন

স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে এদেশের জমিদারদের অবদান অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারার যে অনুপ্রবেশ ঘটে তা বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও প্রভাবিত করে। আর বাংলার সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটানোর ধারক ও প্রবর্তক ছিলেন এদেশের জমিদার ও শহুরে ব্যবসায়ীরা। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে যথা আহার- বিহার, আচার-আচরণ, পোষাক-আশাক ইত্যাদিতে ইংরেজ প্রভুদের যেমন অনুকরণ করেন তেমনি সংস্কৃতির বৃহত্তর পরিমন্ডলে ব্রিটিশ স্থাপত্য ঐতিহ্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এদেশের মধ্যযুগীয় স্থাপত্যকলার ধারাবাহিকতায় এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করেন। তাদের নির্মিত মিশ্ররীতির স্থাপত্যসমূহ ইন্দো-ইউরোপীয় বা ইন্দো-ব্রিটিশ বা ঔপনিবেশিক স্থাপত্য নামে পরিচিত। যদিও এ ধরনের স্থাপত্যরীতির বিকাশ ঘটান স্বয়ং ব্রিটিশ শাসকরা কিন্তু যথাযথ লালন-পালন ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে একে জনপ্রিয় করে তোলেন বাংলার জমিদার ও শহুরে ব্যবসায়ীরা। বিশেষ করে জমিদাররা ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতির পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটান তাদের নির্মিত প্রাসাদসমূহে। স্বীয় জমিদারি এলাকার নামকরণে পরিচিত বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় নির্মিত অসংখ্য জমিদারি প্রাসাদ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান যেগুলোর অধিকাংশই বর্তমানে ভগ্নদশাগ্রস্ত ও অবহেলিত। উনিশ বিশ শতকে নির্মিত এসব জমিদারি প্রাসাদের নির্মাণশৈলী বাংলার মধ্যযুগীয় স্থাপত্য নির্মাণধারা হতে অনেকাংশে ভিন্নতর ও বিশেষ রীতিতে নির্মিত।[১]

জমিদারদের নির্মিত স্থাপত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১. ভূমি নকশা ও স্থাপত্য পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলা তথা ঢাকার প্রাসাদসমূহ সাধারণত দুই ধরনের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যথা- (ক) উন্মুক্ত অঙ্গন কেন্দ্রিক ইমারত ও (খ) হলঘর কেন্দ্রিক ইমারত। অঙ্গন কেন্দ্রিক ইমারতসমূহের অঙ্গনের চতুর্দিক উন্মুক্ত খিলানসারি কিংবা স্তম্ভসারি সংবলিত বারান্দা বেষ্টিত এবং বারান্দার সাথে কক্ষগুলো সন্নিবেশিত কোন কোন প্রাসাদে একাধিক উন্মুক্ত অঙ্গন পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে হলঘর কেন্দ্রিক প্রাসাদসমূহের কেন্দ্রীয় হলঘরকে কেন্দ্র করে অন্যান্য কক্ষগুলো বিন্যাস্ত হলঘরের দেয়াল অন্যান্য কক্ষের দেয়াল অপেক্ষা উঁচু করে নির্মিত এবং প্রায়শই আলো ও বায়ূ প্রবেশের জানালা সংবলিত অঙ্গন কেন্দ্রিক প্রাসাদসমূহেরও হলঘর রয়েছে।

---

১. এ.বি.এম হোসেন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-২*,ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ-৩৫৪

Dhaka University Institutional Repository

২. নিরাপত্তা ও সুরক্ষাজনিত কারণে প্রাসাদসমূহের চারিদিক পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। যেসব প্রাসাদে পরিখা নেই সেগুলোর চারিদিকে খনন করা হয়েছে বড় বড় পুষ্করিণী। প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত জায়গাও প্রাসাদ নির্মিত হয়ে থাকে, যেমন নদী, হ্রদ ও জলাশয়ের তীরে।

৩. প্রাসাদসমূহের নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ইট, চুন-সুরকি, লোহা, কাঠ এবং কিছু কিছু শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তর। সাধারণত লোহা ও কাঠের তীর-বর্গা, লোহার স্তম্ভ, কাঠের দরজা-জানালা, কাঠের সোপান ও মেঝেতে পলেস্তারার আস্তরণ প্রায় সব ইমারতেই এবং ক্ষেত্র বিশেষ শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তর ফালি, টালি ও রঙিন চিনিটিকরির (চিনামাটির ভেজসপত্রের টুকরা)স্টাকো; জালির কাজ এবং বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত কাঁচের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

৪. প্রাসাদসমূহের স্থাপত্যশৈলী ও অলঙ্করণে ইন্দো-ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় নির্মাণশৈলীতে অত্যন্ত সুরুচির সাথে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের গ্রিক ক্লাসিক্যাল স্তম্ভ যথা- ১. ডরিক, নির্মিত ভূঁসুয়া পদ্ধতির অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলান এবং রেঁনেসা যুগের গম্বুজ সংযোজনের পাশাপাশি অলংকরণ বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত জীব প্রতীক ২.আইওনীয় ৩.করিন্থীয় এবং ৪. তুস্কান রীতি, ছাদপাঁচিলে (Pediment) ত্রিকোণাকার কাঠামোর ব্যবহার লক্ষণীয়। ফ্যানলাইট, ভেনিসীয় খড়খড়ি ইত্যাদি যেমন ইউরোপীয় স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন তেমনি, কৌণিক খিলান ও গম্বুজ, অলঙ্করণে আরব্য নকশা(Arabesque) ইত্যাদির ব্যবহারে মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। অধিকন্তু ইমারতের খিলানসারি ও নাচঘরে রোমান রীতিতে ইউরোপীয় ও ভারতীয় নির্মাণ রীতির প্রভাবকে নির্দেশ করে। প্রতিটি প্রাসাদেই রয়েছে সুউচ্চ বিশালাকৃতির প্রবেশ তোরণ, প্রাসাদ সংলগ্ন কর্মচারিদের আবাসস্থল, ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের জন্য মন্দির এবং প্রাসাদ থেকে কিছু দুরে নির্মিত থাকতো ঘোড়াশালা, হাতিশালা ইত্যাদি। এছাড়া প্রাসাদ সম্মুখস্থ ছাদপাঁচিলে প্রাচীন গ্রিক রোমক স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত মানব ভাস্কর্য এবং পরী পরিলক্ষিত হয়। দৈনন্দিন জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সরবরাহের জন্য প্রায় প্রতিটি প্রাসাদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত একটি করে ছোট্ট বাজার।[১]

ভূমি নকশা ও স্থাপত্য পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকার উনবিংশ ও বিংশ শতকের জমিদার বাড়িগুলো দুইভাগে বিভক্ত ক. অঙ্গন কেন্দ্রিক জমিদারবাড়ি খ. হলঘর কেন্দ্রিক জমিদারবাড়ি।

১. প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৫৫

ক. অঙ্গন কেন্দ্রিক জমিদারবাড়ি

রূপলাল হাউজ

আলোকচিত্র ঃ ১,২,৩ ভূমি নকশা ঃ ১

অবস্থান

বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে পুরান ঢাকার ফরাসগঞ্জ রোডে রূপলাল হাউজ অবস্থিত। উনিশ শতকে ঢাকায় স্থাপত্য সমূহের মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ইমারত। সমগ্র ইমারতটি ৩০০ ফুট বিস্তৃত এবং ইংরেজী 'E' অক্ষরের ন্যায় তিনটি ব্লকে বিভক্ত।

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

রূপলাল হাউজ তিনটি স্বতন্ত্র ইমারত নিয়ে গঠিত। ইমারতগুলো প্রথম তলায় আলাদা আলাদা ভাবে নির্মিত হলেও উপরের তলায় খিলান দ্বারা সংযুক্ত। উক্ত ইমারতের পশ্চিম বাহুর স্থাপনাটি রূপলালের বাড়ি, মাঝেরটি কেন্দ্রিয় ব্লক এবং পূর্ব বাহুটি 'রঘুনাথের বাড়ি' নামে পরিচিত।

রূপলালের বাড়ি

বাড়িটি এখানকার অন্যান্য অংশের তুলনায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং নব্য ধ্রুপদী (Neo- Classical) রীতিতে তৈরি। একটি বর্গাকার অঙ্গনযুক্ত ইমারতটি পরিকল্পনাও বর্গাকার। ইমারতের মূল প্রবেশ পথটি উত্তর দিকে। প্রবেশ পথে ছয়টি করন্থীয় শিরাল স্তম্ভ সহযোগে নির্মিত। প্রবেশ পথের ঠিক উপরে রেঁনেসা রীতির ত্রিকোনাকার পেডিমেন্ট নির্মাণ করে একে একটি রাজকীয় রূপ প্রদান করা হয়েছে। ইমারতের অঙ্গণের চারিদিকে করিন্থীয় শীর্ষযুক্ত স্তম্ভ সারি রয়েছে। স্তম্ভসারির পিছনে অঙ্গনের চারিদিকে রয়েছে মোট বারটি কক্ষ। দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের কক্ষগুলোর বাইরের দিকে রয়েছে টানা বারান্দা। অঙ্গণের চারিদিকে কক্ষগুলো টানা বারান্দার পিছনে সারিবদ্ধভাবে নির্মিত। পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ও উত্তর-পূর্ব কোণে রয়েছে দোতলায় ওঠার জন্য কাঠের নির্মিত তিনটি সিঁড়ি। ইমারতটিতে বিভিন্ন ধরনের জানালা ও খিলানের ব্যবহার দেখা যায়। স্তম্ভ নির্মাণে গোলায়িত ও চতুস্কোণ উভয় ধরনের স্তম্ভ ব্যবহার হয়েছে। ইমারতটি সম্পূর্ণ ইটের তৈরি এবং এর গাথুনীতে চুন সুরকী ব্যবহার করা হয়েছে। দেয়াল গুলো ২৫ ইঞ্চি পুরু। ছাদ নির্মাণে কড়ি বর্গা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অলংকরণ

ইমারত অলংকরণে মোজাইক ও রঙিন কাচের সার্সি ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের খিলানের ব্যবহার। দরজা ও জানালা নির্মাণেও অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। রেলিং-এ ব্যবহৃত Cast-iron এর নকশাকৃত রেলিংও ইমারতটির শোভাবর্ধন করেছে। এছাড়া বারান্দার রেলিং এর উপরে কাঠের জাফরির ব্যবহার রোদ ও বৃষ্টি নিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

কেন্দ্রিয় ব্লক

কেন্দ্রিয় ব্লকটিও রূপলাল হাউজের অনুরূপভাবে নির্মিত। এই ব্লকটি আবাসিক এলাকা হিসেবে ব্যবহৃত হত। এখানে অন্যান্য কক্ষের পাশাপাশি নাচঘর, সঙ্গীতের জন্য কক্ষ ইত্যাদি বিদ্যমান । ইমারতের এই অংশটিতে সমস্ত খিলানই দরজা হিসেবে নির্মিত হয়েছে; এই অংশে কোন জানালা নেই। এখানে দুটি নাচঘর রয়েছে। নাচ ঘরের ছাদটি আয়না দ্বারা ফুলেল ও জ্যামিতিক নকশায় সজ্জিত। দরজাগুলোর খিলান পটে রয়েছে মোজাইকের অলংকরণ।[১] কোন কোন দরজার উপরে রঙিন কাচের নকশাও দেখা যায়। মেঝে নির্মাণে চিনি টিকরির নকশা ব্যবহৃত হয়েছে।

রঘুনাথ হাউজ

রঘুনাথ হাউজের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য ইমারতটির অন্যান্য অংশ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। এখানকার প্রবেশ পথে কোন খিলান ব্যবহৃত হয় নাই। স্তম্ভ নির্মাণেও সারল্য লক্ষ করা যায়। রেঁনেসা যুগীয় স্তম্ভ শীর্ষের পরিবর্তে এখানে সাধারণ চতুষ্কোণ স্তম্ভ শীর্ষ নির্মিত হয়েছে ।

নির্মাণ কাল

১৮২৫ সালে আরাতুন নামে একজন আর্মেনীয় ব্যবসায়ীর নিকট থেকে রূপলাল এবং রঘুনাথ জায়গাটি ক্রয় করেন এবং এখানে একটি রাজকীয় ভবন নির্মাণের জন্য কোলকাতার মার্টিন কোম্পানীর একজন স্থপতিকে নিয়োগ দেন। [২]

রূপলালের দাদা মাথুরনাথ উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ঢাকার একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ছিলেন। তার দুই পুত্র স্বরূপ চন্দ্র ও মধুসূদন উভয়েই সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। মাথুরনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বরূপ চন্দ্রের তিন

১. Faria Sharmin & Tahmina Ahsan, "*Architechtural Genesis of Ruplal House*, সামিনা সুলতানা সম্পাদিত ইতিহাস প্রবন্ধমালা ২০১১, ঢাকা, ইতিহাস একাডেমী ২০১২, পৃষ্ঠা:৩৯৭-৩৯৮।

২. Nazimuddin Ahmed, "*Buildings of the British Raj in Bangladesh*", The University Press Lmited, Dhaka 1986, P 58

Dhaka University Institutional Repository

পুত্রের মধ্যে সনাতন, রূপলাল ও রঘুনাথ এর মধ্যে সম্পত্তি ভাগাভাগি করে দেন। রূপলাল ও রঘুনাথ পরবর্তীতে যৌথভাবে উক্ত জায়গাটি আরাতুনের নিকট হতে ক্রয় করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তৎকালীন ভারতের ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন ১৯৮৮ সালে যখন ঢাকায় আসেন সেই সময়ে তাঁর সম্মানার্থে এই বাড়িতে নাচের আয়োজন করা হয়েছিল ।[১]

বর্তমানে নদীর তীর গুলো মশলা সবজি এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীর দ্বারা সম্পূর্ণ দখল হয়ে গেছে। বাড়িটি এখন পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত নয় বর্তমানে এই বাড়ির কক্ষগুলো স্থানীয় জনগণ দখল করে বসবাস করছে।

আলোকচিত্র ১: রূপলাল হাউজের অঙ্গনের উপর থেকে উঠানো, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।

১. *Ibid*, Page- 58.

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র ২: রূপলাল হাউজ, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা ।

আলোকচিত্র ৩: কাঠের ব্যালাস্ট্রেট সিঁড়ি, রূপলাল হাউজ, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা ।

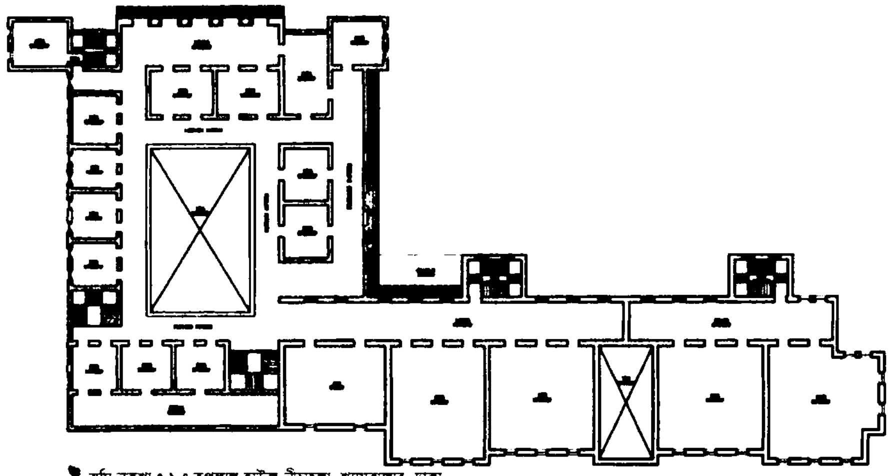

ভূমি নকশা ঃ ১ ঃ রূপলাল হাউজ-নীচতলা, শ্যামবাজার, ঢাকা

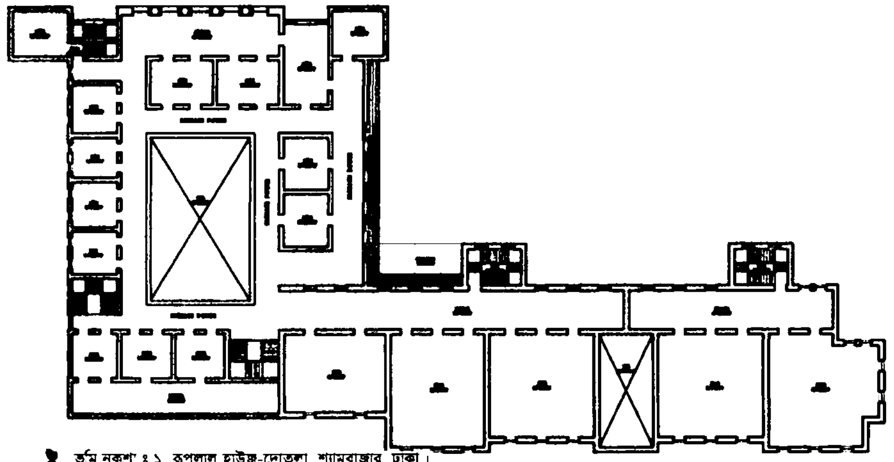

ভূমি নকশা ঃ ১ রূপলাল হাউজ-দোতলা, শ্যামবাজার, ঢাকা ।

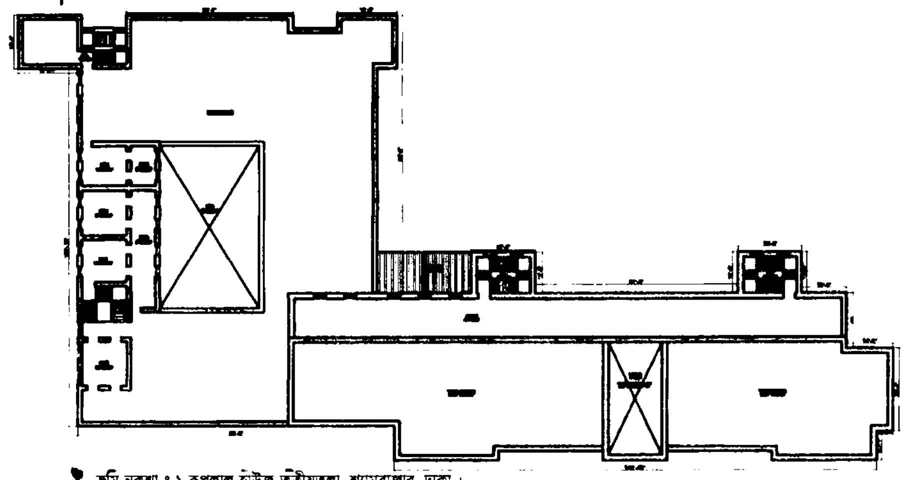

ভূমি নকশা ঃ ১ রূপলাল হাউজ-তৃতীয়তলা, শ্যামবাজার, ঢাকা ।

Dhaka University Institutional Repository

ভাওয়াল রাজপ্রাসাদ, জয়দেবপুর, গাজীপুর সদর
আলোকচিত্র ঃ ৪,৫,৬,৭ ভূমি নকশা ঃ ২

অবস্থান

ঢাকা শহর থেকে ৪০ কি:মি: উত্তরে গাজীপুর জেলা সদরের জয়দেবপুরে ভাওয়াল রাজ প্রাসাদটি অবস্থিত।[১] গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে প্রাসাদগামী রাস্তাটি পূর্ব দিকে প্রসারিত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট হয়ে জয়দেবপুর রেল স্টেশন এর পূর্বদিকে রাণী বিলাসমনি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন এর অবস্থান।

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

জয়দেবপুর রাজ প্রাসাদটি কয়েটি ইউনিট নিয়ে কমপ্লেক্স আকারে নির্মিত। প্রাসাদের মূল অক্ষের দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ৪০০ ফুট ও দ্বিতল বিশিষ্ট পরিকল্পনায় নির্মিত। দক্ষিণে নির্মিত হয়েছে এর মূল প্রবেশ দ্বার। দ্বিতল-বিশিষ্ট প্রবেশ দ্বারটি ও গাড়ি বারান্দাটি বর্গাকার এবং চার কোনে চারটি গোলাকার স্তম্ভ স্থাপন করে উপরে কড়ি বর্গা ব্যবহার করে ট্রাবিয়েট পদ্ধতিতে কাঠের ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রবেশ পথের কাঠামোর এক পাশের দৈর্ঘ্য ২০ ফুট এবং প্রবেশ দ্বারের পরে একটি প্রশস্ত বারান্দা রয়েছে যার ছাদও একই নির্মাণশৈলীতে তৈরী। এর পরেই রয়েছে হলঘর। হলঘরের পূর্ব ও পশ্চিমে উভয়দিকে তিনটি করে বসার কক্ষ বিদ্যমান। পরিকল্পনা অনুসারে প্রবেশ হলঘরের ডান দিকে দ্বিতলে ওঠার জন্য রয়েছে ঐতিহ্যবাহী শালকাঠের ব্যালাস্ট্রেড সহ সোপানশ্রেণি বা সিঁড়ি। সম্মুখ ভাগের এই অংশ পরিচিত বড় দালান হিসেবে। এটি ইউরোপীয় অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। সামনের অংশের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন তৎকালীন ম্যানেজার জন স্টুয়ার্ড।[২]

বড় দালানের পশ্চাতে রয়েছে ১০০ ফুট বর্গাকৃতির একটি উন্মুক্ত অঙ্গন। অঙ্গনে রয়েছে একটি নাটমন্ডপ। নাটমন্ডপের উপরিভাগ চুন সুরকি মিশ্রিত মশলা দিয়ে প্রস্তুতকৃত কতগুলো নলাকৃতির স্তম্ভের উপরের ছাদ রয়েছে যা বর্তমানে ঢেউ টিন দ্বারা আচ্ছাদিত। অঙ্গনের দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দ্বিতল বিশিষ্ট আবাসিক কক্ষ সম্বলিত তিনটি বক্ল পরিলক্ষিত হয়। ব্লক সমূহের সম্মুখে অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলান সম্বলিত টানা বারান্দা বিদ্যমান। অঙ্গনের চতুর্দিকের খিলানসমূহ কতগুলো করিন্থীয় স্তম্ভের উপর স্থাপিত।

১. এ.বি.এম হোসেন (সম্পা.), স্থাপত্য, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-২*, ঢাকা,বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃঃ- ৩৮৬।

২. মোঃ ফরিদ আহম্মদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস ও ঐহিত্য*, সাহারা হোমিও হল, বাহাপাড়া, ২০০১, পৃঃ ২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোপরি এটি একটি উন্মুক্ত চত্বর যার উভয় প্রান্তে রয়েছে দুটি চৌচালা মন্দির এবং এর পশ্চাতে রয়েছে দ্বিতল বিশিষ্ট একটি সাদাসিধে ইমারত। প্রথম অঙ্গনের পশ্চাতে আরো উত্তরে রয়েছে আরেকটি উন্মুক্ত অঙ্গন। এই অঙ্গনের তিনদিক আবাসিক কক্ষ সম্বলিত তিনটি দ্বিতল বিশিষ্ট ইমারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইমারত সমূহের সম্মুখভাগে গোলায়িত যুগল স্তম্ভের উপর ছাদ নির্মিত হয়েছে। অঙ্গনের উত্তর দিকে রয়েছে একটি পারিবারিক মন্দির। মন্দিরটির সম্মুখস্থ বারান্দা ছয়টি গোলায়িত স্তম্ভ দ্বারা দুটি সমান সারিতে বিভক্ত। প্রতিটি গোলায়িত স্তম্ভের চারদিক আবার কতগুলো নলাকৃতির তুসকান স্তম্ভ সংযুক্ত করে তদুপরি অর্ধ বৃত্তাকৃতির খিলান স্থাপিত হয়েছে।

এই ইমারতের পশ্চাতে আরো উত্তর দিকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত আর একটি আবাসিক ইমারত রয়েছে। পশ্চিমদিকের একটি সংকীর্ণ সংযোগপথ দিয়ে এই ইমারতে প্রবেশ করতে হয়। দীর্ঘাকৃতির এই ইমারতের পশ্চিম প্রান্তে এবং মূল ব্লকের পাশে একটি অভিক্ষিপ্ত ইমারত রয়েছে। ইমারতটি রানীমহল বা প্রাসাদের 'হেরেম' নামে পরিচিত।[১] দ্বিতল বিশিষ্ট রানীমহলের দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছে বিশাল ঝুল বারান্দা সহ অর্ধবৃত্তাকৃতির একটি অবকাঠামো। ঝুলন্ত বারান্দাটি কতগুলো অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলান সারির উপর স্থাপিত। প্রাসাদের এই জটিল অংশটির পশ্চিম দিক একটি অনুচ্চ সীমানা প্রাচীর এবং একটি ৬০-৮০ মিটার প্রশস্ত পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। এক সময়ে সমগ্র রাজবাড়ি উক্ত পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সুরক্ষিত ছিল। পরিখাটির দক্ষিণ-পশ্চিম পারে রয়েছে একটি ভগ্নদশাগ্রস্থ বাংলো। বলা হয় যে, একদা এই বাংলোটি কুখ্যাত পারিবারিক ডাক্তার আশুতোশ দাস গুপ্তের বাসগৃহ ছিল।[২] রানীমহলের ঠিক পশ্চাতে এবং আরো উত্তরে রয়েছে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা আরেকটি ইমারত যা বর্তমানে পুলিশ সুপারের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইমারতটি বর্তমানে দ্বিতল বিশিষ্ট হলেও মূলত এটি ছিল একতলা বিশিষ্ট। এর দ্বিতল অংশটি পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে।

রাজবাড়ির বাইরে দক্ষিণ দিকের মাঠের প্রান্তে দণ্ডায়মান রয়েছে জমিদারবাড়ির ম্যানেজারের অফিসভবন। ভবনটি 'দেওয়ান খানা' নামে পরিচিত। এই অফিসের সাথে রয়েছে দুটি আস্তাবল ব্লক। ১৯০৯ সালে এই আস্তাবল দুটিতে একটি রৌপ্য বাঁধানো গাড়ি এবং ২০টি হস্তিসহ ৪০টি ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ি ছিল। এই জমিদারবাড়িটিতে প্রায় ৩৬০টি কক্ষ বিদ্যমান।

---

১. এ.বি.এম হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৮৭।
২. ঐ।

অলংকরণ

ভাওয়াল রাজপ্রাসাদের অলঙ্করণে ইন্দো-ইউরোপীয় ও মোগল রীতির সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। এতে দেশজ স্থানীয় কিছু অলংকরণও লক্ষ করা যায়। অলঙ্করণের মাধ্যম হিসেবে মূলত ব্যবহৃত হয়েছে চুন-সুরকির পলেস্তরা আর মোটিফ হিসেবে ফুল-লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশা। তবে এ নকশা ইসলামী রীতির নয়, ইউরোপীয় ঘরানার। বারান্দার খিলানের স্তম্ভগুলো তুসকান ও করিন্থীয় আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। কার্নিসগুলোতে উৎকীর্ণ হয়েছে খাঁজকাটা নকশা। তবে ছাদশীর্ষেও 'কলস' নকশাশোভিত ছত্রীর ব্যবহার মুঘল রীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রাসাদের নাটমন্দিরের পশ্চাতে চৌচালা মন্দিরের ফ্যাসাদের কার্নিসে ফুল ও লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা দৃশ্যমান। তাছাড়াও আবাসিক কক্ষগুলোর বারান্দার প্রবেশ দরজাগুলোর উপরাংশে বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলান নকশা ও ফুল-লতাপাতার নকশা বিদ্যমান। প্রাসাদের ফাসাদের দ্বিতলের কার্ণিসে অসংখ্য ব্রাকেট সারিবদ্ধভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রাসাদের নাটমন্দিরের খিলানের স্প্যান্ড্রিল ও এর উপরাংশে ফুল-লতাপাতা, তারকা নকশা, জ্যামিতিক নকশা, রোজেট নকশা ইত্যাদি স্টাকোর (Stucco)সাহায্যে উৎকীর্ণ হয়েছে।

নির্মাণকাল

ভাওয়াল রাজপ্রাসাদের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্মাণকাল সম্পর্কে এর দেয়ালগাত্রে কোন নির্মাণ তারিখ উৎকীর্ণ করা নেই। প্রায় ১৫ একর সমতল ভূমির উপর উপর্যুক্ত প্রাসাদটি নির্মিত হয়েছে। বিশাল আকারের এই রাজপ্রাসাদটির নির্মাণ শুরু করেন রাজা লোক নারায়ণ রায় এবং রাজা কালি নারায়ণ রায় কর্তৃক এর নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়।[১] পরবর্তীতে ১৮৮৭ ও ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় তা সংস্কার করেন বলে জানা যায়। নির্মাণ উপাদান হিসেবে ইট, চুন, সুরকি, লোহা, কাঠ ব্যবহৃত হয়েছে।

১. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা কোষ*, ঢাকা,বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২ পৃঃ ৩১৭।

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র ৪: ভাওয়াল রাজবাড়ি সম্মুখদৃশ্য, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

আলোকচিত্র ৫: ভাওয়াল রাজবাড়ির পশ্চাৎভাগ, গাজীপুর।

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র ৬: ভাওয়াল রাজবাড়ির রানীমহলের একাংশ, গাজীপুর।

আলোকচিত্র: ৭.ভাওয়াল রাজবাড়ির খিলান বারান্দা, গাজীপুর ।

Dhaka University Institutional Repository

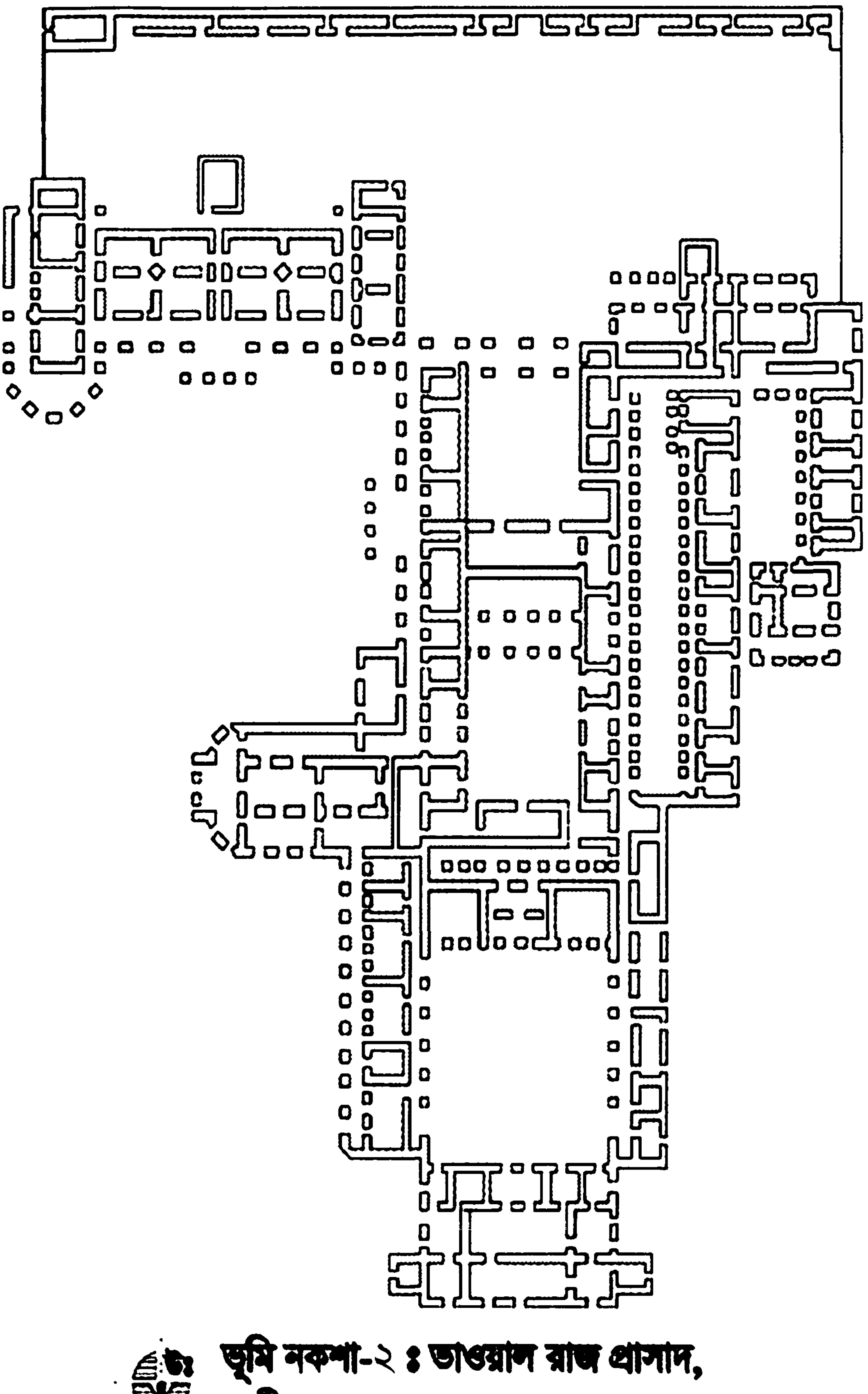

ভূমি নকশা-২ : ভাওয়াল রাজ প্রাসাদ, গাজীপুর।

Dhaka University Institutional Repository

মুড়াপাড়া জমিদার বাড়ি

আলোকচিত্র ঃ ৮,৯,১০,১১ ভূমি নকশা ঃ ৩

অবস্থান

মুড়াপাড়া জমিদারবাড়িটি ঢাকা থেকে ২৫ কি. মি. দক্ষিণপূর্বে নরসিংদী সড়কের ধারে মুড়াপাড়া গ্রামে অবস্থিত।[১] স্থানটি ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সাথে পশ্চিমে মাত্র ৫ কি. মি. দীর্ঘ ইট বিছানো একটি বন্ধুর পথ দ্বারা সংযোজিত। শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব তীর জুড়ে রয়েছে এই বর্ধিষ্ণু গ্রাম এবং নদীর অপর তীরে রয়েছে রূপগঞ্জ।

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে পুকুর, বাগান ও সবুজ লনের প্রায় মাঝখানে নির্মিত মুড়াপাড়া জমিদার বাড়িটি একটি কমপ্লেক্স আকারে নির্মিত। নদী থেকে পূর্ব দিকে প্রাসাদ সীমানার কাছাকাছি নির্মিত হয়েছে দুটি মন্দির। মন্দিরগুলির পূর্বদিকে রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি ঘাট সহ একটি শান বাঁধানো পুকুর। পুকুরের আরও পূর্বে নির্মিত হয়েছে মূল প্রাসাদ ভবন। পুকুর ও প্রাসাদ ভবনের মাঝখানে রয়েছে সবুজ ঘাসে ঘেরা লন। মূল প্রাসাদটি দুটি অঙ্গন সহযোগে নির্মিত। প্রাসাদের পিছনে একটি বাগান ও একটি পুকুর রয়েছে। উত্তর পশ্চিমের একটি রাস্তা দিয়ে প্রাসাদ কমপ্লেক্সে প্রবেশ করতে হয়। প্রাসাদ কমপ্লেক্সে প্রবেশের জন্য কোন রাজকীয় প্রবেশ দ্বারের নিদর্শন বর্তমানে পাওয়া যায় না। মূল প্রাসাদটি পশ্চিমমুখী। এটি উত্তর দক্ষিণে ৬০ মিটার বিস্তৃত ফ্যাসাদ সহযোগে গঠিত।ফ্যাসাদটি তিনটি অংশে বিভক্ত। মাঝের অংশকে গুরুত্ব দিয়ে ফ্যাসাদ নির্মাণে প্যালাডিও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। ফ্যাসাদের কেন্দ্রে একটি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ দিয়ে প্রাসাদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। প্রবেশ পথের দুই পাশে প্রাসাদের বাইরের দিকে ২.৪০ মিটার চওড়া একটি বারান্দা রয়েছে। বারান্দাটি প্রবেশ পথের উভয় দিকে ৮টি করে মোট ১৬টি খিলান সহযোগে গঠিত। বারান্দায় পিছন দিকে রয়েছে পাঁচটি বৃহৎকক্ষ। প্রবেশপথটি পূর্বদিকে প্রাসাদের ভেতরে একটি ৩০ মিটার বর্গাকার অঙ্গনে গিয়ে শেষ হয়েছে। অঙ্গনের পশ্চিমে যেখানে প্রবেশ পথটি রয়েছে, তার দুই পাশে ৫ টি করে মোট ১০টি খিলান সহযোগে নির্মিত হয়েছে একটি বারান্দা। অঙ্গনের উত্তর পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে একটি সমতল ছাদ বিশিষ্ট মন্দির যা 'ঠাকুর দালান' নামে পরিচিত। পূর্বমুখী এই আয়তাকার মন্দিরটি এর সম্মুখভাগে পাঁচ খিলান বিশিষ্ট একটি বারান্দা রয়েছে। মূল ইমারতটি অঙ্গনকেন্দ্রিক। বর্গাকৃতির এই অঙ্গনটির পরিমাপ ৩০ মিটার । অঙ্গনের পূর্ব ও দক্ষিণে প্রাসাদের অপরাপর কক্ষগুলো বিন্যস্ত।

---

১. Nazimuddin Ahmed, *Ibid*, P.77

Dhaka University Institutional Repository

প্রাসাদের দ্বিতীয় অঙ্গনটি প্রথম অঙ্গনের পূর্ব পার্শ্বের কক্ষগুলোর পিছনে অবস্থিত। এই এলাকাটি অন্দর মহল হিসাবে ব্যবহৃত হত বলে মনে হয়। দ্বিতীয় অঙ্গনের উত্তর ও পশ্চিমে বেশ কিছু কক্ষ রয়েছে। এই অঙ্গনের পূর্বে অবস্থিত কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় জলাশয়টি অন্দর মহলের মহিলাদের দৈনন্দিন কার্যে ব্যবহৃত হত বলে মনে হয়। ভগ্নপ্রায় দেওয়াল ঘেরা ঘাটটিতে প্রদীপ রাখার কুলুঙ্গী রয়েছে। অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলানের উপর নির্মিত ইমারতটির পূর্ব দিকের দ্বিতল অংশের নীচ তলায় ছয়টি কক্ষ এবং দ্বিতলে পাঁচটি হল ঘর রয়েছে। প্রাসাদের সর্বমোট কক্ষের সংখ্যা চল্লিশটি। বর্তমানে সুরক্ষিত এই প্রাসাদটি মুড়াপাড়া কলেজ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রাসাদের দ্বিতীয় তলার পরিকল্পনা প্রথমতলার অনুরূপ। সমগ্র ছাদের কর্নিশের উপর টানা প্যারাপেট পরিলক্ষিত হয় এবং এর প্রবেশ পথের দুই পাশে এবং প্রাসাদের চার কোণায় নির্মিত হয়েছে ক্ষুদ্রাকৃতির ছত্রী।

অলংকরণ

যে কোন শিল্পের প্রাণ হল এর অলংকরণ। স্থাপত্য শিল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। অলংকরণের মধ্য দিয়েই একটি স্থাপত্যের মাহাত্ম্য ফুটে উঠে। মুড়াপাড়া প্রাসাদটি অলংকৃত করতে বাইরের ফাসাদটিকে চারটি আয়তাকার স্তম্ভ দিয়ে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মাঝের অংশটি পার্শ্ববর্তী অংশ থেকে প্রশস্ত। এই অংশের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে মূল প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথটির দুইধারে রয়েছে দুটি করে গোলায়িত ডরিক স্তম্ভ ।[১] এর উভয় পাশে আরো দুটি জোড়া স্তম্ভ নির্মাণ করে প্রবেশ পথটিকে সুশোভিত করা হয়েছে। স্তম্ভগুলো চারকোণা ভিত্তিভূমির উপর গোলায়িত আকারে নির্মিত। প্রাসাদের খিলান নির্মাণে অর্ধগোলাকৃতি খিলানের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। প্রবেশ পথের স্তম্ভ দুটির ঠিক উপরে দ্বিতীয় তলায় রয়েছে স্টাকো নির্মিত দুইটি সিংহের প্রতিকৃতি। প্রাসাদের স্তম্ভের শীর্ষে রয়েছে দুটি ক্ষুদ্রাকৃতির মিনার। মিনারের শীর্ষদণ্ডে কলস ও অমলক মোতিফ। মিনারের চারিদিকের শীর্ষ বক্রাকারে নির্মিত হয়েছে ফুলের নকশা। দুটি মিনারের মাঝে দ্বিতীয় তলায় নির্মিত হয়েছে একটি পেডিমেন্ট।[২] প্রাসাদের সমগ্র ফাসাদটি প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় তলায় ১৮ টি করে মোট ৩৬ টি খিলান সহযোগে গঠিত। খিলানের উভয় পার্শ্ব সরু গোলায়িত স্তম্ভদ্বারা শোভিত। খিলান পটসমূহ সবুজ, লাল, নীল, কাচের সার্শি দ্বারা অলংকৃত। খিলানের মাঝখানে কি-স্টোনটি(Key-stone) বৃহদাকারে নির্মিত হয়েছে। কিছু কিছু খিলানের উপরে চক্রাকার জানালা বা ঘুলঘুলি লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় তলার খিলান পথগুলোর নিম্নাংশ রেলিং আকারে অলংকৃত গ্রীল কাষ্ট আয়রন(Cast-iron) দ্বারা সুশোভিত করা। গোলায়িত খিলান স্তম্ভের শীর্ষদেশ করন্থীয় পাতার অলংকৃত নকশা।

১. পাশ্চাত্য ধ্রুপদী স্থাপত্যের প্রথম শৈলীর স্তম্ভ ।

২. প্রাসাদের সম্মুখভাগের উপরিদেশে অলংকৃত ত্রিকোণ অংশ বিশেষ।

Dhaka University Institutional Repository

এর উপরে প্রাসাদের সম্মুখভাগের ফ্রিজে (frieze)এক সারি ফুলেল লতাপাতা নকশা রয়েছে। লতানো নকশার চারিধারে মুক্ত দানার মত নকশা লক্ষ করা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় তলার কর্নিশে অলংকৃত ঠেকনার(bracket) ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কার্নিশের নিচে নির্ধারিত দূরত্বে প্রাসাদ ফ্যাসাদে চক্র নকশা লক্ষণীয়। প্রাসাদের ফ্যাসাদ ছাড়া এর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অভ্যন্তর মন্দিরটিতে অলংকরণের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরের বারান্দায় স্তম্ভগুলো গোলায়িত ও গুচ্ছ আকারে নির্মিত। খিলানের উপরিভাগে স্টাকো নির্মিত দৃষ্টিদনন্দন আঙ্গুর পাতার অলংকরণ লক্ষ করা যায়। মন্দিরের ফ্যাসাদে পাঁচটি খিলান শ্রেণির প্রান্তীয় দুটি ইংলিশ গথিক[১] খিলান আকারে নির্মিত এবং মাঝের তিনটি খাঁজকাটা গোলায়িত। মন্দির ফ্যাসাদের ফ্রিজে উড়ন্ত ফিতা বা ফেস্টুন নকশা দেখা যায়। এর কর্ণিশের ঠিক মাঝখানে মুকুট সদৃশ এক ধরণের স্টাকো নকশা মন্দিরের সৌন্দর্য্য বর্ধনে নির্মিত হয়েছিল যা সামান্যই বর্তমানে টিকে আছে। মুকুট সদৃশ স্টাকো নির্মিত এ ধরণের অলংকরণ উপনিবেশিক স্থাপত্যে বহুলভাবে চর্চিত হয়েছে। অলংকরনের ক্ষেত্রে দরজা ও জানালাগুলোতে ভেনিসীয় খড়খড়ির[২] ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। হলঘর সমূহের মেঝে কৃষ্ণ ও শ্বেত মার্বেল প্রস্তরে আচ্ছাদিত এবং অর্ধবৃত্তাকৃতি খিলানপটহ জ্যামিতিক পদ্ধতিতে নির্মিত যা লাল, নীল ,সবুজ ও বিভিন্ন রং এ রঞ্জিত উক্ত খিলান পটহ কাচের সার্শি দ্বারা অলংকৃত ।

নির্মাণকাল

ইমারতটিতে কোন শিলালিপি নেই। স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ইমারতটি উনিশ শতকে নির্মিত বলে অনুমিত। মুড়াপাড়া রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রামরতন ব্যানার্জি। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে নাটোর জমিদারির একজন কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। চাকুরীকালে তিনি স্বীয় সততা ও ঐকান্তিকতাবলে উচ্চ পদ লাভের সাথে সাথে বহু ভূসম্পত্তি অর্জন করেছিলেন। তার পুত্র ঈশান চন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র কর্তৃক এই জমিদারি আরো বিস্তৃত হয়। পরবর্তীকালে এই জমিদারি রাম রতনের জৈষ্ঠ্য পুত্রের উত্তরাধিকারি দীনেশচন্দ্র, তারকচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকারী বিজয়চন্দ্রের পুত্র জগদীশচন্দ্র ও আশুতোষ চন্দ্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। এরও পরে এই জমিদারি ভূসম্পত্তি রামরতনের ভ্রাতুস্পুত্র যথা-বীরেন্দ্রচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, নৃপেন্দ্রচন্দ্র, রাজেন্দ্র চন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জির মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হয়ে খন্ড দ্বিখন্ডিত হয়ে পড়ে। ১৯০৯ সালে জগদীশচন্দ্র সমস্ত জমিদারির দায়দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৪৭ সালে ব্যানার্জি পরিবারের সকলেই ভারতে চলে যান।[৩] বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলাটি উনিশ-বিশ শতকে ঢাকার একটি মহকুমা ছিল।

---

১. ইউরোপে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে চার্চ নির্মাণে উলম্ব সূঁচালো গথিক খিলান ব্যবহৃত হত কিন্তু ইংরেজরা তাদের প্রাসাদ নির্মাণে এই গথিক খিলানের সূঁচালো অংশকে অর্ধগোলাকৃতির আকারে ব্যবহার করায় এটাকে ইংলিশ গথিক খিলান বলা হয়।

২. ইটালীয় স্থাপত্যে ব্যবহৃত কাঠের খড়খড়ি দরজা বা জানালা যা দিয়ে প্রসাদে আলো এবং বায়ু সঞ্চালন ব্যবস্থা থাকে।

৩. *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ১৫ মার্চ ২০০৬, শামছুল হুদা কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা: ইডেন কমপ্লেক্স, মতিঝিল।

আলোকচিত্র ৮ঃ মুড়াপাড়া জমিদারবাড়ি, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ।

আলোকচিত্র ৯ঃ মুড়াপাড়া জমিদারবাড়ি অভ্যন্তরীন মন্দির, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

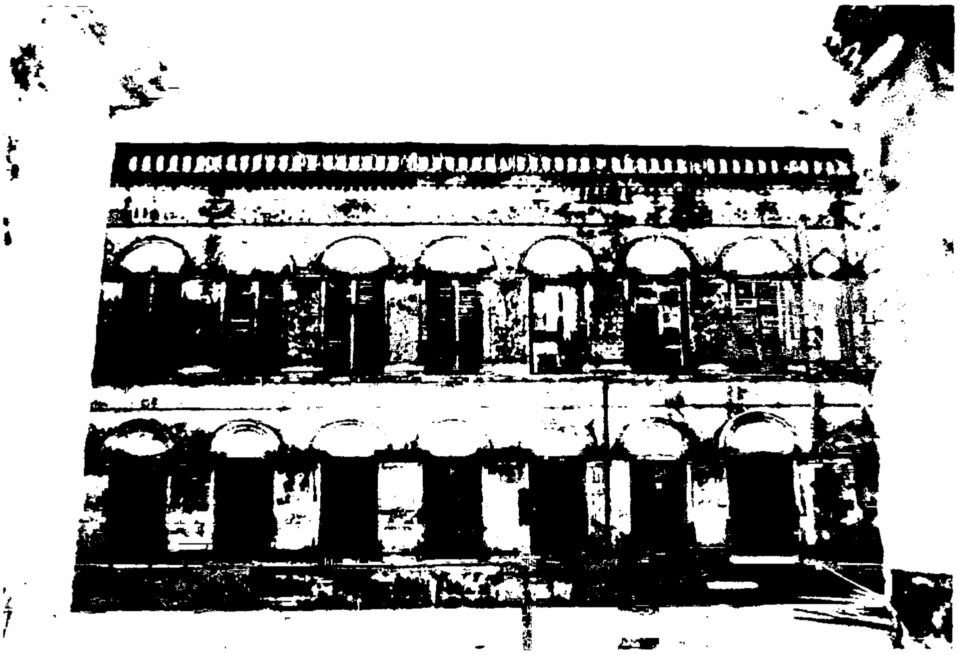

আলোকচিত্র ১০: মুড়াপাড়া জমিদারবাড়ি অন্দর মহল, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

আলোকচিত্র ১১: সিংহ দুয়ার, মুড়াপাড়া জমিদারবাড়ি, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

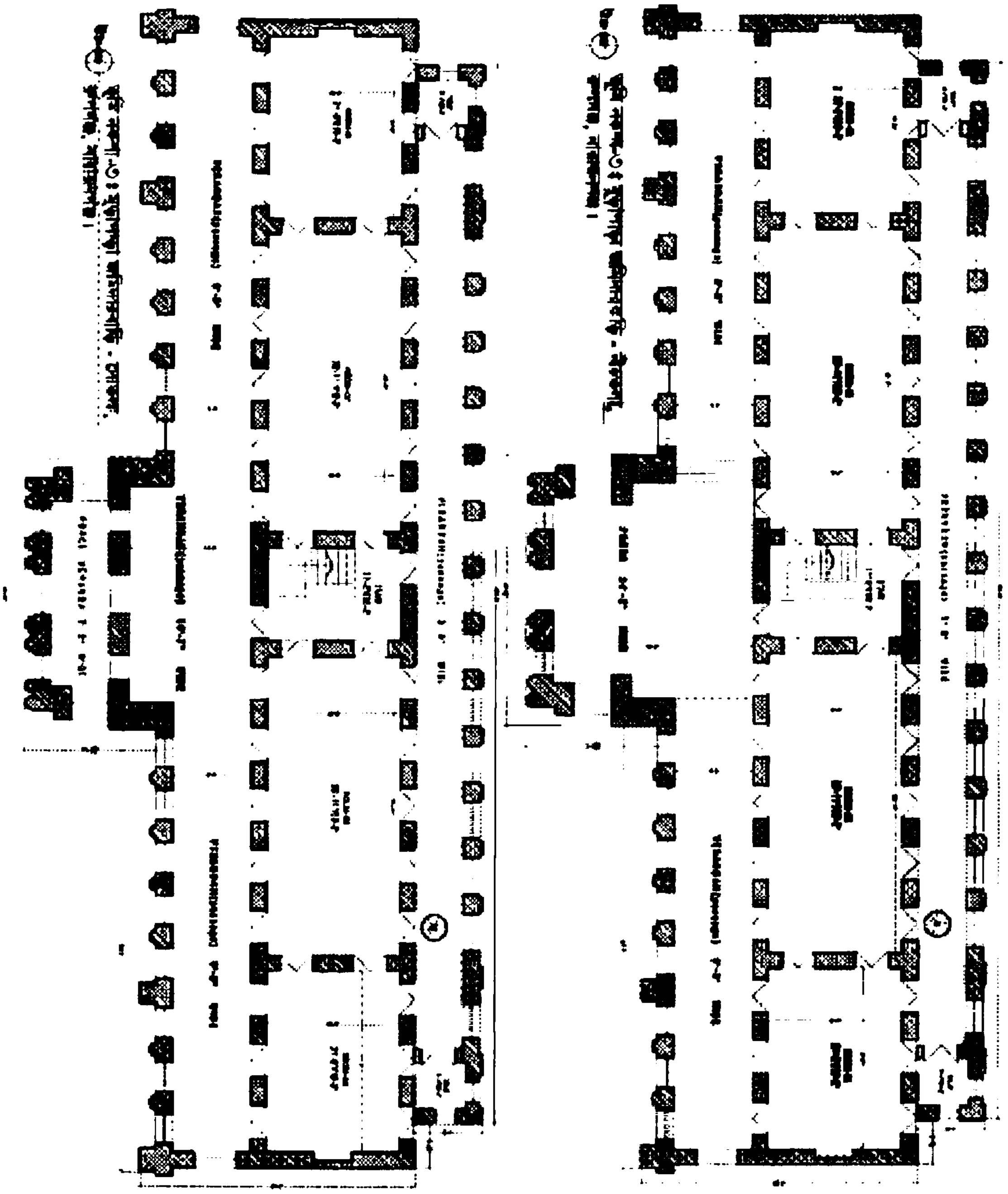

তেঁওতা প্রাসাদ

আলোকচিত্র ঃ ১২,১৩,১৪ ভূমি নকশা ঃ ৪

অবস্থান

আলোচিত ঢাকা জেলার যমুনা নদীর বাম তীর ঘেসে আরিচা ফেরীঘাট হতে ২.৫০ কি.মি. উত্তরে তেঁওতা গ্রামে তেঁওতা প্রাসাদটি অবস্থিত। এখানে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত দুটি জলাশয়ের মাঝে নির্মিত হয়েছে দুটি প্রাসাদ, একটি দ্বিতল বিশিষ্ট কাছারি বাড়ি ও অন্যটি নবরত্ন দোলমঞ্চ, একটি বাংলো (টিনের)।

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

কাছারি বাড়ি

পূর্ব পশ্চিম মুখী প্রায় ৭০ ফুট × ৫০ ফুট আয়তন বিশিষ্ট কাছারি বাড়িটি পুরাতন প্রাসাদের দক্ষিণ প্রান্তের ডান কোণায় অবস্থিত। ইমারতটি দ্বিতল। এর উভয় তলার ছাদ চারদিকে ঢালু ও লাল টালী দ্বারা আচ্ছাদিত। ইমারতের পশ্চিমে পুকুরের দক্ষিণ পূর্ব তীরে বারান্দা বিশিষ্ট একটি বর্গাকার ছত্রী রয়েছে। ছত্রীর ছাদও টালী দ্বারা আচ্ছাদিত। ইমারতটি জয়সাগর স্টেটের অন্তর্ভূক্ত ।[১]

প্রাসাদ

জলাশয়ের পূর্ব পাড়ে প্রায় ৩০ মি. ব্যবধানে নির্মিত হয়েছে তেঁওতার সবচেয়ে পুরাতন প্রাসাদ।[২] পশ্চিমমুখী এই প্রাসাদটি উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৬০ মি. ও পূর্ব পশ্চিমে ৩০ মি. বিস্তৃত। প্রাসাদটির একদিকে কাছারি ভবন ও অন্যদিকে দোলমঞ্চ ছাড়াও প্রাসাদের পশ্চাতে দুই দিকে দ্বিতল বিশিষ্ট দুটি ইমারত সংযোজিত হয়েছে। দ্বিতল বিশিষ্ট ও আয়তাকার ভূমি নকশায় নির্মিত এই প্রাসাদের উত্তরে রয়েছে ১৫৯ মি. আয়তন বিশিষ্ট একটি অঙ্গণ। অঙ্গনটি মূলত ঢেউ টিনের ঢালু ছাদে আচ্ছাদিত। ইমারতটির সম্মুখের কেন্দ্রস্থলে অভিক্ষিপ্তকারে নির্মিত অর্ধবৃত্তাকৃতির একটি গাড়ী বারান্দা (বর্তমানে ধবংসপ্রাপ্ত) আছে। বারান্দাটির ছাদ এক সময় বারটি যুগল গোলায়িত স্তম্ভের উপর স্থাপিত ছিল। বারান্দার সরু পথ দিয়ে ইমারতের ভিতর অঙ্গনে প্রবেশ করা যায়। ইমারতের সম্মুখে গোলায়িত স্তম্ভের সারি সহ ২.৭০ মি. প্রশস্ত বারান্দাটিও গাড়ি বারান্দার ন্যায় প্রায় ধবংসপ্রাপ্ত। গাড়ি বারান্দার দুই দিকে ও সম্মুখ বারান্দার পশ্চাতে নির্মিত কক্ষগুলোর সম্মুখে রয়েছে এক সারি অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলান পথ। খিলান পথের প্রতিটি খিলান নলাকৃতির করম্বীয় পোস্তার উপর স্থাপিত।

১. Nazimuddin Ahmed, *Building of the British Raj in Bangladesh*, Dhaka, TheUniversity Press Ltd, 1986, P-84

২. এ.বি.এম হোসেন (সম্পা), 'স্থাপত্য' *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-২*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ- ৩৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাসাদের ভিতরে অঙ্গনের তিন দিকে রয়েছে দ্বিতল বিশিষ্ট তিনটি ব্লক এবং প্রতি ব্লকে রয়েছে বিভিন্ন পরিমাপের দশটি করে কক্ষ। অঙ্গনের চতুর্থ দিক অর্থাৎ উত্তর দিকে রয়েছে একতলা বিশিষ্ট একটি পারিবারিক মন্দির। সমগ্র ব্লকটির চতুর্দিকে অর্থাৎ অঙ্গনের চারিদিকে কক্ষ সমুহের সামনে দিয়ে রয়েছে ২.৭০ মি. প্রশস্ত ও আইওনীয় স্তম্ভের সারি সংবলিত একটি টানা বারান্দা। অঙ্গনের উত্তরে অবস্থিত মন্দিরটি দেবী দূর্গার নামে উৎসর্গকৃত বলে জানা যায়। মন্দিরটির সম্মুখে রয়েছে ৩ মি. চওড়া ও চারটি যুগল আইওনীয় স্তম্ভ সহ একটি বারান্দা। এই বারান্দা দিয়ে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করা হয়। বারান্দার উপরের টানা পাড় নকশাটি স্টাকো পলেস্তারায় খচিত পেঁচানো লতাপাতার মাঝে উৎকীর্ণ নারী মস্তকসহ অপূর্ব অলংকরণে সজ্জিত। মন্দিরের উপরের ছাদ পাঁচিল ক্ষুদ্র খিলান পথ বিশিষ্ট। মন্দিরটিতে ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট একটি গর্ভগৃহ আছে। বারান্দা ও গর্ভগৃহের মাঝে স্থাপিত রয়েছে তিনটি অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলানপথ। প্রবেশ পথের খিলান সমুহ ইটের নির্মিত তিনটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। স্তম্ভ সমুহের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য প্রতিটি স্তম্ভের সাথে সংযুক্ত রয়েছে পাঁচটি করে নলাকৃতির তুসকান স্তম্ভ। প্রাসাদের ভিতর ব্লকের উত্তর পূর্ব কোণায় গলিপথ দিয়ে পিছনের দুই দিকে অবস্থিত দ্বিতল বিশিষ্ট দুটি ইমারতে যাওয়া যায়। উক্ত দ্বিতল বিশিষ্ট ইমারত দুটির পরে আরো পূর্ব দিকে রয়েছে একটি জলাশয়। সমগ্র প্রাসাদটি একটি প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত সীমানা প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

উত্তর দিকে দোল মঞ্চের পিছনে ৩০ মি. দীর্ঘ পশ্চিমমুখী আরেকটি প্রাসাদ ভবন রয়েছে। ভবনটির মধ্যস্থলে রয়েছে একটি গাড়ি বারান্দা। গাড়ি বারান্দার সম্মুখে রয়েছে তিনটি কৌনিক খিলানপথ। খিলান পথ সমূহ সিমেন্ট বালির আস্তরনে আচ্ছাদিত। এই প্রাসাদেরও অভ্যন্তর ভাগে রয়েছে একটি আয়তাকৃতির কেন্দ্রিয় অঙ্গণ। অঙ্গণকে ঘিরে নির্মিত কেবল দক্ষিণ দিকের দ্বিতল বিশিষ্ট ব্লকটি ব্যতীত অপর তিন দিকের ইমারত সমূহ একতলা বিশিষ্ট। অঙ্গনের চারিদিকে নির্মিত ইমারত সমূহের প্রায় পনেরটি কক্ষের সম্মুখ দিয়ে রয়েছে ২.৭০ মি. প্রশস্ত একটি টানা বারান্দা। নিচতলার বারান্দার সম্মুখভাগ ইটের নির্মিত সাধারণ স্তম্ভ সংবলিত হলেও দ্বিতলের ঝুল বারান্দার সম্মুখ ভাগের স্তম্ভসমূহ অষ্টভূজাকৃতির স্তম্ভদণ্ড বিশিষ্ট এবং স্তম্ভ শীর্ষ করন্থীয় নকশায় নির্মিত। ইমারতটির বিভিন্ন অংশের ক্ষুদ্র গলিপথ সমূহকে আবৃত করার জন্য অর্ধবৃত্তাকৃতি ও দ্বিকেন্দ্রিয় উভয় ধরণের খিলানের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

প্রাসাদটির উত্তর দিকে রয়েছে আরেকটি ক্ষুদ্রাকৃতির পারিবারিক মন্দির। এই মন্দিরের সম্মুখে রয়েছে ৩ মি. প্রশস্ত একটি বারান্দা। বারান্দার সম্মুখভাগে রয়েছে ছয়টি লোহার নির্মিত নলাকৃতির করন্থীয় স্তম্ভের উপর

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপিত পাঁচটি খিলানপথ। তাছাড়া গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য গর্ভগৃহ ও বারান্দার মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে পাঁচটি অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলানপথ।

অলংকরণ

তেঁওতা জমিদার বাড়িটি বর্তমানে অত্যন্ত ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় দাড়িয়ে আছে। প্রাসাদের অনেক অংশ ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও এখনো যা অবশিষ্ট আছে তা থেকে বুঝা যায় যে, এক সময় প্রাসাদটি অত্যন্ত জাকালোভাবে অলংকৃত ছিল। প্রাসাদ সমূহের সামনে সারিবদ্ধ খিলান শ্রেণি রয়েছে। তবে প্রতিটি খিলানেরই খিলান পট গুলো বদ্ধ করে নির্মিত এবং সেখানে স্টাকো নির্মিত পাখা নকশা দেখা যায়। প্রথম তলার খিলানের স্তম্ভগুলো গুচ্ছকারে নির্মিত। তবে দ্বিতীয় তলায় সরু জোড়া স্তম্ভ রয়েছে। খিলান গুলোতে স্টাকো নির্মিত ভেনিসীয় খড়খড়ির নকশা রয়েছে। প্রাসাদ ভবনের কক্ষগুলোর ভিতরে ছাদের চারদিকে দেয়ালে লতাপাতার নকশা রয়েছে। প্রাসাদের অঙ্গনের চারদিকে রয়েছে টানা বারান্দা। বারান্দার চতুর্দিকে নির্দিষ্ট দুরত্বে নির্মিত হয়েছে ছাদ পর্যন্ত প্রলম্বিত স্তম্ভ সারি। স্তম্ভ গুলোর শীর্ষে প্যাঁচানো আইওনীক নকশায় সজ্জিত। স্তম্ভের উপরে সমগ্র ফ্রিজ জুড়ে মোল্ডিং করা একসারির ফিতা নকশা লক্ষ করা যায়। প্রাসাদ দুটি অভ্যন্তরে রয়েছে ঠাকুর দালান বা নাট মন্দির। মন্দিরের বারান্দা চার জোড়া স্তম্ভ সহযোগে নির্মিত। স্তম্ভের উপরে ফ্রিজে রয়েছে ফুলের অপূর্ব নকশা এবং স্তম্ভ গুলোর ঠিক উপরে নির্মিত হয়েছে মানুষের মুখাকৃতির প্রতিচ্ছবি। এই সম্পূর্ণ নকশাটি স্টাকো দ্বারা নির্মিত। কর্নিশের উপরে নির্মিত হয়েছে একটি প্যারাপেট। প্যারাপেটটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। এর কোণায় দুটিতে একটি উন্মুক্ত খিলান এবং বাকী তিনটি অংশে তিনটি করে ক্ষুদ্র খিলান রয়েছে। বারান্দার জোড়া স্তম্ভ বরাবর প্রতিটি স্তম্ভের উপরে প্যারাপেটের শেষ প্রান্তে নির্মিত হয়েছে ক্ষুদ্রাকৃতির চৌচালা এবং প্রতি দুটি চৌচালার মাঝখানে তিনটি করে গোলাকৃতির ফোকর নকশা। মন্দিরের ভিতরে প্রবেশের জন্য রয়েছে তিনটি প্রবেশ পথ। এ গুলো তিন স্তরে খিলান সহযোগে নির্মিত। প্রতিটি খিলানের উপর স্টাকো নকশা রয়েছে। খিলান পটে লতানো ও পাখা ধরণের নকশা লক্ষ করা যায়। কক্ষের দেয়ালের উপরের অংশে ফুলের মালার একসারি নকশা রয়েছে এবং মালার নিচে স্টাকো দ্বারা নির্মিত দুটি করে ময়ুর যা প্রাসাদের সৌন্দর্য বর্ধন করেছে।

নির্মাণ কাল

তেওতা জমিদারবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পঞ্চানন চৌধুরী (জন্ম ১৭৪০), যিনি মানিকগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। পঞ্চানন দিনাজপুরের একজন তামাক ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর জীবন শুরু করেন। ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি সাধন

Dhaka University Institutional Repository

করেন এবং পরবর্তীকালে জমিদারি ক্রয় করে জমিদার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তেওতা জমিদারি মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ি, ফরিদপুর, ঢাকা, সাভার, নবাবগঞ্জ, পাবনা, মুন্সিগঞ্জ, ঠাকুরগাও ও দিনাজপুরের কিয়দংশে বিস্তৃত ছিল। পঞ্চাননের বংশধর জয়সংকর শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর সময়ে তেওতার স্থাপনাগুলো নির্মিত হয় বলে জানা যায়। তেওতার কাছারিবাড়িতে উৎকীর্ণ একটি লিপি থেকে ইমারতটির নির্মাণকাল ১৯১৪ সাল বলে জানা যায়। এছাড়া তেওতা দোলমঞ্চ হতে প্রাপ্ত সাল অনুযায়ী এটি ১৮৫৮ সালের নির্মিত । শিলালিপির সাক্ষ্যে এটি প্রতিয়মান হয় যে, তেওতা জমিদারবাড়ির বিভিন্ন স্থাপনাগুলো উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের প্রথম পর্যায়ের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল।

আলোকচিত্র :১২ তেওতা প্রাসাদ, শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

আলোকচিত্র : ১৩ তেওতাঁ প্রাসাদ, শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

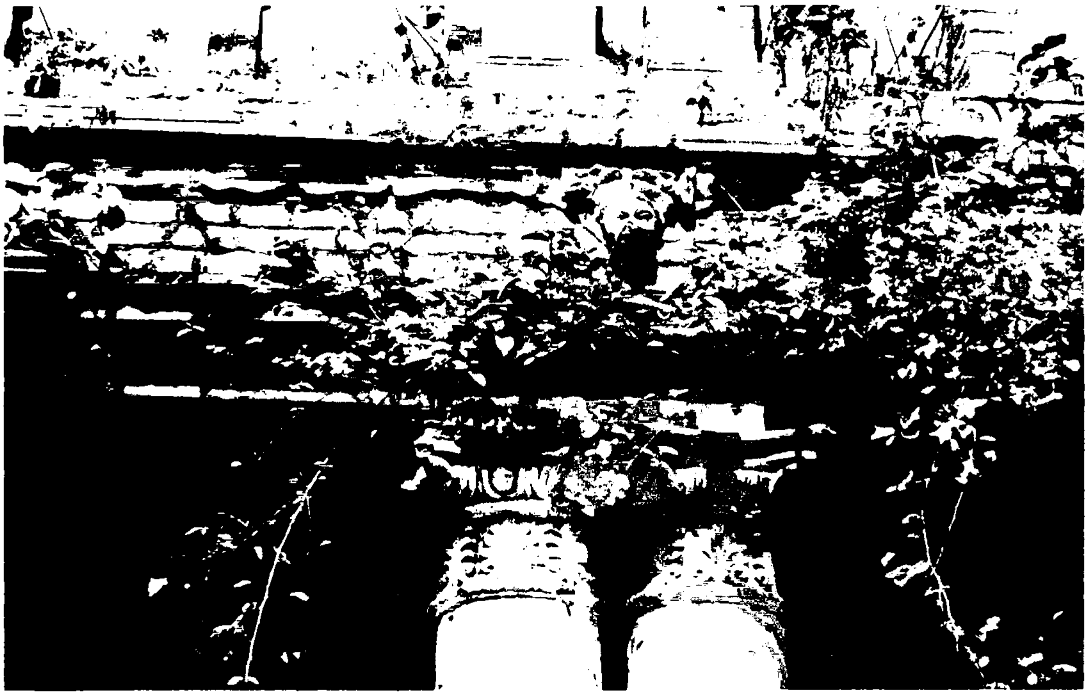

আলোকচিত্র : ১৪ ধ্বংস প্রায় অভ্যন্তরীণ মন্দির, তেওতাঁ প্রাসাদ, শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

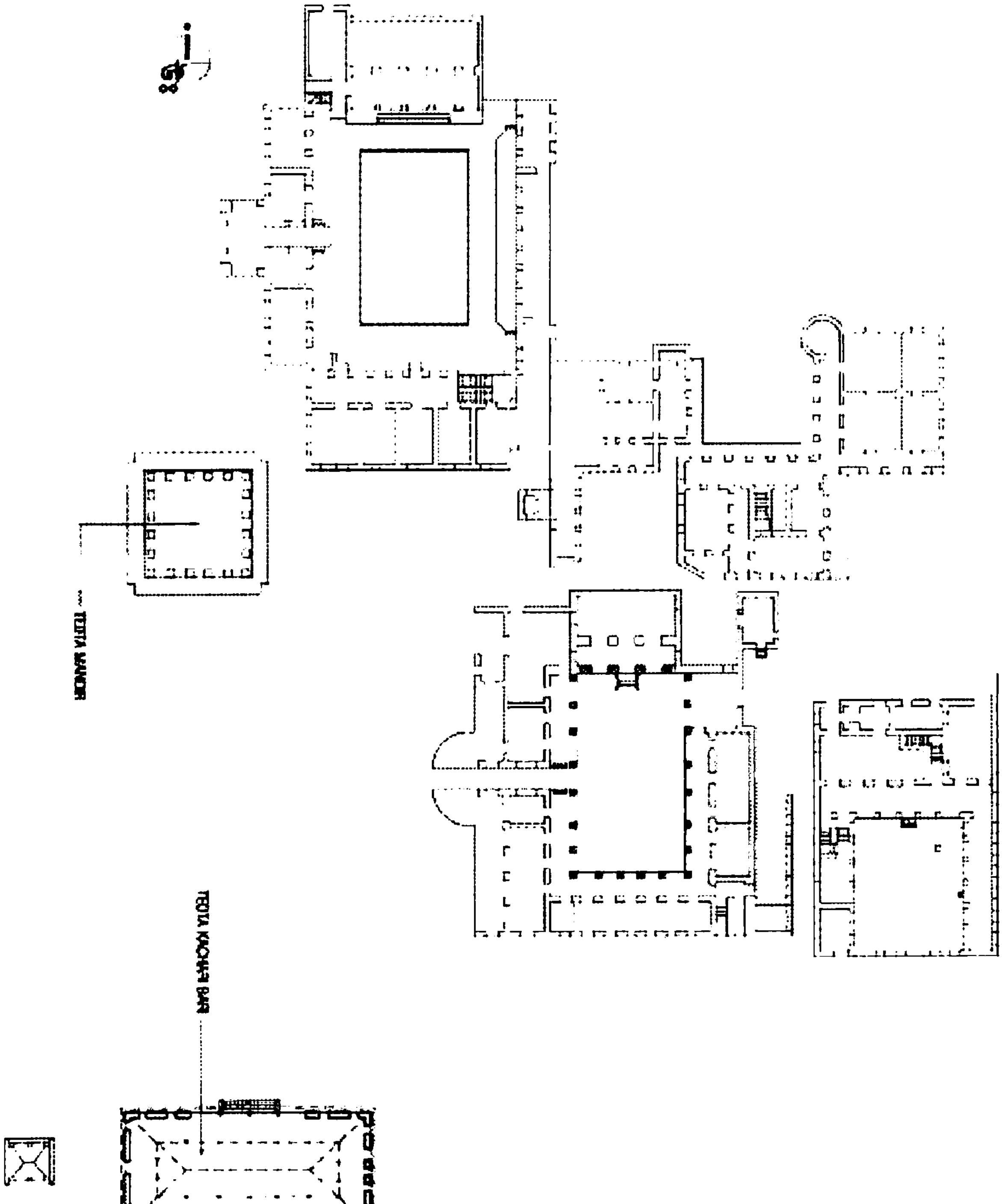

ভূমি নকশা-৪ ঃ তেওতা প্রাসাদ,
তেওতা, মানিকগঞ্জ।

কাশিনাথ ভবন, পানাম

আলোকচিত্র ঃ ১৫,১৬ ভূমি নকশা ঃ ৫

পানাম সোনারগাঁও লোক শিল্প যাদুঘর হতে প্রায় ৫৫০মি. দুরে অবস্থিত। পানাম নগর একটি অন্যান্য ধরনের শহর এলাকা। সোনারগাঁও থেকে গড়ে ৫ মি. প্রশস্ত ও ৬০০ মি. দীর্ঘ একটি রাস্তা দিয়ে এখানে যাওয়া যায়। পঙ্খীরাজ নদী ও পঙ্খীরাজ খাল দ্বারা দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিদ্যমান। এক জরীপে এখানে বায়ান্নটি গৃহ ভগ্নদশা ও অব্যবহৃত অবস্থায় চিহ্নিত হয়েছে। বর্তমানে রাস্তার উত্তর পার্শ্বে ৩১টি এবং দক্ষিণ পার্শ্বে ২১টি গৃহ টিকে রয়েছে। লিখিত তথ্যে পানাম নগরের ইতিহাস সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানা যায় না। জেমস্ টেইলর (১৮৪০) তাঁর স্কেচ অব টি টপোগ্রাফী এন্ড স্ট্যাটিস্টিকস অব ঢাকাতে পানামকে সোনারগাঁও এর একটি প্রাচীন নগরী হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[১] তাঁর মতে ছোট ছোট নৌকা, হাতি কিংবা অশ্বারোহন ব্যাতিরেকে এই এলাকায় প্রবেশ করা ছিল অসম্ভব। সংকীর্ন এই রাস্তাটির উভয় পার্শ্বে ছিল পর্নকুটির এবং ইটের নির্মিত দ্বিতল ও ত্রিতল বিশিষ্ট সুন্দর গৃহাদি। এর চতুর্দিক একটি পঙ্কিল (কর্দমাক্ত) স্রোতহীন গভীর খাল দ্বারা বেষ্টিত ছিল যা মূলত নগরটির প্রতিরক্ষার জন্য পরিখা হিসেবে খনন করা হয়েছিল। নোটস অন সোনারগাঁও, ইস্টার্ণ বেঙ্গল এর লেখক ড. জে. ওয়াইজ (জানুয়ারী ১৮৭২) এর বর্ণনা অনুযায়ী পানামের বাসিন্দাদের অধিকাংশই সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী যারা কলকাতা ও ঢাকা থেকে প্রচুর মালামাল ক্রয় করে সেগুলো এই অঞ্চলের চারিদিকের গ্রাম সমূহে বিক্রয় করতো।[২] এই অঞ্চলের অধিবাসিদের সম্পর্কে বলা হয় যে, এখানে একজনও মুসলিম (মুহাম্মাডান) নেই।[৩] গৃহ স্বামীরা প্রধানত তালুকদার যারা সরাসরি ঢাকার রাজাকোষে সরকারি খাজনা পরিশোধ করে। তাদের মধ্যে নব্বই জন এই গ্রামে আছে। ৩২ বছরের ব্যবধানে প্রদত্ত টেইলর এবং জে.ওয়াইজের কিবরণ তুলনা করলে এটি সুস্পষ্ট যে, ১৯৪০ সালের পরের বছরগুলো পানামের জন্য ছিল অবসাত্তিকাল এর ১৯৭২ সাল থেকে শুরু হয় পানামের পুনর্জীবন লাভের অধ্যায়। পানামের বিদ্যমান ইমারত সমূহের নির্মাণকাল উনিশ শতকের শেষের দিক হতে বিশ শতকের প্রারম্ভকালের মধ্যে। পানামের নির্মাণকাল সম্পর্কীত লিপি-ফলক সম্বলিত তিনটি ইমারতের মধ্যে কাশিনাথ হাউজ একটি।

---

১. জেমস টেলর, *কোম্পানী আমলে ঢাকা* , মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (অনু), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮,পৃ.৬৭-৬৯

২. *ঐ*

৩. *ঐ*

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান

নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ লোকশিল্প যাদুঘর হতে প্রায় দুই কি.মি. পূর্বে পানাম শহরের মধ্য দিয়ে যে রাস্তাটি চলে গেছে তার মাঝামাঝিতে কাশিনাথ ভবনটি অবস্থিত। এ বি এম হোসেন এই ইমারতটি ৩৬নং বাড়ি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১] কিন্তু বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত তালিকায় এই ইমারতটির নম্বর ৩৩।[২]

স্থাপত্যিক আলোচনা

সম্পূর্ণ ইমারতটি উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত লম্বাটে ধরণের ভবন। এর প্রবেশ পথটির দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ভবনের সামনের দিকে cast-iron এর গ্রীল দ্বারা বেস্টিত একটি ক্ষুদ্র বাগান রয়েছে। বাগান থেকে দুই ধাপ বিশিষ্ট একটি সিঁড়ি দিয়ে ভিত্তির উপর উঠতে হয়। প্রবেশ পথের সম্মুখে রয়েছে পাঁচ খিলান বিশিষ্ট একটি বারান্দা। খিলান নির্মাণে চতুষ্কোনাকার স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছে। খিলান গুলি অর্ধ গোলাকৃতির। মাঝের খিলানের উপরে ভবনটির নাম লেখা রয়েছে 'কাশিনাথ ভবন' এবং বঙ্গাব্দ ১৩০৫ (১৮৯৮ সাল)। বারান্দার পিছনে ভবনের ভিতরে প্রবেশের জন্য রয়েছে তিনটি দরজা। মাঝের দরজাটি একটি হল ঘরের দিকে উন্মুক্ত। সম্ভবত হল ঘরটি নাচঘর হিসেবে ব্যবহৃত হত। হলঘরের পশ্চিমে রয়েছে আর একটি ক্ষুদ্র কক্ষ। হলঘরের উত্তরের একটি দরজা দিয়ে বাড়ির অঙ্গনে পৌছানো যায়। অঙ্গনের উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে রয়েছে টানা বারান্দা। বারান্দার পশ্চিম দক্ষিণ ও উত্তর পূর্ব কোণে রয়েছে দোতলায় ওঠার জন্য দুটি সিঁড়ি। বারান্দা থেকে পূর্ব দিকে আরো একটি কক্ষ রয়েছে। বারান্দার উত্তরে আরো একটি টানা করিডোরের দুপাশে ভবনের বাকী ছয়টি কক্ষ বিন্যস্ত। ভবনটি দ্বিতল। উপরের তলার পরিকল্পনা প্রথম তলার অনুরূপ।

অলংকরণ

পানামের ভবনগুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে অলংকৃত হচ্ছে এই ইমারত । এখানে স্টাকো, cast-iron ও চিনি টিকরী (glazed tile) অলংকরণ রয়েছে। স্টাকো অলংকরণ গুলো কর্নিশের নিচে ও ফ্রিজে স্তম্ভ শীর্ষের খিলান স্প্যানড্রিলে এবং স্তম্ভ ভিত্তিতে লক্ষ্য করা যায়। অলংকরণের মোতিফ হিসেবে করিন্থিয় পাতা ও ফুলের নকশা, মুকুট নকশা, দানা নকশা ইত্যাদি সহ কিছু মনুষ্য প্রতিকৃতির নকশাও রয়েছে।[৩]

---

১. A.B.M. Hussin (ed.), *Sonargaon-Panam*, Dhaka Aziafic Society of Bangladesh, 1997, P-114-115 & 126.

২. বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে সংরক্ষিত মানচিত্রে নির্দেশিত।

৩. Abdul Momin Chowdhury & Abu H. Imamuddin," *Panam: An Adjunct of Sonargoan* "in Journal of Bengal Art, vol-3, ed., Enamul Haque, Dhaka, The International Centre for Study of Bengal Art, p. 166

Dhaka University Institutional Repository

চিনি টিকরীর নকশা মূলত স্তম্ভ গাত্র এবং সোপান শ্রেণিতে লক্ষ্যনীয়। Cast iron খিলানপট ও রেলিং এ লক্ষ্য করা যায়। মূলত Cast iron এর নির্মিত লতা পাতার নকশা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

নির্মাণকাল

ভবনের কেন্দ্রিয় প্রবেশ পথের উপরে রেকর্ড অনুযায়ী ভবনটি ১৩০৫ সনে নির্মিত। সেই অনুযায়ী এই ভবনটি ১৮৯৮ সালে নির্মিত হয়েছিল।

আলোকচিত্র: ১৫ কাশীনাথ ভবন (৩৩নং বাড়ি), সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

আলোকচিত্র :১৬ কাশীনাথ ভবন (৩৩নং বাড়ি), সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

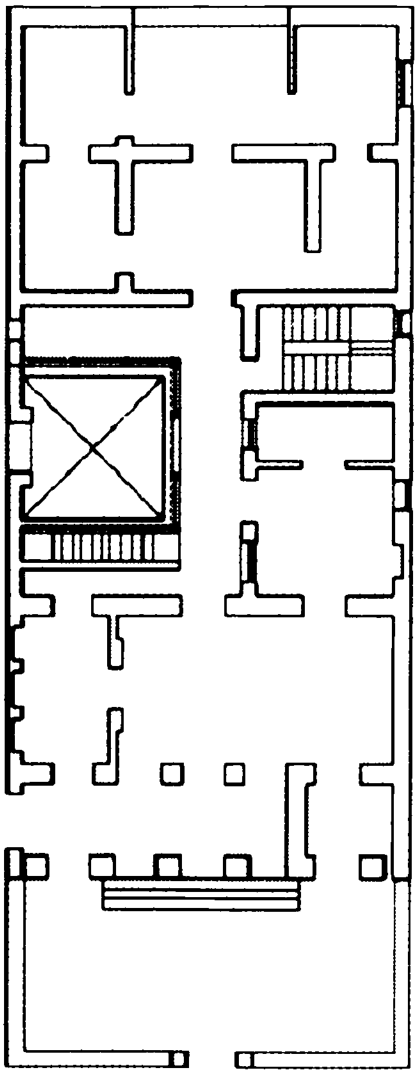

ভূমি নকশা- ৫ ঃ কাশিনাথ ভবন(৩নং ভবন), নিচতলা, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।

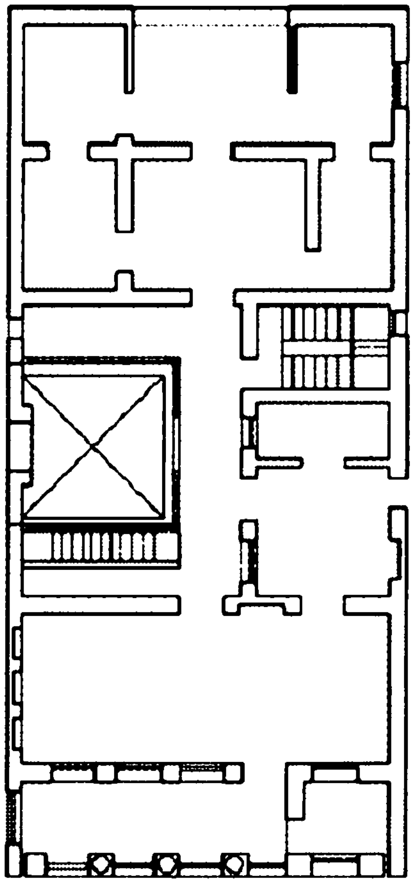

ভূমি নকশা- ৫ ঃ কাশিনাথ ভবন(৩নং ভবন), দোতলা, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।

খ. হলঘর কেন্দ্রিক জমিদার বাড়ি

বালিয়াটি জমিদারবাড়ি

আলোকচিত্র ঃ ১৭,১৮,১৯,২০   ভূমি নকশা ঃ ৬

অবস্থান

ঢাকার ৫০ কি.মি. উত্তর পশ্চিমে এবং মানিকগঞ্জ শহর হতে ৭ কি.মি. পূর্বে সাটুরিয়া উপজেলার বালিয়াটি গ্রামে 'বালিয়াটি' প্রাসাদ কমপ্লেক্সটি অবস্থিত।

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

প্রাসাদ কমপ্লেক্সটি ১৬.৪০ একর জায়গা নিয়ে এক সময়ে নির্মিত হয়েছিল। তবে বর্তমানে কমপ্লেক্সটি ৫.৮৮ একর এলাকা নিয়ে দাড়িয়ে আছে। এখানে মোট সাতটি আলাদা আলাদা ভবন রয়েছে। প্রাসাদ কমপ্লেক্সের সম্মুখে মূলত ৫টি আলাদা আলাদা ভবন ছিল। এর মধ্যে সর্ব পূর্বের ভবনটি বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সমস্ত এলাকাটি একটি উঁচ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ইমারতগুলির মধ্যে চারটি সম্মুখভাগে অবস্থিত। প্রতিটি ইমারতের সামনে রয়েছে একটি করে সিংহদ্বার। পশ্চিম দিক থেকে প্রথম তিনটির পিছনে নির্মিত হয়েছে দ্বিতল অন্দর মহল। তবে চতুর্থটির পিছনে এ রকম কোন স্থাপত্য নেই। ইমারতের সম্মুখে বেষ্টনী প্রাচীরের বাইরে রয়েছে একটি বিশাল জলাশয় এবং ইমারতগুলির পিছনে পারিবারিক ব্যবহারের জন্য আরেকটি ক্ষুদ্র জলাশয় রয়েছে। প্রাসাদটি দক্ষিণমুখী এবং চারটি ইমারত মিলে এর ফাসাদটি টানা ৪০০ ফুট দীর্ঘ। দুই কোণের প্রাসাদ দুটি তৃতীয় তলা বিশিষ্ট ও মাঝের দুটি দ্বিতল বিশিষ্ট। উভয় তলায় টানা-বারান্দাযুক্ত। আয়তাকারে নির্মিত এই ইমারত গুলির বারান্দায় আটটি করে করস্থীয় স্তম্ভ রয়েছে যা একেবারে ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় তলার বারান্দায় cast-iron এর রেলিং দিয়ে ঘেরা। চারটি ইমারতের মধ্যে কোণার ইমারত দুটি তৃতীয় তলা বিশিষ্ট হওয়ায় এই দুটি মাঝের দুটির অপেক্ষা উঁচু। দুই পাশের ইমারতের স্তম্ভগুলি স্বনির্ভরভাবে নির্মিত হলেও মাঝের ইমারগুলোর স্তম্ভ দেয়ালের সাথে সংলগ্ন আকারে নির্মিত হয়েছে। স্তম্ভ গুলো শিরালভাবে উঁচু ভিত্তির উপর নির্মিত হয়েছে। তবে কোণার ইমারতগুলি উঁচু ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু মাঝের দুটিতে এরকম ভিত্তি ভূমি অনুপস্থিত। সর্ব পশ্চিমের ইমারতের বারান্দা থেকে একটি cast-iron এর সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে ওঠা যায়। বারান্দার পিছনে ইমারতের কক্ষগুলো বিন্যস্ত। প্রতিটি ইমারতের উপরে রয়েছে অনুচ্চ প্যারাপেট। সম্মুখের এই ইমারতের পিছনে রয়েছে দোতলা বিশিষ্ট অন্দর মহল যা একটি লম্বা উন্মুক্ত অঙ্গনের চারিদিকে বিন্যস্ত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এই কমপ্লেক্সে দু'শর বেশী বিভিন্ন আকৃতির কক্ষ রয়েছে ।[১]এর উত্তরে ইমারত গুলোর পিছনে পারিবারিক ব্যবহারের জন্য জলাশয়টি অবস্থিত। এই জলাশয়ে দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে মিলে মোট পাঁচটি ঘাট রয়েছে। জলাশয়ের উত্তর দিকে নির্মিত হয়েছে একসারি প্রাসাদের সৌচাগার। সমগ্র ইমারতটি সম্পর্কে B.C Allen মন্তব্য করেছেন যে, এই বিশাল ভবনটি দেখলে ইংল্যান্ডের জর্জিও কাউন্ট্রি হাউজ এর কথা মনে করিয়ে দেয়।[২]

অলংকরণ

কমপ্লেক্সের প্রতিটি ইমারতের অলংকরণ একটি অপরটি থেকে আলাদা। সর্ব পূর্বের ইমারতটিতে প্রবেশ করতে প্রথমেই যে প্রবেশ পথটি রয়েছে তার উপর নির্মিত হয়েছে একটি সিংহ মূর্তি। সিংহ মূর্তিটির একটি পা গোলাকার বস্তুর উপর স্থাপিত। এই বস্তুটি ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে নির্মিত হয়েছে। সিংহের মূর্তিটি কেশরযুক্ত ও গর্জনমুখী। ইমারতের চারটি প্রবেশদ্বার একই নকশায় নির্মিত। সর্ব পূর্বের ইমারতটি তৃতীয় তলা বিশিষ্ট। এর সম্মুখের ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত স্তম্ভ গুলো উঁচু ভিত্তির উপর শিরাল নকশা যুক্ত। স্তম্ভ শীর্ষ স্টাকো নির্মিত করন্থীয় পাতা ও আইওনীক প্যাচ যুক্ত নকশা সহযোগে অলংকৃত । এর ঠিক নিচেই রয়েছে একটি পাড় নকশা। স্তম্ভ শীর্ষের ঠিক উপরে যার উপরে ইমারতের ফ্রিজটি স্থাপিত হয়েছে সেই অংশে দানাযুক্ত এক সারি নকশা লক্ষ করা যায়। কর্নিশের ব্রাকেট এক ধরনের স্টাকো অলংকরণ রয়েছে। cast-iron এর নকশা গুলো লক্ষ্য করা যায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার রেলিং গুলোতে। তৃতীয় তলার রেলিং এ অনেকটা কলকা ধরনের নকশা থাকলেও দ্বিতীয় তলার রেলিংটি তৃতীয় তলা থেকে ভিন্ন। ইমরাতের সম্মুখভাগে আর তেমন কোন নকশা দেখা যায় না।

উপরে আলোচিত ইমারতের পাশের ইমারতটি দ্বিতল। স্তম্ভগুলো সংলগ্ন এবং ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথম তলার খিলান স্বল্প বাকযুক্ত এবং কি স্টোন গুলো বৃহদাকারে নির্মিত। দ্বিতীয় তলার খিলান পট হতে রয়েছে কাঠের জাফরী এবং কি স্টোন এ পাতার নকশা দেখা যায়। ইমারতের সবচেয়ে বেশী অলংকরণ দেখা যায় স্তম্ভ শীর্ষে। প্রথম ইমারতটির মতো এখানেও করন্থীয় পাতা ও আইওনীয় পাতা নকশা আছে। এর রেলিং গুলো cast-iron এর লতানো নকশায় অলংকৃত। cast-iron এর আরো নকশা রয়েছে দেতলায় ওঠার সিঁড়ির রেলিং গুলোতে। এই ইমারতের প্রথম তলা যে কক্ষটি বর্তমানে যাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার ছাদ সহ সম্পূর্ণ দেয়ালই খোপযুক্ত ফুলের রঙিন নকশা দ্বারা চিত্রিত।এর জানালা গুলোর উপরে রয়েছে কাঠের জাফরী।

---

১. Nazimuddin Ahmed, *Buldings of the British Raj in Bangladesh,* Dhaka: University Press Limited, 1986, P-76

২. B.C, Allen, *East Bengal District Gazetteer,* (Allahabad) 1912, P-170

Dhaka University Institutional Repository

এই জাফরী গুলো সোনালী, লাল ও নীল এই তিন রঙে সজ্জিত। কক্ষের প্রতিটি দরজা ও জানালার মাঝে রয়েছে একটি করে বড় আয়না। আয়নাগুলো নকশাকৃত কাঠের ফ্রেম দ্বারা আবদ্ধ। এছাড়া কক্ষের নির্মিত দেয়াল আলমারি গুলোতে কাঠের খোদাই নকশা দেখা যায়।

এর পাশের ইমারতটিও দ্বিতল বিশিষ্ট। অলংকরনের দিক দিয়েও এই ইমারতটি দ্বিতীয় ইমারতটির অনুরূপ তবে এর প্রথম তলা অগভীর খিলানের উপরে কী ষ্টোনে স্টাকো নির্মিত অলংকৃত মুকুট নকশা দেখা যায়। দ্বিতীয় ইমারতটি অপেক্ষা এটি আরো একটু ভিন্ন। কেননা এর উপরে নির্মিত হয়েছে দুটি শীর্ষ দন্ডের মাঝখানে একটি স্টাকো নির্মিত অলংকৃত ফোকর নকশা এবং এর প্যারাপেটের নির্ধারিত দুরত্বে নির্মিত মিনার শীর্ষ গুলোও স্টাকোর জাকালো নকশায় সজ্জিত।

সর্বশেষ ইমারতটিও তৃতীয় তলা বিশিষ্ট। এই ইমারতটি সবচেয়ে বেশী অলংকৃত। সর্ব পূর্বের ইমারতের ন্যায় নির্মিত হলেও এর ফ্রিজ এবং প্যারাপেটের উপরে অপূর্ব স্টাকো নকশা দেখা যায়। ইমারতের ঠিক মাঝখানে ফ্রিজে নির্মিত হয়েছে দু'টি উড়ন্ত বিদ্যাধর এর প্রতিকৃতি। এর দুই পাশে বিস্তৃত হয়েছে ফুল, ফল ও পাতার স্টাকো নকশা। এই নকশাটির পাশে নির্ধারিত দুরত্বে মনুষ্য প্রতিকৃতি ও ময়ুর নকশাও উপস্থাপিত হয়েছে। প্যারাপেটের মিনার গুলোর উপরের শীর্ষ গুলোও জাকালো নকশায় সজ্জিত। স্তম্ভ গুলোর শীর্ষ সর্ব পূর্বের ইমারত গুলোর অনুরূপ হলেও এই ইমারতে করন্থীয় পাতার মাঝে মনুষ্য মুখ অবয়বের প্রতিকৃতি সংযুক্ত হয়েছে।

নির্মাণ কাল

এই ইমারতটি প্রসিদ্ধ লবন ব্যবসায়ী গোবিন্দরাম সাহা কর্তৃক উনবিংশ শতকে নির্মিত হয়েছে। গোবিন্দরামের চারপুত্র দোধিরাম, আনন্দরাম, পন্ডিতরাম ও গোলাপরাম। দোধিরামের দুইপুত্র পূর্ব ও পশ্চিমের বাড়ি দুটির নির্মাতা। পন্ডিতরামের বংশধরগন মাঝের বাড়িটি তৈরি করেন। গোলাপরামের তৈরি বাড়িটি উত্তর মহল এবং আনন্দরামের তৈরি গোলাবাড়ি নামে পরিচিত।[১] বর্তমানে ইমরাতটি বাংলাদেশ প্রত্মতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক একটি সংরক্ষিত ইমারত এবং এখানে একটি যাদুঘর রয়েছে।

১. *Ibid*, P-76.

Dhaka University Institutional Repository

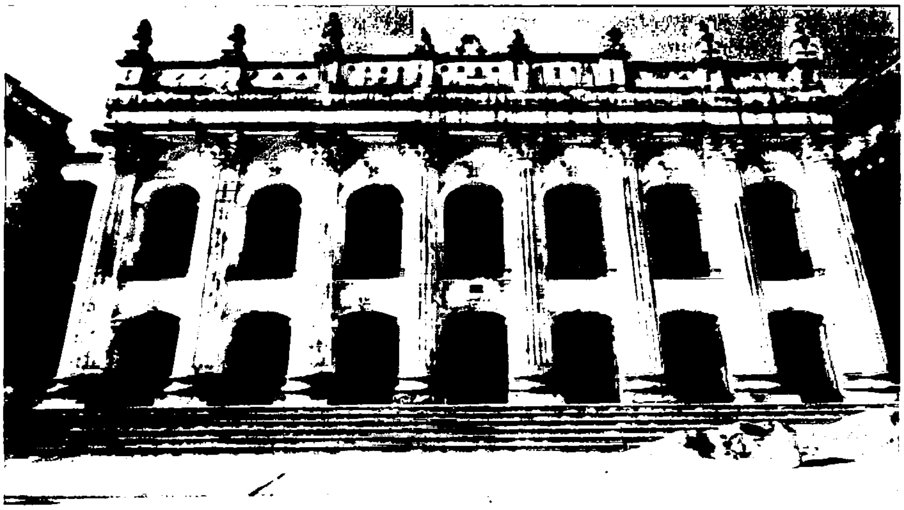

আলোকচিত্র :১৭ বালিয়াটি জমিদারবাড়ির কলস ভিত্তি, মানিকগঞ্জ।

আলোকচিত্র :১৮ বালিয়াটি জমিদারবাড়ি উচুঁ ভিত্তি, মানিকগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র :১৯ বালিয়াটি জমিদারবাড়ির সম্মুখ দৃশ্য, মানিকগঞ্জ।

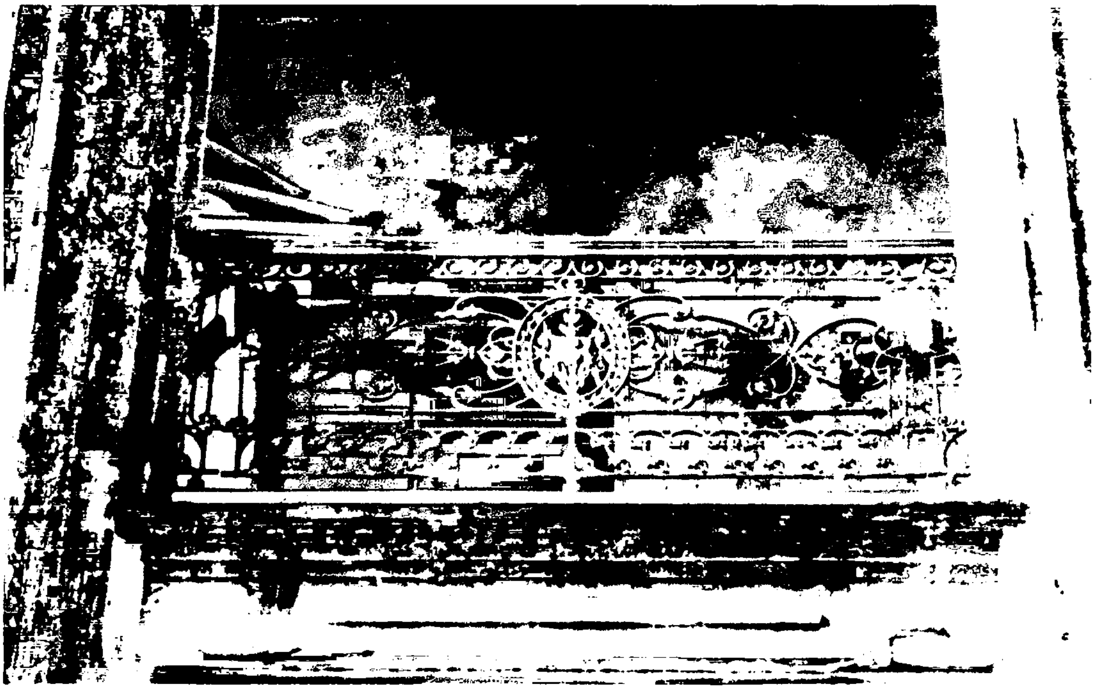

আলোকচিত্র : ২০ cast-iron এর অলংকরণ, বালিয়াটি জমিদারবাড়ি, মানিকগঞ্জ।

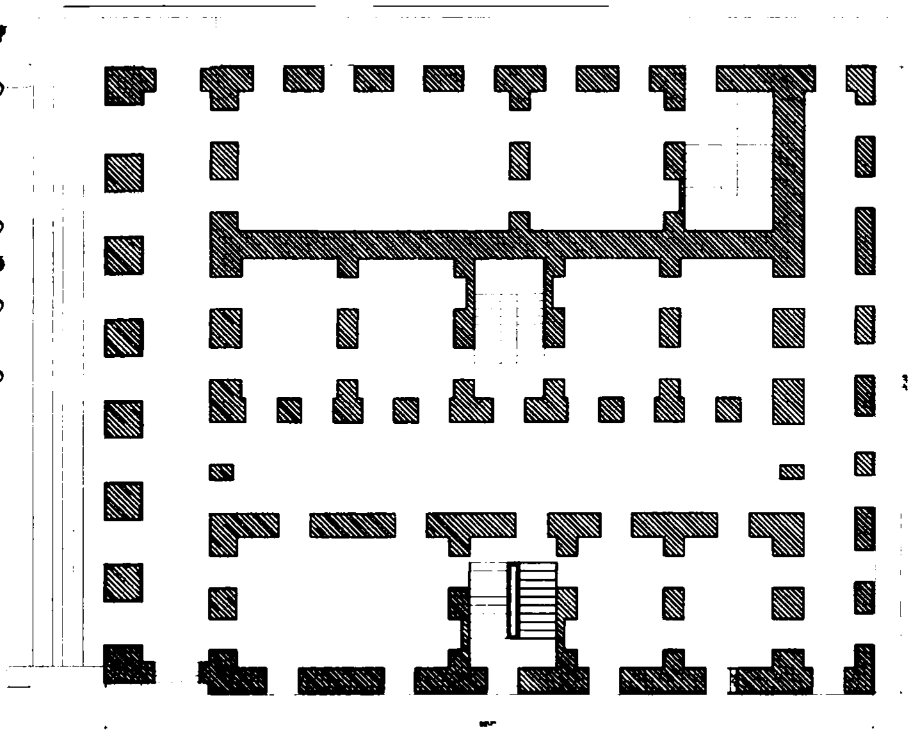

ভূমি নকশা-৬ ঃ বালিয়াটী জমিদার বাড়ি,
সাটুরিয়া,মানিকগঞ্জ (১ম ভবন - নীচতলা)।

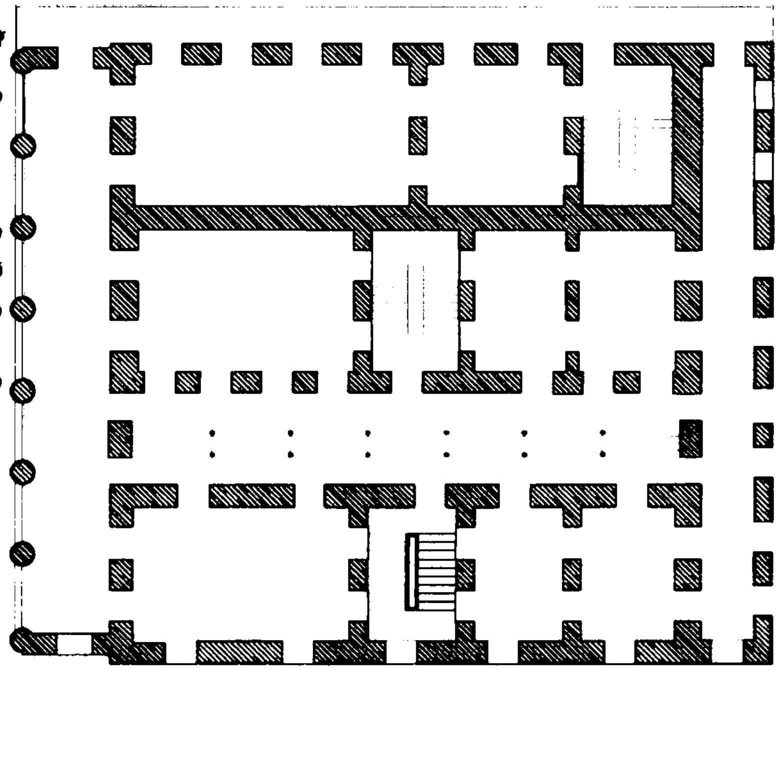

ভূমি নকশা-৬ ঃ বালিয়াটী জমিদার বাড়ি,
সাটুরিয়া,মানিকগঞ্জ (১ম ভবন - দোতলা ও তৃতীয় তলা)।

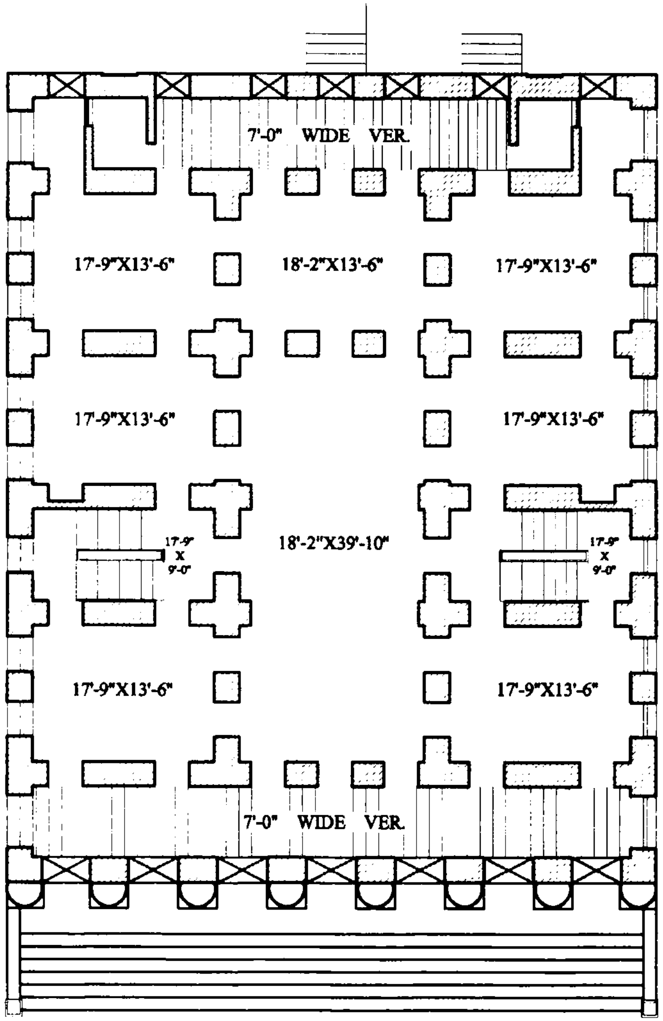

উঃ ভূমি নকশা-৬ ঃ বালিয়াটী জমিদার বাড়ি,
সাটুরিয়া,মানিকগঞ্জ (২য় ভবন - নীচতলা) ।

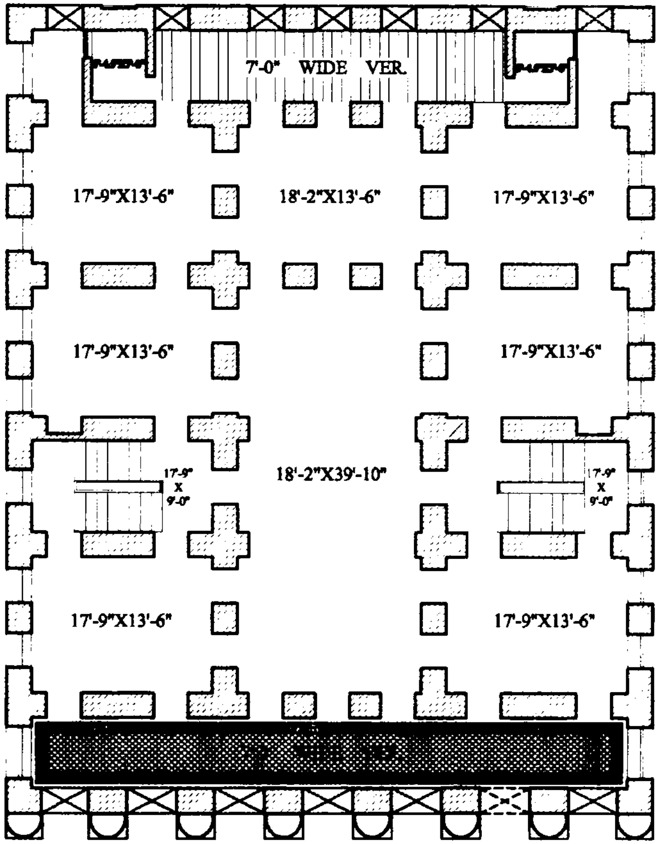

উঃ ভূমি নকশা-৬ ঃ বালিয়াটী জমিদার বাড়ি,
সাটুরিয়া,মানিকগঞ্জ (২য় ভবন - দোতলা) ।

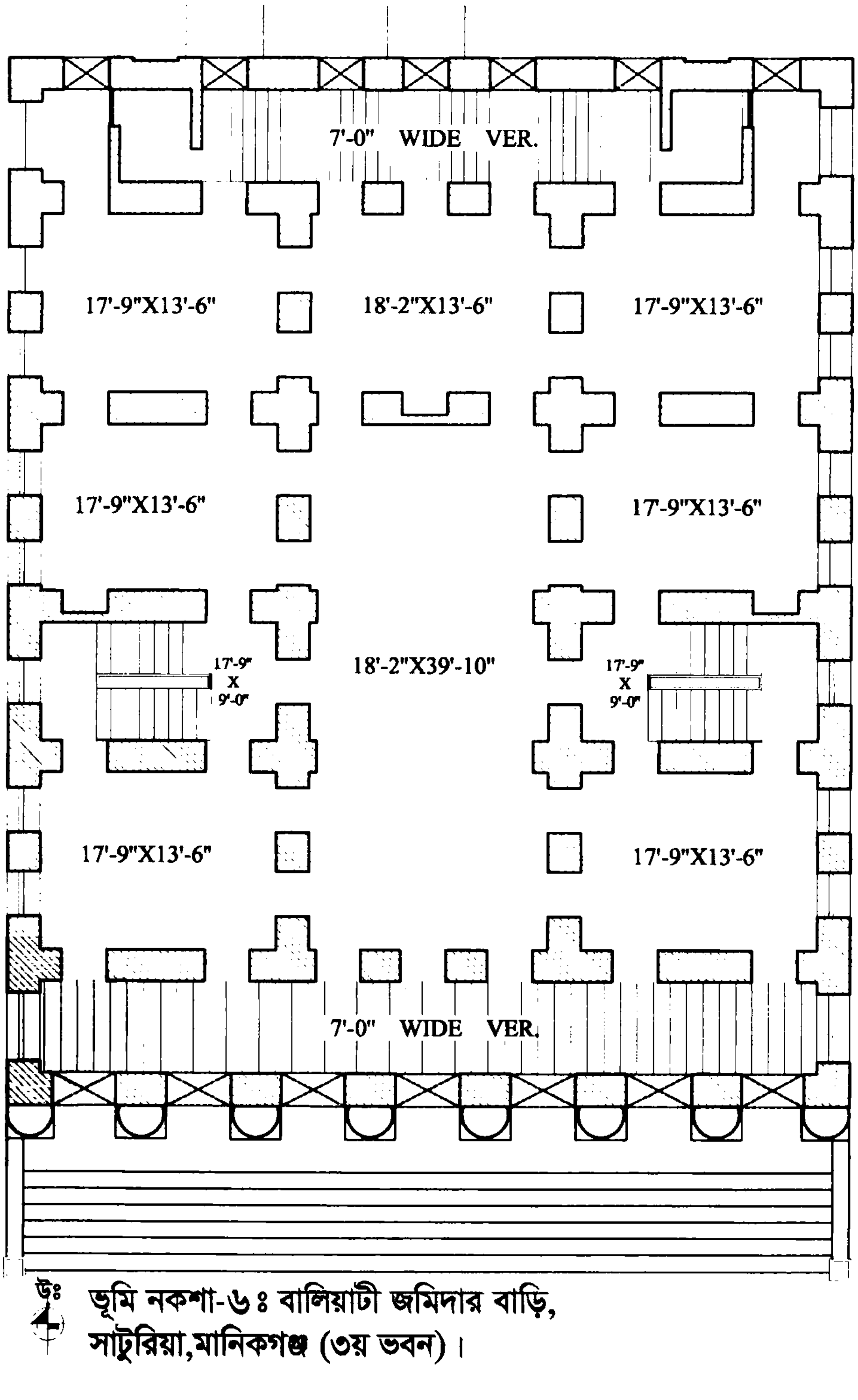

ভূমি নকশা-৬ঃ বালিয়াটী জমিদার বাড়ি, সাটুরিয়া,মানিকগঞ্জ (৩য় ভবন)।

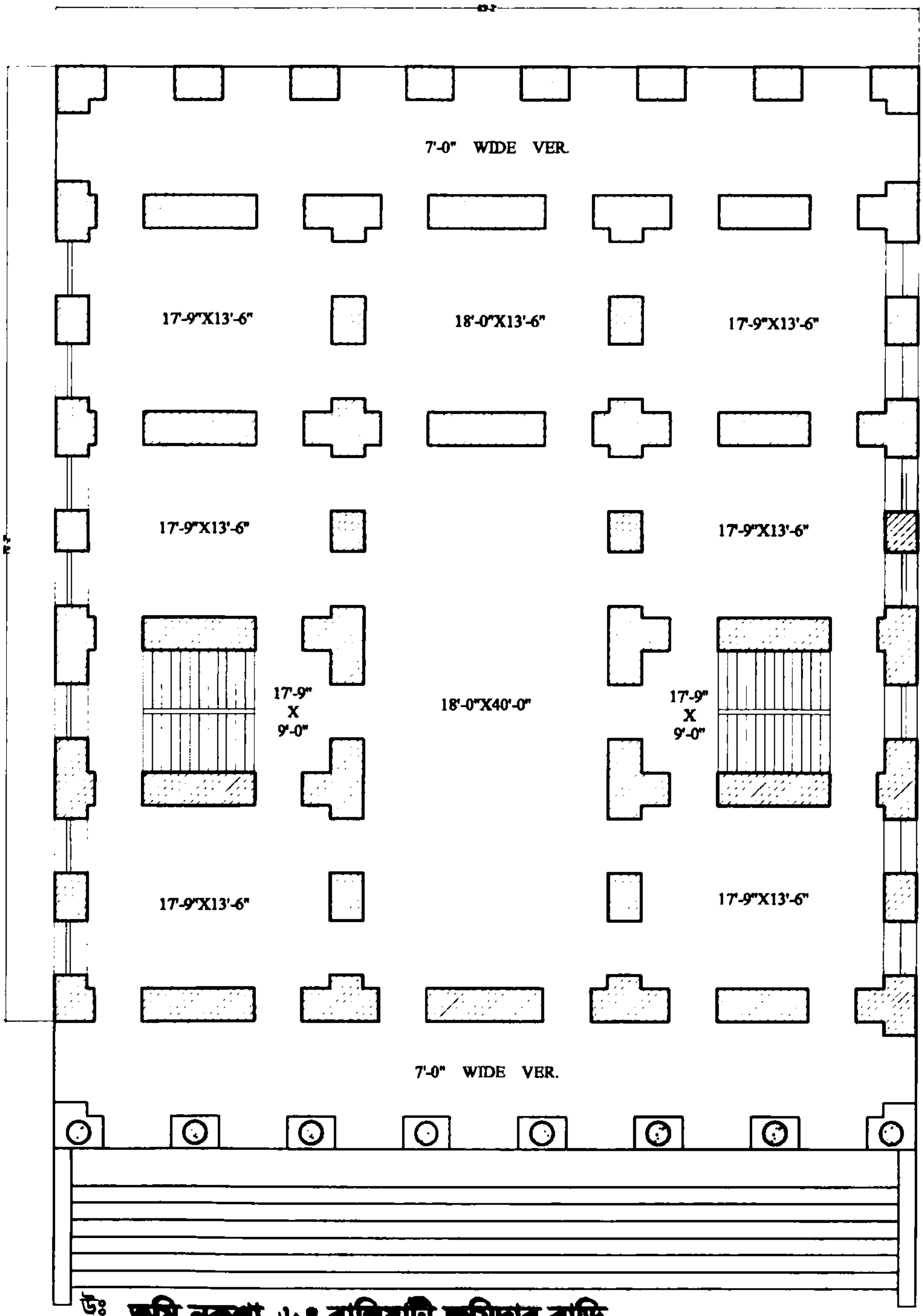

উঃ **ভূমি নকশা-৬ঃ বালিয়াটী জমিদার বাড়ি,**
সাটুরিয়া,মানিকগঞ্জ (৪র্থ ভবন)।

Dhaka University Institutional Repository

মুড়াপাড়া জমিদারবাড়ি মন্দির

আলোকচিত্র ঃ ২১,২২,২৩,২৪,২৫,২৬   ভূমি নকশা ঃ ৭

অবস্থান

মুড়াপাড়া জমিদারবাড়ি মন্দিরটি মুড়াপাড়া প্রাসাদের সামনের জলাশয়ের দক্ষিণ পাশে পাশাপাশি দুটি মন্দির অবস্থিত। জলাশয় থেকে প্রথমটি ইট নির্মিত এবং অপরটি বেলে পাথরের নির্মিত।

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

ইট নির্মিত মন্দির : পরিত্যক্ত এই মন্দিরটি দুটি বর্গাকার কক্ষ নিয়ে আয়তাকারে নির্মিত। পিছনের কক্ষটি গর্ভগৃহ সামনেরটি মন্ডপ। পিছনের কক্ষের চারধারে দুটি করে গোলায়িত স্তম্ভ বাইরের দিকে বের করে স্থাপন করা হয়েছে। স্তম্ভ সমূহের উপরে নির্মিত হয়েছে ছোট ছোট ছত্রী। ছত্রীগুলোর উপরে ক্ষুদ্র গম্মুজগুলো খাজকাটা ও শিখরযুক্ত। মন্ডপের উপরে সম্মুখের দিকে ছাদের উপরে ক্ষুদ্র মিনার রয়েছে। মিনার গুলোর উপরের অংশ বক্রাকারে নির্মিত ও শীর্ষদণ্ড যুক্ত। গর্ভগৃহের ঠিক উপরে অস্বাভাবিক উঁচ ড্রামের উপর নির্মিত হয়েছে বাল্ব আকৃতির গম্মুজ। ড্রামটি অষ্টকোণাকারে নির্মিত ও প্রতিটি দিকে রয়েছে ত্রিখাজ খিলান নকশা। এর টিমপ্যানাম গুলো উন্মুক্ত করে আলো প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অষ্টকোনাকার ড্রামের নিম্নে অবস্থান্তর এলাকায় স্কুইঞ্চ পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মন্ডপের ছাদটিও খিলান ছাদ আকারে নির্মিত। মন্দিরের বাইরের দিকে বিশেষ করে গম্মুজের ড্রামে করিন্থিয় পাতা ও অন্যান্য স্টাকো নকশার বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। তবে ভিতরে খিলান স্প্যানড্রিলে চিনি টিকরীর নকশা দেখা যায়। অলংকরণে স্টাকো নির্মিত নকশাই অধিক ব্যবহৃত হয়েছে। স্তম্ভগুলোর শীর্ষে স্টাকো নির্মিত করিন্থিয় পাতা ও প্যাচানো নকশার সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। মন্দিরের ফ্রিজ বরাবর স্টাকো নির্মিত ফুল ও লতার নকশা এবং এর নিচে একসারি পাড় নকশা রয়েছে। খিলান গুলোর স্থাপত্যিক রেখা ধরে দুই সারি লতানো নকশা খিলানের সৌন্দর্য বর্ধনে নির্মাণ করা হয়েছে। খিলান স্প্যানড্রিলের রয়েছে ফুল লতা পাতার স্টাকো অলংকরণ। মন্দিরের কর্নিশের ব্রাকেট এবং গম্মুজের ব্রাকেট গুলো সাপের ফনার ন্যায় নকশাকৃত। গম্মুজ শীর্ষে এক সময় কলস নকশা ছিল বলে অনুমিত হয় যা বর্তমানে ভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান। গম্মুজের চারধারে আরো এক সারি পাড়-নকশা রয়েছে। অষ্টকোনাকার ড্রাম ও গম্মুজের নিম্নাংশে সাপের ফনার ন্যায় বাকানো পাতার নকশা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মন্দিরের গর্ভগৃহের ভিতরে মূর্তি প্রতিস্থাপনের জন্য রয়েছে একটি কুলুঙ্গি। মন্দিরের গর্ভগৃহের দুই পাশে (উত্তর ও দক্ষিণে) তিন খাজ বিশিষ্ট সূচালো খিলান দুটির সঙ্গে মায়ানমারের বৌদ্ধ মন্দিরের খিলানের সাদৃশ্য রয়েছে।[১] খিলানের চারধারে রয়েছে সাপের চামড়ার মতো খাজযুক্ত নকশা।

বেলে পাথর নির্মিত মন্দির

মন্দিরটি একটি দুইধাপ বিশিষ্ট ইটের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইটের ভিতের উপরে নির্মিত এই মন্দিরটি নির্মাণে বেলে পাথরের স্বল্প উচ্চ একটি ভিত্তি ভূমি ব্যবহৃত হয়েছে। সম্পূর্ণ মন্দিরটি বেলে পাথরের তৈরি। এর গর্ভগৃহটি বর্গাকার এবং এর সামনে রয়েছে চারটি স্তম্ভের উপর নির্মিত একটি মন্ডপ। মন্দিরের গর্ভগৃহের উপরে নির্মিত হয়েছে ত্রিরথ রীতির শিখর। পিড়ামিড আকৃতির এই শিখরের প্রতিটি দিকে রয়েছে দুটি করে উদগত অংশ এবং এর চারধারে চারটি সংলগ্ন শিখর। মন্দির শিখরে রয়েছে অমলক ও এর উপরে প্রস্ফুটিত পদ্মের মাঝে একটি খাজযুক্ত কলস নকশা। অমলকের চারদিকে রয়েছে চারটি ফনাযুক্ত সাপের মাথা এবং সর্বশীর্ষে একটি দণ্ড। স্তম্ভ গুলো খাজযুক্ত ফুলদানি হতে উত্থিত। মন্দিরের গর্ভগৃহের চারদিকে রয়েছে চারটি উন্মুক্ত খিলান। সামনের মন্ডপের দিকে দরজার ঠিক উপরে রয়েছে একটি গণেশের খোদিত প্রতিকৃতি। দরজার দুই ধারে ময়ুরের উপর উপবিষ্ট কার্তিক এর প্রতিকৃতিসহ আরো কিছু দেব দেবীর খোদিত প্রতিকৃতি ছিল যা বর্তমানে অনেকটাই ধবংসপ্রাপ্ত। মন্দিরের একেবারে পিছনে রয়েছে একটি খাজকাটা বদ্ধ খিলান। এই খিলানের মাঝখানে একটি ভেনিসীয় খড়খড়িযুক্ত দরজার নকশা রয়েছে। দরজার দুইধারে তিনটি করে মোট ছয়টি প্যানেলে রয়েছে ছয়টি প্রতিমা। এদের প্রত্যেকের নাম নিচে লেখা রয়েছে। এদের মধ্যে গঙ্গা, কালী, জগধাত্রী, শিবগৌরী, উমা, মহাশিব এর নাম রয়েছে। মন্দিরের অপর দুই পাশেও ছয়টি করে প্যানেল রয়েছে যাদের মাঝখানে প্রতিকৃতির পরিবর্তে রয়েছে ফুলেল নকশা। এই ধরনের বেলে পাথরের আরো মন্দির রয়েছে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা জমিদারবাড়ি মন্দিরে।[২]

নির্মাণ কাল

স্টাকো নির্মিত মন্দিরের দক্ষিন গৃহ মুখে বাংলা হরফে উৎকীর্ণ মন্দিরটি নির্মাতা ও নির্মাণ তথ্য সম্পকির্ত মার্বেল প্রস্তরের একটি ফলক রয়েছে। উক্ত শিলালিপি অনুসারে মন্দিরটি ১২৯৬ (১৮৮৯) সনে রামরতন ব্যানার্জি কর্তৃক নির্মিত।[৩]

---

১. Eim-ya-Kyaung nga- myethna, SI. 1831, Pierre Pichard, *Iventory of Monuments at Panam*, Vol- 7, KISCADALE EFEO UNESCO, Paris, 1999.
২. Babu Ahmed & Nazly Chowdhury, *Selected Hindu Temple of Bangladesh*, UNESCO, Dhaka, P. 78.
৩. এ বি এম হোসেন (সম্পা.) স্থাপত্য, *সাংস্কৃতিক সমীক্ষা মালা*-২, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৩৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

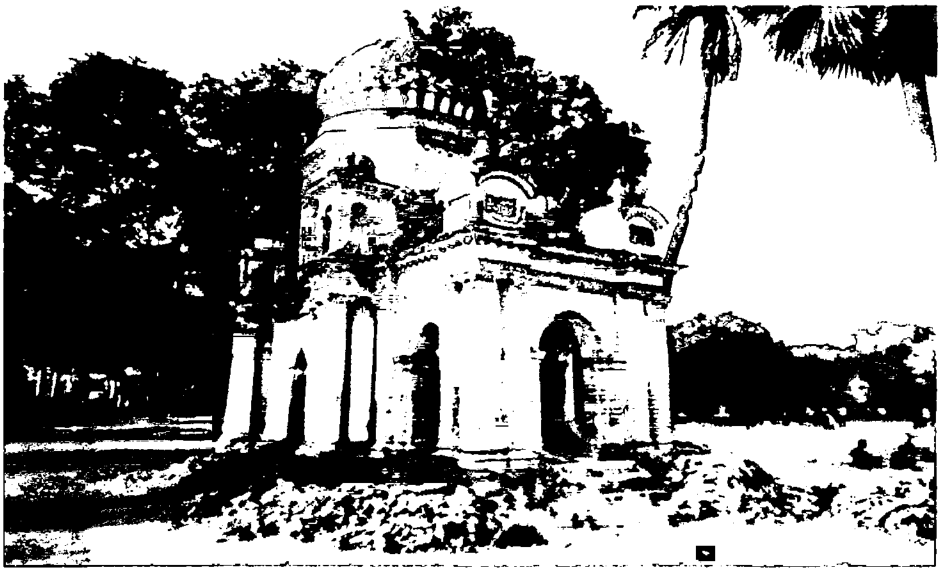

আলোকচিত্র : ২১ মুড়াপাড়া জমিদারবাড়ি (ইট নির্মিত) মন্দির, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

আলোকচিত্র :২২ মুড়াপাড়া জমিদারবাড়ি (ইট নির্মিত) মন্দির, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র :২৩ মুড়াপাড়া জমিদারবাড়ি (বেলে পাথর নির্মিত) মন্দির, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

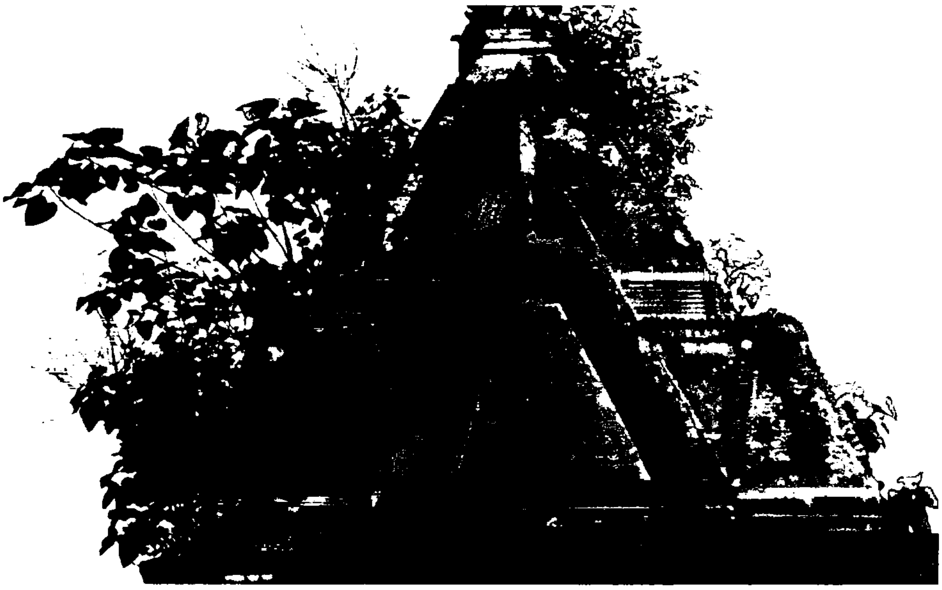

আলোকচিত্র :২৪ মুড়াপাড়া জমিদারবাড়ি (বেলে পাথর নির্মিত) মন্দির, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

আলোকচিত্র :২৫ মুড়াপাড়া জমিদারবাড়ি (বেলে পাথর নির্মিত) মন্দিরের প্যানেল নকশা, রূপগঞ্জ,নারায়ণগঞ্জ

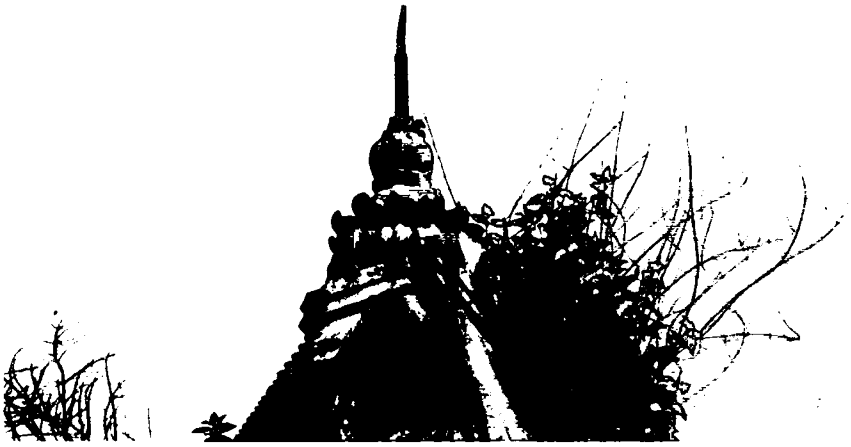

আলোকচিত্র :২৬ মুড়াপাড়া জমিদারবাড়ি (বেলে পাথর নির্মিত) মন্দিরের চূড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

Dhaka University Institutional Repository

তেওতা নবরত্ন মন্দির

আলোকচিত্র ঃ ২৭,২৮,২৯   ভূমি নকশা ঃ ৮

অবস্থান

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার আরিচা ফেরিঘাট হতে ২.৫ কি.মি. উত্তরে তেওতা গ্রামে দুটি জলাশয়ের মাঝে এক সারিতে নির্মিত তেওতা প্রাসাদের উত্তর পশ্চিম কোনে দৃষ্টি নন্দন এই মন্দিরটি অবস্থিত। তিনতলা বিশিষ্ট এ মন্দিরটি প্রথম তলায় চারটি, দ্বিতীয় তলায় চারটি এবং তৃতীয় তলায় শীর্ষে একটি এ নিয়ে নয়টি শিখর সহযোগে গঠিত হওয়ায় মন্দিরটি নবরত্ন মন্দির নামে পরিচিত।

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

বর্গাকৃতির এই মন্দিরটি পরিমাপ ৩৩ ফুট। উত্তর দিকে তিনধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করা যায়। তিন তলা বিশিষ্ট তেওতা মন্দিরের প্রথম তলার প্রতি বাহুতে রয়েছে পাঁচটি করে খিলাকৃত প্রবেশ পথ। প্রথম তলার কেন্দ্রে চারটি স্তম্ভের উপরে নির্মিত হয়েছে মূল কক্ষ। কক্ষটির চারিদকে খিলানকৃত প্রবেশ পথ রয়েছে। মূল কক্ষের চারিদিকে রয়েছে একটি প্রদক্ষিণ পথ। প্রদক্ষিণ পথের উত্তর বাহুতে দ্বিতলে উঠার জন্য রয়েছে একটি সোপানশ্রেণি। প্রদক্ষিণ পথটির প্রতি বাহুতে তিনটি করে খিলান পথ রয়েছে। এই খিলান পথের চতুর্দিকে ঘিরে রয়েছে আরো একটি প্রদক্ষিণ পথ যার প্রতি বাহুতে পাঁচটি করে খিলানকৃত প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রতিটি খিলান তিন স্তরে নির্মিত সরু সংযুক্ত তিনটি করে মোট ছয়টি স্তম্ভের উপর ক্রমহ্রাসমানভাবে খিলানগুলি নির্মিত হয়েছে। প্রথম তলার খিলানগুলি অর্ধবৃত্তাকৃতির এবং আয়তাকার স্তম্ভের উপর নির্মিত। সম্মুখের চার বাহুর প্রবেশ পথ গুলোর টিমপ্যানাম বদ্ধ আকারে নির্মিত। এই টিমপ্যানাম গুলোতে এক সময় স্টাকো নির্মিত নকশা ছিল বর্তমানে যার খাস পড়ার চিহ্ন লক্ষ করা যায়। মন্দিরের চার কোণার স্তম্ভগুলো প্যানেল নকশা দ্বারা অলংকৃত।

দ্বিতীয় তলা

প্রথম তলার উত্তর বাহুর সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতীয় তলায় উঠা যায়। দ্বিতীয় তলাটির পরিমান ২১ ফুট বর্গাকৃতির। এর চারকোনায় রয়েছে চারটি শিখর। শিখর গুলো চার খিলান বিশিষ্ট এবং তার চূড়াগুলো পীড়া দেউলের শীর্ষের ন্যায় ধাপে ধাপে নির্মিত হয়েছে। বলাবাহুল্য এই ধরনের শীর্ষযুক্ত শিখরের উদাহরণ পশ্চিম বাংলায় প্রচলিত থাকলেও বাংলাদেশে এই উদাহরণটি বিরল। দ্বিতীয় তলার কেন্দ্রের মূল কক্ষটি চারটি স্তম্ভের চারদিকে উন্মুক্ত খিলান যোগে গঠিত এবং একটি মাত্র প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে। প্রদক্ষিণ পথটির প্রতি বাহুর চারিদিকে রয়েছে তিনটি করে অর্ধবৃত্তাকৃতির উন্মুক্ত খিলান পথ। প্রতিটি খিলান তিন স্তরে প্রথম তলার অনুরূপভাবে নির্মিত।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় তলার চার কোণায় প্রথম তলার অনুরূপ প্যানেল নকশা দেখা যায়। প্রদক্ষিণ পথের দক্ষিণ বাহুতে তৃতীয় তলায় উঠার জন্য রয়েছে একটি লোহার সিঁড়ি। বর্তমানে অধিকাংশ ধাপ ভেঙ্গে যাওয়ায় সিঁড়ি ব্যবহারের অনুপযুক্ত। [১]

তৃতীয় তলা : তৃতীয় তলাটি ২২ফুট ৫ ইঞ্চি বর্গাকৃতির এর চারদিকে রয়েছে অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলান। খিলানগুলি তিন স্তরে নির্মিত। তৃতীয় তলার চারকোনায় রয়েছে চারটি শিখর। শিখর গুলোর চারদিকে উন্মুক্ত খিলান সহযোগে নির্মিত। প্রতিটি শিখরের দক্ষিণ এবং পশ্চিমের খিলানগুলি বহুখাজে স্টাকো দিয়ে অলংকৃত। তৃতীয় তলাটির উপর নির্মিত হয়েছে মূল শিখরটি। শিখরটির নিচের অংশটি ত্রিরথ বৈশিষ্ট্যে নির্মিত।

অলংকরণ

ঊনিশ শতকের শেষ দিকে নির্মিত হলেও এ মন্দিরটি সমসাময়িক অন্য মন্দিরগুলোর মতো জাঁকালোভাবে অলংকৃত নয়, বরং এটিতে খুব কম অলংকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। পুরো মন্দিরটির গায়ে রয়েছে পলেস্তরার আস্তরন, পলেস্তরা দিয়েই নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় উৎকীর্ণ স্টাকো নকশা দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে। এ সব নকশা প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় ছাদের ঠিক নিচে ফ্রিজ বরাবর সমান্তরাল রেখার আকৃতিতে এবং তৃতীয় তলার একমাত্র শিখরটির গায়ের প্যানেলসমূহে সংযোজিত হয়েছে। প্রথম তলার চারিদিকের কোণে এবং দ্বিতীয় তলার শিখর সমূহের কোনে অনুরূপ প্যানেল রয়েছে, তবে সেখানে বর্তমানে কোনরূপ নকশা দেখা যায় না। অবশ্য এসব প্যানেলে এবং নিচতলার খিলানপটে এক সময় অলংকরণ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। লক্ষ্যণীয় যে এ মন্দিরটির অলংকরণে কেবল মাত্র ছাদের ব্রাকেটের চার কোণে চারটি গরুড় মূর্তি ছাড়া আর কোন প্রাণিবাচক মোতিফ খুঁজে পাওয়া যায় না। ছাদের নিচে ফ্রিজে যে নকশা রয়েছে সেগুলো অনেকটা মসজিদের গায়ে অ্যারাবেসক নকশার ন্যায় ফুল- লতা-পাতা দিয়ে সজ্জিত। আর শিখরের গায়ের প্যানেলে রয়েছে ফুলদনি থেকে উত্থিত লতা পাতার নকশা।

তেওতার নবরত্ন দোল মঞ্চটি ১৮৫৮ সালে নির্মিত। রত্নযুক্ত দোলমঞ্চ পূর্ববাংলায় স্থাপত্যে খুব কম দেখা যায় এদেশে দোলমঞ্চ নির্মাণের যে সকল উদাহরণ পাওয়া যায় যেমন- পুঠিয়া দোলমঞ্চ (রাজশাহী) তাড়াস দোলমঞ্চ (সিরাজগঞ্জ) সীতারামের দোলমঞ্চ (যশোর) এগুলোতে কোন রত্ন বা শিখর লক্ষ্য করা যায় না। তবে পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া জেলার কতুল পুরে ‘ভদ্র’দের দোলমঞ্চ নবরত্ন দোলমঞ্চের অপর একটি উদাহরণ।

---

১. George Micehell, *Brick Temples of Bangladesh*, P-40

তেওতা দোলমঞ্চের ন্যায় এখানকার শিখরগুলোও রেখা দেউল বৈশিষ্ট্যের। এখানে উল্লেখ্য যে, রেখা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত ক্ষুদ্র শিখর নির্মাণের উদাহরণ পশ্চিম বাংলায় অধিক পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের দিনাজপুরের কান্তনগরের নবরত্ন মন্দির ও সাতক্ষীরার অন্নপূর্ণা নবরত্ন মন্দিরে এই ধরনের ক্ষুদ্র রেখারীতির শিখর নির্মিত হয়েছে।[১] পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলায় নবরত্ন মন্দির নির্মাণে প্রথম তলায় তিন খিলান বিশিষ্ট্য। প্রবেশ পথ নির্মাণের প্রবনতা বেশী দেখা যায়। তেওতার নবরত্ন দোলমঞ্চে প্রথম তলায় পাঁচ খিলান বিশিষ্ট খিলান পথ রয়েছে যার সাথে প্রায় একই সময় নির্মিত চব্বিশ পরগণার তালপুকুরের অন্নপূর্ণা মন্দিরের মিল পাওয়া যায়। তবে অন্নপূর্ণা মন্দিরের প্রতিটি তলার কর্নিশগুলো স্পষ্ট বাঁকযুক্ত। অপর দিকে তেওতায় দোলমঞ্চের কর্নিশ একেবারে সমান্তরালভাবে (horizontal) নির্মিত।

রত্ন ও শিখর রীতির মন্দির বাংলার স্থাপত্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় রীতি। সমগ্র বাংলা একরত্ন, পঞ্চরত্ন, এয়োদশরত্ন, সতেররত্ন, একুশরত্ন, পঁচিশরত্ন, ইত্যাদি সংখ্যায় রত্ন ও শিখর মন্দির নির্মিত হয়েছে।[২] এরমধ্যে পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন বাংলায় অধিক জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয়। বিভিন্ন তলায় শিখর বা রত্ন স্থাপন করে মন্দির নির্মাণের এই পরিকল্পনাটির উৎস নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে বিভিন্ন মত প্রচলিত রয়েছে। অনেকে এই রীতিটির উৎস হিসাবে মুসলিম স্থাপত্য আবার অনেকে হিন্দু ঐতিহ্যকে নির্দেশ করেছেন। সম্রাট আকবর নির্মিত ফতেহপুর সিক্রির প্রাসাদের পঞ্চমহল বা হাওয়া মহলটি ক্রমহ্রাসমান তলে নির্মিত হয়েছিল। পাঁচতলা বিশিষ্ট এই ইমারতটির প্রতিটি তলার ছাদ স্তম্ভের উপর নির্মিত। সর্বোচ্চ তলাটি ছিল গম্মুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। বাংলায় নবরত্ন মন্দির বা দোল মঞ্চগুলো প্রায় একই প্রকৃতির ক্রমহ্রাসমান তলে নির্মিত ।[৩] ইমারতের বিভিন্ন তলে ক্ষুদ্র গম্মুজ বা ছত্রীর ব্যবহার ইসলামী স্থাপত্যে একটি বহুল চর্চিত বিষয়। লোদী স্থাপত্য, শুর স্থাপত্য ও পরবর্তীতে মোগল স্থাপত্যে ছত্রী গুরুত্বের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে লোদী, শুর বা মোগল ছত্রী হতে বাংলার মন্দিরের শিখর গুলো আলাদা মোগল বা তার পূর্ববর্তী ছত্রী নির্মাণে গোলায়িত সরু স্তম্ভ ব্যবহৃত হলেও বাংলার মন্দিরের শিখর নির্মানে খিলানের ব্যবহার লক্ষণীয় যা ক্ষুদ্র দেউল বা চারচালা মন্দির আকারে নির্মিত। তবে স্থাপত্যে ছত্রীর ব্যবহার নিঃসন্দেহে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু নবরত্ন পরিকল্পনায় প্রথম, দ্বিতীয় তলার চার কোণে ও তৃতীয় তলার কেন্দ্রীয় শিখর নির্মাণের ধারণাটি অবশ্য মোগল সমাধি স্থাপত্য থেকে এসেছে বলে মনে হয়। কেননা বাংলার নবরত্ন মন্দির পরিকল্পনা শিখর রীতির পঞ্চরত্ন পরিকল্পনার একটি বর্ধিত রূপ বলে মনে করা হয় এবং পঞ্চরত্ন মন্দির পরিকল্পনার ধারণা মোগল রাজকীয় সমাধি তাজমহল বা এই ধরণের চার ধারে ক্ষুদ্র ছত্রী ও মাঝখানে কেন্দ্রিয় গম্মুজ পরিকল্পনা থেকে নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়,

---

১. *Ibid*, p.85
২. *Ibid*, P.85
৩. Satish Grover, *The Architecture of India*, Islamic; New Delhi: Vikas Publication House Pvt. Ltd. 1981, P. 183

তবে সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি বা তাজমহল ইত্যাদি মঞ্চ শিখরযুক্ত সমাধি সৌধ এর পূর্বসূরী হিসেবে সাসারামে নির্মিত শেরশাহসূরের সমাধির কথা বলা যায়, যার পরিকল্পনা দেখলে হিন্দু পঞ্চায়ত মন্দির পরিকল্পনার কথা মনে পড়ে যায়। এছাড়া উপসনালয়ে চারধারে ক্ষুদ্র শিখর রেখে মাঝখানে সুউচ্চ শিখর নির্মাণের উদাহরণ পাগানের বৌদ্ধ মন্দির সমূহেও রয়েছে। যার অনেকগুলোই হিন্দু বৌদ্ধ যুগের তৈরি।[১]

সুতরাং বলা যায় মুসলিম পূর্বযুগের পঞ্চায়তন পরিকল্পনা বা পাগানের বৌদ্ধ মন্দিরে শিখর ধরণের নির্মাণ পরিকল্পনা মোগল স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে বাংলায় পুনরায় প্রবর্তিত হয়েছিল। তাই পরিকল্পনাটিতে আপাত দৃষ্টিতে ইসলামি স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষ করা গেলেও এটিতে মূলত ভারতীয় ভাবধারা অনুসৃত রয়েছে।

আলোকচিত্র: ২৭ তেওতা নবরত্ন মন্দির, শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

---

১. David, J. McCutchion, *Late Mediaeval Temples of Bengal*; Calcutta, The Asiatic Society, 19172, P. 8

আলোকচিত্রঃ ২৮ তেওতাঁ নবরত্ন মন্দির, শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

আলোকচিত্রঃ ২৯ ধ্বংসপ্রায় গরুড় মূর্তির নকশা,তেওতাঁ নবরত্ন মন্দির, শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

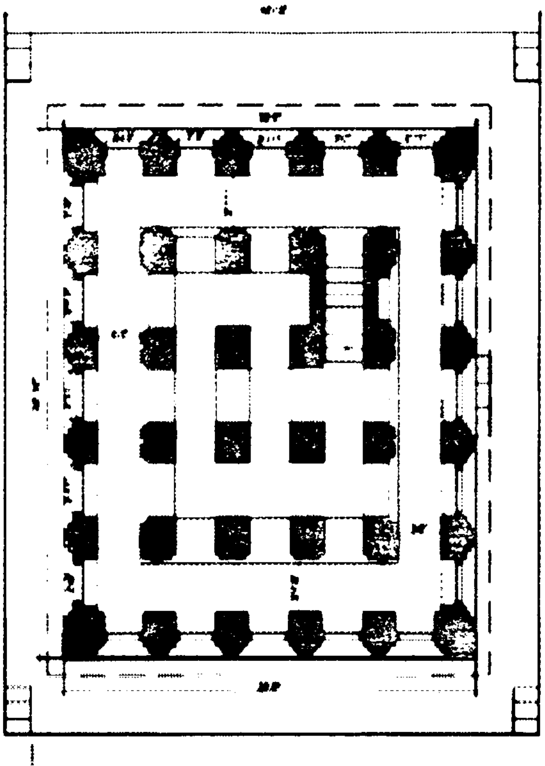

ভূমি নকশা-৮ ঃ,তেওতা নবরত্ন মন্দির-নীচতলা, তেওতা,মানিকগঞ্জ।

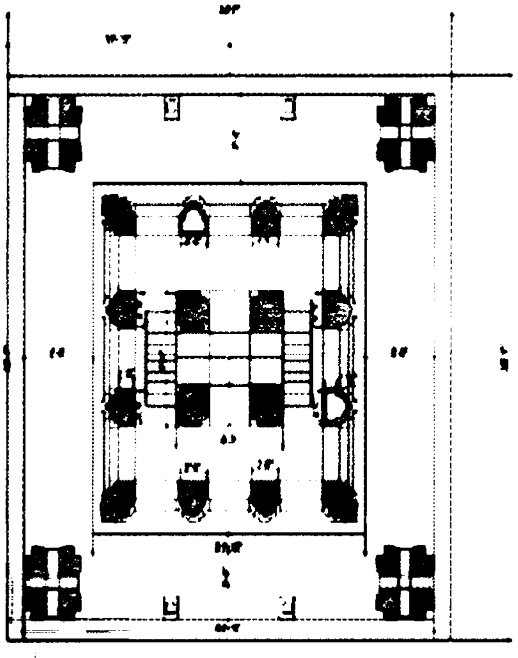

ভূমি নকশা-৮ ঃ,তেওতা নবরত্ন মন্দির-দোতলা, তেওতা,মানিকগঞ্জ।

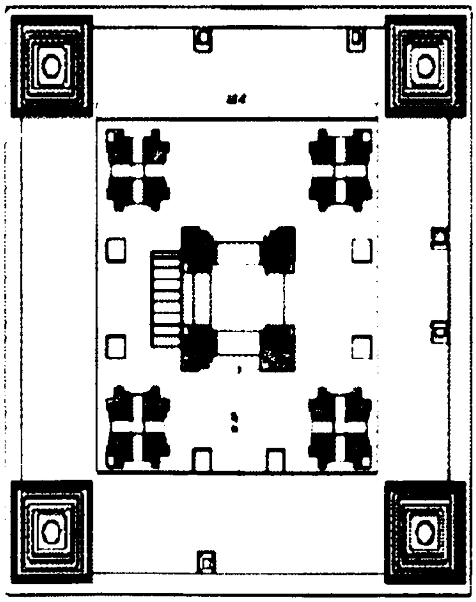

ভূমি নকশা-৮ ঃ,তেওতা নবরত্ন মন্দির-তৃতীয় তলা, তেওতা,মানিকগঞ্জ।

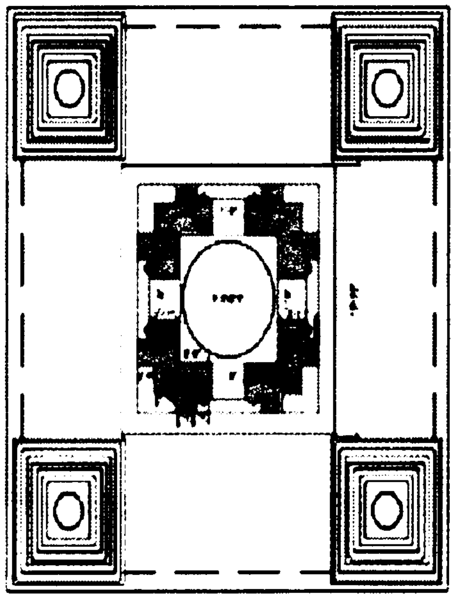

ভূমি নকশা-৮ ঃ,তেওতা নবরত্ন মন্দির-৪র্থ তলা, তেওতা,মানিকগঞ্জ।

রোজ গার্ডেন

আলোকচিত্র ঃ ৩০,৩১ ভূমি নকশা ঃ ৯

অবস্থান

পুরাতন ঢাকার কে.এম. দাস লেনে অবস্থিত রোজগার্ডেন ১৯৩০ সালে জমিদার ঋষিকেশ দাস কর্তৃক একটি বাগান বাড়ি হিসেবে নির্মিত হয়েছিল।[১] বিশাল চত্বরের পশ্চিম দিকে একটি ক্ষুদ্র জলাধারের সমন্বয়ে প্রাসাদোপম বাড়িটি দ্বিতল আকারে নির্মিত। এক সময়ে বাড়িটির চত্বরে বিভিন্ন প্রজাতির অপূর্ব সুন্দর গোলাপ উদ্যানে শোভিত থাকায় বাড়িটি 'রোজগার্ডেন' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বাড়িটি নির্মাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় হওয়ায় এর র্নিমাতা নির্মাণের কিছুদিন পরে বাড়িটি ঢাকার প্রভাবশীল জমিদার ও ব্যবসায়ী খান বাহাদুর আব্দুর রশীদের নিকট বিক্রি করে দেন (১৯৩৬)। [২] বহু সংস্কারের পর বর্তমানে বাড়িটি তুলনামূলক ভাবে ভালো অবস্থায় বিদ্যমান।

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

ইটের দ্বারা নির্মিত ইমারতটি দ্বিতল ও পশ্চিম মুখী। ৮০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৪৫ ফুট প্রস্থ এই ইমারতের সম্মুখ ও পিছনের অংশ কিছুটা বর্ধিত। এর সামনের এবং পিছনের অংশের দৈর্ঘ্য ৪৫ ফুট। এর পশ্চিম দিকের বর্ধিত অংশের মাঝখানে চুন সুরকী নির্মিত একটি পাঁচ ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি দিয়ে ইমারতের মূল অংশে প্রবেশ করতে হয়। তিন খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথটি দিয়ে বারান্দায় প্রবেশ করতে হয়। বারান্দার দুই পাশে উত্তর ও দক্ষিণে রয়েছে দুটি ক্ষুদ্র কক্ষ। উত্তর দিকের কক্ষে রয়েছে দ্বিতলে ওঠার সিঁড়ি। বারান্দার পূর্ব দিকের আর একটি তিন খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথ দিয়ে প্রাসাদের কেন্দ্রিয় হল রুমে প্রবেশ করতে হয়। হল রুমের দু'পাশে রয়েছে দু'টি ক্ষুদ্র কক্ষ। ক্ষুদ্র কক্ষ দু'টির দু'পাশে আরো দুটি বৃহৎ কক্ষ রয়েছে। কেন্দ্রিয় হল রুমের পূর্ব প্রান্তে রয়েছে ৪৪.১০" × ৮.২" পরিমাপের টানা বারান্দা। বারান্দা থেকে অপর একটি তিন খিলান বিশিষ্ট্য পথ দিয়ে বাড়ির বাইরে বের হওয়া যায়। এর আশে পাশে অন্যান্য স্থাপনাগুলি পরবর্তীকালে নির্মিত। দ্বিতীয়তলার কক্ষ বিন্যাস প্রথম তলার অনুরূপ। দ্বিতীয় তলার কেন্দ্রিয় সিঁড়ির দুই পাশে বাইরের দিকে ঝুলানো বারান্দা রয়েছে। কেন্দ্রিয় প্রবেশ পথের উপরের বারান্দাটি ইংরেজীতে 'ডি' অক্ষরের মতো বাইরের দিকে ঝুলানো। দ্বিতলের পূর্ব প্রান্তে রয়েছে একটি উন্মুক্ত (টেরেস) বা ছাদ।

১. Nazimuddin Ahmed, *Buildings of the British Raj in Bangladesh*, Dhaka, Univeristy Press Ltd. 1986, p. 49
২. *Ibid*, p. 49

ইমারতটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো এর ফ্যাসাদ (সম্মুখভাগ)। বর্ধিত অংশে ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত চারটি করন্থীয় স্তম্ভ উঁচু ভিত্তির উপর নির্মিত। ছাদের উপরে স্তম্ভগুলো চারকোণা ক্ষুদ্র মিনারের আকারে শেষ হয়েছে। মিনার এবং কলাম শীর্ষের মাঝখানে রয়েছে একটি করে পদ্মফুলের গোলক নকশা। স্তম্ভগুলো বাড়ির সৌন্দর্য বর্ধনে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। বর্ধিত অংশের সিঁড়ির দুই পার্শ্বে ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃতি কলামগুলো একটি আর একটির সাথে অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলান দ্বারা সংযুক্ত। মাঝখানের সিঁড়ি বরাবর একেবারে দোতলার ছাদের উপর নির্মিত হয়েছে স্তম্ভ সম্বলিত একটি ক্ষুদ্র গম্মুজ যার ব্যবহারে ইমারতটিতে একটি রাজকীয়ভাব ফুটে উঠেছে।

অলংকরণ

সমগ্র ইমারতটি ইউরোপীয় ধাঁচের অলংকরণ শোভিত। প্রবেশ পথের সিঁড়ির দুপাশে মশালবাহী মূর্তি। এর স্তম্ভ গুলো যেমন নিওক্ল্যাসিক্যাল যুগের করন্থীয় শীর্ষযুক্ত শিরালভাবে তেমনি এর প্রতিটি খিলানপট (টিমপ্যানাম) নকশাকৃত গ্রীল ও এর সাথে রঙিন কাঁচে আবৃত জানালা ও ইন্দো-ইউরোপীয় শৈলীর। খিলানের ঠিক কেন্দ্রে কি স্টোনটি ইউরোপীয় কায়দায় বড় করে নির্মিত। খিলানের ঠিক উপরে রয়েছে লতা পাতার স্টাকো নকশা। পাথর এবং সিমেন্ট প্লাস্টারে নির্মিত কি স্টোনটির উপরে আকর্ষনীয় পরী আকৃতির মূর্তির প্রতিকৃতি রয়েছে। ইমারতের দরজাওলো ভেনিসীয় রীতিতে তৈরি। বারান্দার রেলিংগুলোর নীচে রয়েছে কাঠের নকশাদার জাফরী। ইমারতের অলংকরণের আধিক্য স্থাপত্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে কিছু হলেও ব্যহত করেছে যা এই সময়ের স্থাপত্য শিল্পের অবনতির ধারাকে নির্দেশ করে।তবে এই আধিক্য পাশ্চাত্যের রোকোকো (Rococo) নকশার অনুরুপ।

রোজগার্ডেন প্রাসাদ অঙ্গনে রয়েছে মোট পাঁচটি উন্মুক্ত ভাস্কর্য (Garden Sculpture)। এর মধ্যে সিঁড়ির দু'পাশে রয়েছে মশালবাহী দণ্ডায়মান মূর্তি। এর দক্ষিণ প্রাঙ্গনে রয়েছে পাথর খোদাই এবং সিমেন্ট প্লাস্টারে গড়া যুগল নারী মূর্তি। প্রধান ফটকে উপরে একটি বালক (গার্ডেন ল্যেড) মূর্তি রয়েছে। প্রাসাদের সম্মুখে রাস্তায় রয়েছে অপর একটি নারী কুহকিনীর মূর্তি (The Night Whisperer)। প্রাসাদ প্রাঙ্গণ ও জলাধারের মাঝখানে সম্পূর্ণ প্রাসাদের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য নির্মিত হয়েছে মার্বেল এবং cast-iron এর নির্মিত ফোয়ারা। বাগানে বিভিন্ন স্থানে বসবার জন্য রয়েছে কাঠ ও cast-iron দ্বারা নির্মিত অলংকৃত আসন।[১]

১. *op. cit*, p. 51.

আলোকচিত্র :৩০ রোজ গার্ডেনের সম্মুখ দৃশ্য, টিকাটুলি, ঢাকা।

আলোকচিত্র: ৩১ খিলানের উপরে স্টাকো নকশা, রোজ গার্ডেন, টিকাটুলি, ঢাকা।

আহসান মঞ্জিল

আলোকচিত্র ঃ ৩২,৩৩,৩৪ ভূমি নকশা ঃ ১০

অবস্থান

বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে পুরনো ঢাকার ইসলামপুর এলাকায় আহসান মঞ্জিল অবস্থিত। এটি ১৮৭২ সালে নওয়াব আবদুল গণি নির্মাণ করেছিলেন।[১] এই ভবনটি ব্রিটিশ ভারতের উপাধিপ্রাপ্ত ঢাকার নওয়াব পরিবারের বাস ভবন ও সদর কাছারি ছিল। অনবদ্য অলংকরণ সমৃদ্ধ সুরম্য এ ভবনটি ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নির্দশন। স্থাপত্যটি নওয়াব আব্দুল গনির পুত্র নওয়াব আহসান উল্লাহর নামে নামকরণ করা হয়েছে। নওয়াব আবদুল গনি ছিলেন কাশ্মীর থেকে আগত খাজা আলীমূল্লাহর পুত্র। প্রথমে ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি সুনাম অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে জমিদার হিসেবে সুপরিচিত হন।

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

উনিশ শতকের ঢাকায় নির্মিত ইমারতের মধ্যে আহসান মঞ্জিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রাসাদটি বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত হওয়ায় দক্ষিণ দিকে প্রাকৃতিক দৃশ্যশোভিত প্রাসাদের মনোরম অঙ্গণ বিস্তৃত। সমগ্র আহসান মঞ্জিলটি দু'টি অংশে বিভক্ত। পূর্ব পার্শ্বের গম্বুজযুক্ত অংশকে বলা হয় প্রাসাদ ভবন (রঙমহল) এবং পশ্চিমাংশের আবাসিক প্রকৌষ্ঠাদি নিয়ে গঠিত ভবনকে বলা হয় অন্দরমহল। বাইরের দিকে বর্ধিত বৃহৎ সিঁড়িপথ দ্বিতল পর্যন্ত উঠে গেছে। যেখান থেকে তিন খিলান বিশিষ্ট মূল প্রবেশ পথ দিয়ে প্রাসাদ ভবনে প্রবেশ করা হয়। প্রাসাদ ভবনটি আবার দু'টি সুষম অংশে বিভক্ত। মাঝখানে গোলাকার কক্ষের উপর অষ্টকোণ বিশিষ্ট উঁচু গম্বুজটি অবস্থিত। এর পূর্বাংশে দোতলায় বৈঠকখানা, গ্রন্থাগার, কার্ডরুম ও তিনটি মেহমান কক্ষ এবং পশ্চিমাংশে একটি নাচঘর, হিন্দুস্থানী কক্ষ এবং কয়েকটি আবাসিক কক্ষ রয়েছে। নিচতলায় পূর্বাংশে আছে ডাইনিং হল, পশ্চিমাংশে বিলিয়ার্ড কক্ষ, দরবার হল ও কোষাগার। প্রাসাদ ভবনের উভয় তলায় উত্তর ও দক্ষিণে রয়েছে প্রসারিত বারান্দা। ভবনের বাইরের দিক তেমন কোন বিশেষ অলংকরণ নেই। তবে দেওয়াল গুলো ইউরোপীয় কায়দায় মোল্ডিং (moulding) দ্বারা সারিবদ্ধভাবে উদগত ও প্রবিষ্টভাবে নির্মিত।

অলংকরণ

আপাত দৃষ্টিতে আহসান মঞ্জিল ভবনটি সাদামাটা ভাবে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হলেও এর নির্মাণ বৈশিষ্ট্য ও কিছু স্টাকো ও কাঠের অলংকরণ স্থাপত্যটি বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়েছে।

---

১. Nazimuddin Ahmed, *Buildings of the British Raj in Bangladesh*, Dhaka, TheUniversity Press Ltd, 1986, P-73

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপত্যটির প্রথম তলার কোণ গুলোতে অবস্থিত আয়তাকার স্তম্ভ সমূহে আড়াআড়িভাবে নির্মিত অবতল ও উদগত অংশগুলো অলংকরণ বিহীন প্রথম তলার মূল আকর্ষণ। দ্বিতীয় তলার সিঁড়ির দুই পাশের শেষ প্রান্তে কক্ষগুলোতে কোণে সরু আয়তাকার স্তম্ভগুলোর শীর্ষে আয়ওনীও ও করন্থীয় ধরনের অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। দুই পাশের কক্ষ দুটিতে রয়েছে ভেনিসীয় খড়খড়িযুক্ত দুটি করে মোট চারটি জানালা। জানালা গুলির দুইপাশে স্তম্ভগুলো ক্রমশঃ সরু আকারে নির্মিত হয়েছে। এই দুই অংশের কর্নিশের উপরে রয়েছে ক্ষুদ্র প্যারাপেট এবং দুই কোণে দুটি ক্ষুদ্র মিনার। দুই মিনারের মাঝখানে পেডিমেন্ট সদৃশ ত্রিকোণাকার অলংকরণ। এর ঠিক নিচে প্যারাপেটের গায়ে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির খিলান সারি সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। মূল অলংকরণটি চোখে পড়ে ইমারতের অঙ্গণ থেকে উত্থিত সিঁড়ির শেষ মাথায় তিন খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ দ্বার । এর দুই পাশে রয়েছে দুটি করে সংলগ্ন সরু স্তম্ভ যা দুই ধাপে নির্মিত হয়ে ছাদের উপরের প্যারাপেট ছাড়িয়ে ক্ষুদ্র মিনার আকারে শেষ হয়েছে। মাঝখানের খিলান দরজার দুইপাশে রয়েছে দুটি করে মোট চারটি সরু গোলায়িত সংলগ্ন স্তম্ভ। প্রবেশদ্বারের খিলান গুলি প্রায় ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। খিলান পট গুলো রঙিন কাঁচ দ্বারাবদ্ধ। খিলানের কী ষ্টোন গুলো বৃহদাকারে নির্মাণ করা হয়েছে এবং তার দুই পাশে রয়েছে প্যাচানো লতানো নকশা। মাঝের প্রবেশ দ্বারের ঠিক উপরে দুইটি সংলগ্ন স্তম্ভ স্থাপন করে তার মধ্যবর্তী অংশে এক সারি ক্ষুদ্র খিলান নকশা সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। খিলান সারি ঠিক উপরে স্তম্ভ দুটির মাঝখানের কর্নিশ এর উপরে রয়েছে স্টাকো নির্মিত বিশেষ অলংকরণ। এর পিছনে রয়েছে ভবনটির গম্বুজ। গম্বুজের প্রতি কোণে তিনটি করে গোলায়িত সরু স্তম্ভ যার শীর্ষগুলো করন্থীয় ও আয়ওনীক নকশাযুক্ত। গম্বুজের ড্রামের ব্রাকেট স্টাকো নির্মিত নকশা পাওয়া যায়। এছাড়া অষ্টকোনাকৃতির গম্বুজটির প্রতি কোন ঠিক ড্রামের উপরে স্টাকো নির্মিত প্যাচানো ইংরেজি এস অক্ষরের ন্যায় নকশা রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় তলার খিলান পটে নকশাকৃত কাঠের জাফরী এবং রেলিং নির্মাণে অলংকৃত cast-iron ব্যবহৃত হয়েছে। cast-iron এর আরো অলংকরণ লক্ষ্য করা যায় সিঁড়ির দুই পাশে নির্মিত লাইট পোষ্টের স্তম্ভ নির্মাণে। এই ধরণের স্তম্ভ অষ্টাদশ উনবিংশ শতকে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। cast-iron এর অলংকরণের একটি উদাহরণ ইমারতের পূর্ব পাশে অবস্থিত প্যাঁচানো লোহার সিঁড়ি নির্মাণে।

নির্মাণকাল

অষ্টাদেশ শতকের প্রথমদিকে জালালপুর পরগণার (বর্তমান ফরিদপুর বরিশাল) জমিদার শেখ ইনায়েত উল্লাহ আহসান মঞ্জিল নির্মিত হওয়ার পূর্বে সেই স্থানে এক প্রমোদ ভবন তৈরি করেন। শেখ ইনায়েত উল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শেখ মতিউল্লাহ সেটি ফরাসী বণিকদের নিকট বিক্রি করে দেন। ফরাসীরা এখানে তাদের বাণিজ্য স্থান নির্মাণ করেন। নওদার আবদুল গণির পিতা খাজা আলীমূল্লাহ ১৮৩০ সালে ফরাসীদের নিকট থেকে কুঠিটি ক্রয় পূর্বক সংস্কারের মাধ্যমে নিজ বাস ভবনের উপযোগী করেন। [১]

১. মুনতাসির মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতি নগরী প্রথম খন্ড*, অনন্যা, ঢাকাঃ বাংলাবাজার, এপ্রিল-২০১০ পৃ. ৪০

পরবর্তীতে এর আকৃতির অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে পুরনো সে ভবনের কোন অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। নওয়াব আব্দুল গণি ১৮৬৯ সালে প্রাসাদটি পুনঃনির্মাণ করেন এবং প্রিয় পুত্র খাজা আহসানুল্লাহর নামানুসারে এর নামকরণ করেন আহসান মঞ্জিল। ১৮৮৮ সালের প্রবল ঘুর্নিঝড়ে পুরো আহসান মঞ্জিলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ক্ষতিগ্রস্থ আহসান মঞ্জিল পুনঃনির্মানের সময় বর্তমান উঁচ গম্বুজটি সংযোজন করা হয়। [১] সে আমলে ঢাকায় আহসান মঞ্জিলের মতো এত জাকালো ভবন আর ছিল না। এর প্রাসাদোপম গম্বুজটি শহরে অন্যতম উঁচু চূড়া হওয়ায় তা বহুদুর থেকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।

আলোকচিত্র :৩২ আহসান মঞ্জিল, ইসলামপুর, ঢাকা।

467334

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

১. Ibid Page- 73.

আলোকচিত্র :৩৩ আহসান মঞ্জিল, ইসলামপুর, ঢাকা।

আলোকচিত্র :৩৪ আহসান মঞ্জিল, ইসলামপুর, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

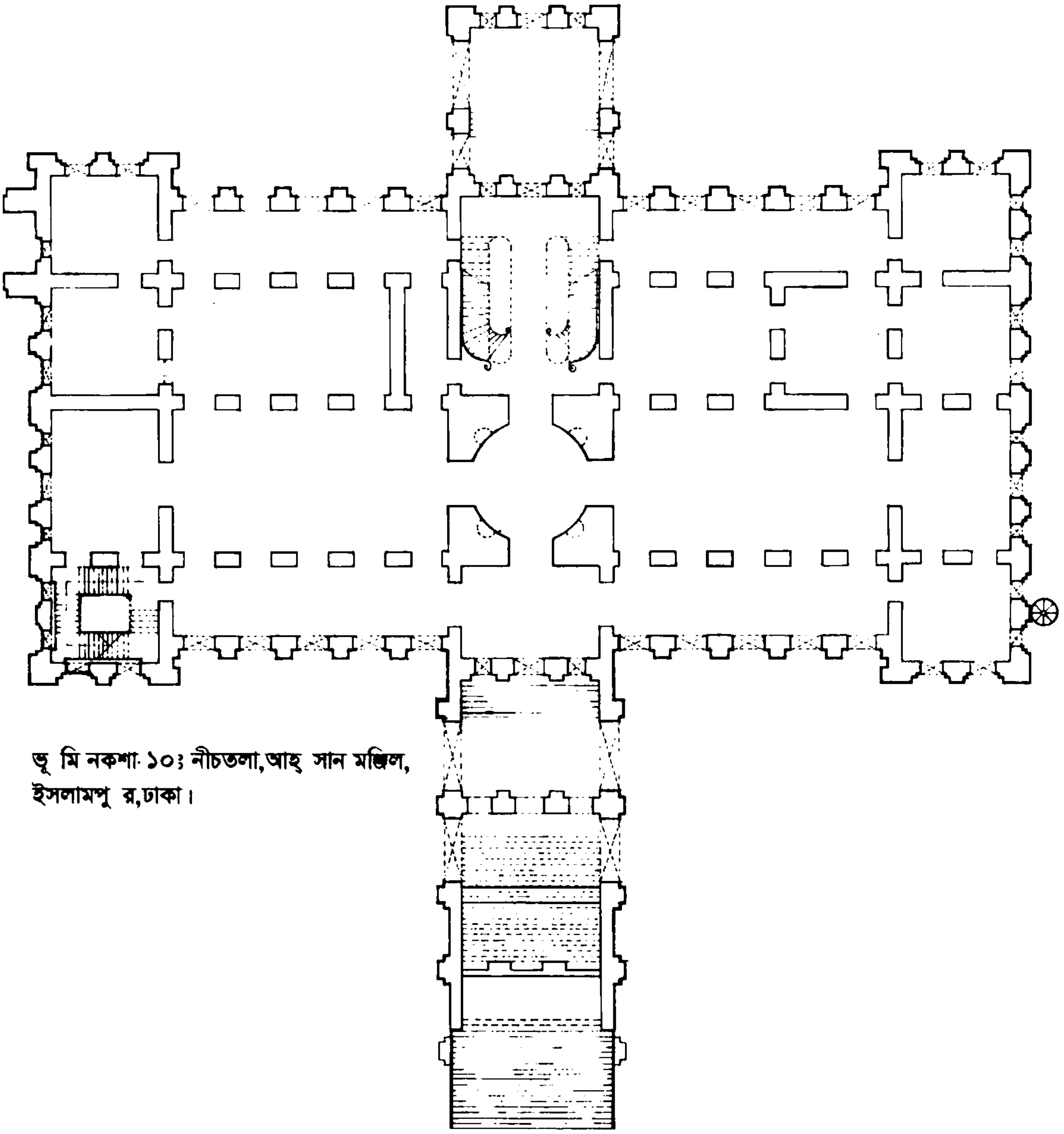

ভূমি নকশা- ১০; নীচতলা, আহ্সান মঞ্জিল, ইসলামপুর, ঢাকা।

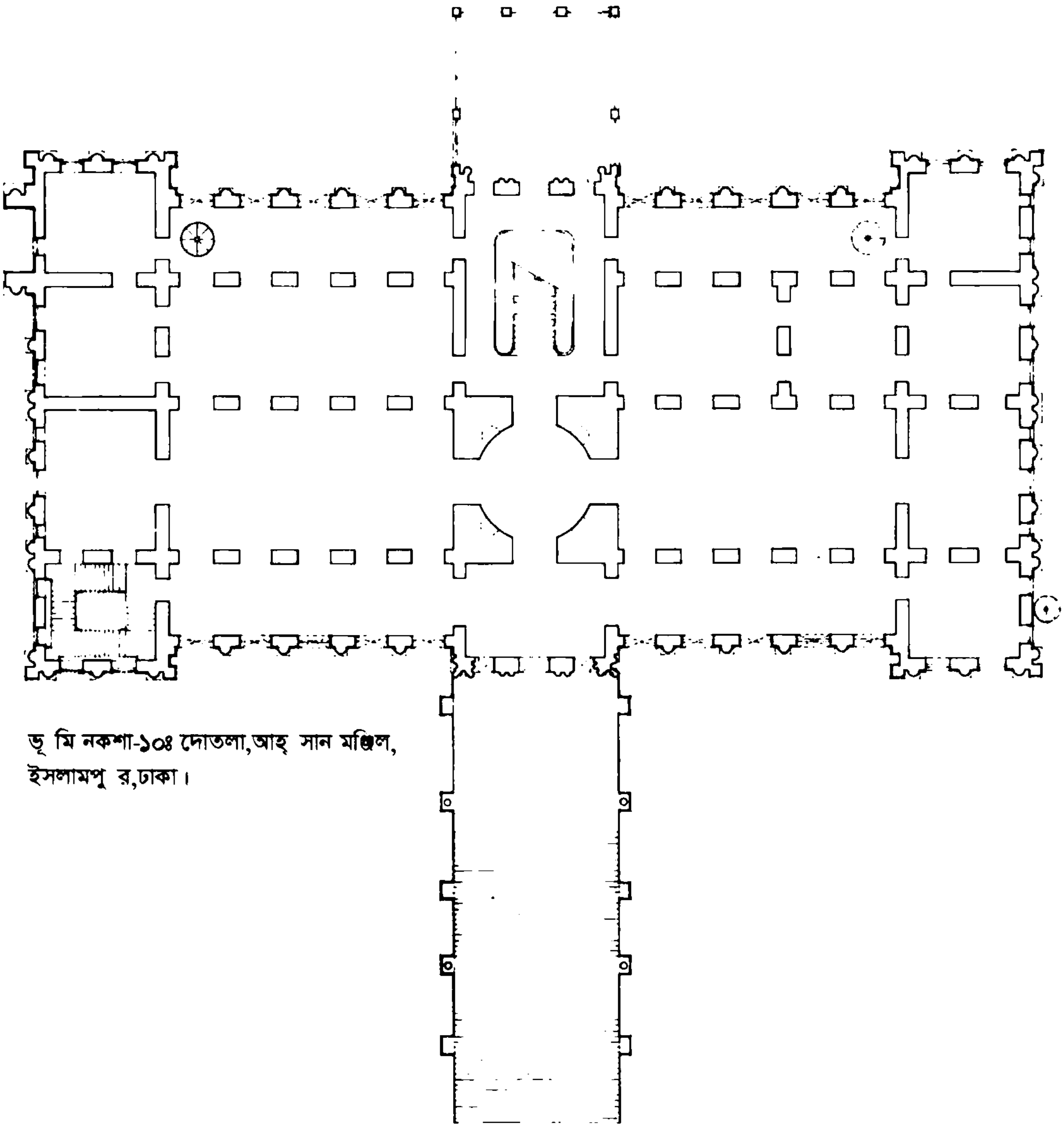

ভূমি নকশা-১০৪ দোতলা,আহ্সান মঞ্জিল,
ইসলামপুর,ঢাকা।

বলধা জমিদার বাড়ি, বাড়িয়া, গাজীপুর সদর

আলোকচিত্র ঃ ৩৫ ভূমিনকশা ঃ ১১

অবস্থান

গাজীপুর ভাওয়াল রাজবাড়ি থেকে প্রায় ৬ কি: মি: পূর্বে বাড়িয়া ইউনিয়নের বলধা গ্রামে বলধার জমিদার বাড়িটি অবস্থিত। সেখানকার জমিদার ছিলেন খগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী। মতান্তরে হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী।[১] বলধার বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়টি জমিদার বাড়ির সম্পত্তির উপর গড়ে ওঠেছে। বলধা জমিদারীর নামানুসারে এলাকাটি বলধা নামে সুপরিচিতি লাভ করে।

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

বলধার জমিদার বাড়ির বিদ্যমান ভবনটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটি দুটি আয়তাকার অংশ সংযুক্ত করে নির্মিত হয়েছে। এর একটি অংশ উত্তর-দক্ষিণে ধাবমান এবং অপর অংশ পূর্ব-পশ্চিমে ধাবমান। পশ্চিমের অংশটির বাইরের পরিমাপ দৈর্ঘ্য ৩৫ ফুট ও প্রস্থে ১৫ ফুট। এরই মতো উত্তর-দক্ষিণের অংশটি সমপরিমাপের। এর দেয়ালের পুরুত্ব ১ ফুট ৬ ইঞ্চি। ভবনটি মেঝে থেকে ছাদ শীর্ষ পর্যন্ত উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট। ইমারতটির পশ্চিম পাশের অংশটিতে তিনটি কক্ষ বিদ্যমান। এর মধ্যভাগেরটি বর্গাকার ও দুপাশের কক্ষটি আয়তাকার । এই অংশে একটি খিলান বারান্দা বিদ্যমান। বারান্দায় তিনটি খিলান রয়েছে এবং খিলানগুলো অর্ধবৃত্তাকারে নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটির অপর অংশে তিনটি কক্ষ বিদ্যমান। এই অংশে একটি বৃহদাকার কক্ষ ও অপর দুটি তুলনামূলক ছোট কক্ষ। ভবনটির ছাদ কড়ি-বর্গা রীতিতে নির্মিত হয়েছে। এর নির্মাণ উপাদান হিসেবে পোড়ানো ইট, দেয়ালগাত্রে চুন-সুড়কি ব্যবহৃত হয়েছে।

অলংকরণ

বলধার জমিদার বাড়ির বিদ্যমান ভবনটি তেমন অলংকৃত নয়। এর দেয়ালগাত্র চুন-সুরকির পলেস্তারা দ্বারা আচ্ছাদিত, তবে বর্তমানে এই পলেস্তারাও খসে পড়ছে। ভবনটির বারান্দার খিলানের স্তম্ভে অনেকগুলো সরু স্তম্ভ সংযুক্ত করে নির্মাণ করার ফলে আলংকারিক বৈচিত্র্যতা এসেছে। এছাড়া এর কার্নিসে প্যাঁচানো ফুল-লতা-পাতার স্টাকো নকশা দৃশ্যমান।

---

১. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬।
ফরিদ আহম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬।

নির্মাণকাল

যতটুকু জানা যায়, বলধা জমিদার বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা হরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী যার পুত্র নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী (জন্ম ১৮৮০খ্রিঃ)। বলধার জমিদারীতে বিভিন্ন ইমারত নির্মিত হয়েছিল যার মধ্যে জমিদার বাড়ি, অন্দরমহল, রংমহল, গুদামঘর, প্রহরীভবন, প্রবেশতোরণসহ মন্দির। কিন্তু কালের আর্বতে তার তেমন কিছু আর অবশিষ্ট নেই। ইমারতটিতে কোন নির্মাণ তারিখ না থাকায় এর স্থাপত্য বৈশিষ্ট অনুযায়ী জমিদার বাড়িটি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

আলোকচিত্রঃ ৩৫ বলধা জমিদারবাড়ির খিলান বারান্দা ও কড়ি বর্গারীতির ছাদ, গাজীপুর ।

Dhaka University Institutional Repository

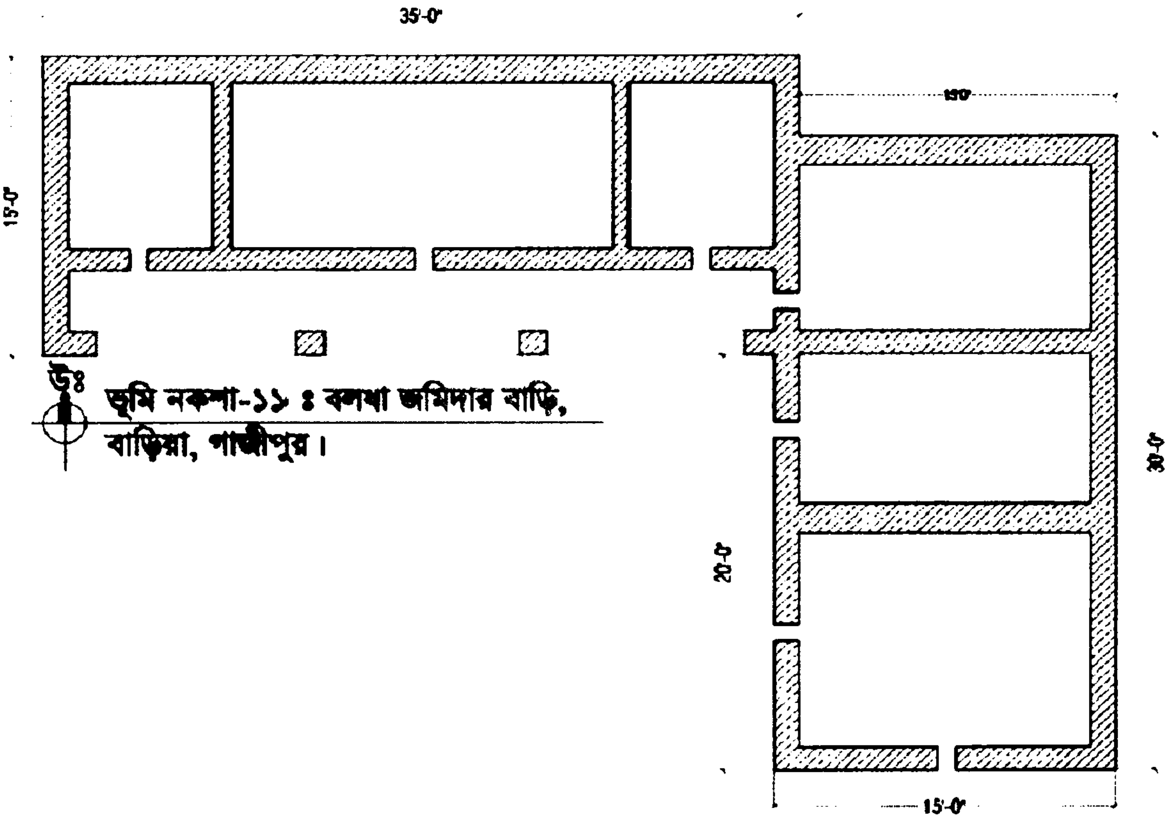

ভূমি নকশা-১৮ ঃ বলধা জমিদার বাড়ি,
বাড়িয়া, গাজীপুর।

পূবাইল চৌধুরী বাড়ি,পূবাইল, গাজীপুর সদর।

আলোকচিত্র ঃ ৩৬,৩৭,৩৮,৩৯ ভূমি নকশা ঃ ১২

অবস্থান

গাজীপুর সদর থানার পূবাইল ইউনিয়নের সাতানিপাড়া গ্রামে চৌধুরী বড়িটি অবস্থিত। এটি টঙ্গী-কালীগঞ্জ মহাসড়কের পূবাইল ডিগ্রী কলেজ অতিক্রম করে পূবাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে ০.৫০ কি:মি: পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। যতটুকু জানা যায় যে, গাজীপুরের ঐতিহ্যবাহী ভাওয়াল জমিদারদের অধীনস্ত পূবাইলের চৌধুরীরা সাত আনির রাজস্ব আদায় করতেন। আর এই সাতআনির ফলেই পরবর্তীতে গ্রামটি সাতআনিপাড়া নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রথমদিকে এখানে ১৭ একর জমি থাকলেও বর্তমানে কেবল ৭ একর সম্পত্তি সরকারী কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথা বিলোপ হলে এখানকার হিন্দু বংশধররা ভারতে চলে যায়। পরবর্তীতে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সমবায় ব্যাংক এবং ১৯৬১ সাল থেকে অদ্যাবধি সমাজসেবার কার্যালয় হিসেবে পূবাইল চৌধুরীবাড়িটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এই চৌধুরী বাড়িটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তৎকালীন চৌধুরী বাড়ির প্রধান মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী। তিনি ১৯১০ সালে ঐতিহ্যবাহী চৌধুরী বাড়িটি নিজ মাতার নামানুসারে 'মা করুনাময়ী নিবাস' নামে প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে একটি কাছারি ভবন, একটি বৈঠকখানা, একটি নাচঘর বা রংমহল, একটি বাসভবন ও দুটি মন্দির অদ্যাবধি বিদ্যমান।

আলোকচিত্র: ৩৬ পূবাইল চৌধুরী বাড়ি কাছারি ভবন,পূর্বদিকের দৃশ্য, গাজীপুর ।

কাছারি ভবন

স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য

পূবাইল চৌধুরী বাড়ির অভ্যন্তরে সম্মুখভাগেই কাছারি ভবনটি বিদ্যমান। ভবনটি ভূমি পরিকল্পনায় আয়তাকার। এর বাইরের পরিমাপ দৈর্ঘ্য ৮৮ ফুট ও প্রস্থে ২৩ ফুট। এর সম্মূখফাসাদ দক্ষিণমূখী। ভবনটি পূর্ব-পশ্চিমে ধাবমান। এটি একতলা বিশিষ্ট ইমারত। জানা যায় এখানে রাজস্ব আদায়ের জন্য চৌধুরীরা নিয়মিত বসতেন। মেঝে থেকে ভবনটির ছাদ শীর্ষ পর্যন্ত উচ্চতা পার্শ্ব বুরুজসহ ২০ ফুট। এর দেয়ালগাত্রের পুরুত্ব ২০ ইঞ্চি। এই ভবনের সম্মুখেই একটি বৃহদাকার গাড়ি বারান্দা রয়েছে। বারান্দাটি প্রায় বর্গাকার যার পরিমাপ দৈর্ঘ্য ২০ ফুট ও প্রস্থে ১৯ ফুট। ভবনটির ছাদ সমতল ও কড়ি-বর্গা পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হয়েছে। এর অভ্যন্তরে চারটি আয়তাকার কক্ষ বিদ্যমান। ভবনটির পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বের কক্ষের ছাদ কিছুটা নিচু করে নির্মিত হয়েছে। এর সম্মুখভাগে পূর্ব ও পশ্চিমকোনায় অষ্টভূজাকৃতির দুটি পার্শ্ব বুরুজ রয়েছে যা ছাদ থেকে কিছুটা উদগত এবং কিউপোলা দ্বারা আচ্ছাদিত রয়েছে। নির্মাণ উপাদান হিসেবে পোড়ানো ইট ব্যবহৃত হয়েছে ও দেয়ালগাত্র চুন-সুরকির পলেস্তারা দ্বারা আচ্ছাদিত রয়েছে।

অলংকরণ

দেয়ালগাত্রে চুন-সুরকির পলেস্তারা দ্বারা আচ্ছাদিত রয়েছে। দেয়ালগাত্রে, কার্নিসে, স্তম্ভগাত্রে খাঁজকাটা নকশা দেখা যায়। খিলানের স্প্যান্ড্রিলে ফুল ও পেচানো লতাপাতার স্টাকো নকশা রয়েছে। স্তম্ভগাত্রে আয়তাকার প্যানেল নকশা ও করিন্থীয় নকশায় স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে।

বৈঠকখানা

আলোকচিত্র ঃ ৩৭

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

কাছারি ভবনের পূর্বপার্শ্বে সংলগ্ন চৌধুরী বাড়ির বৈঠকখানাটি অবস্থান। এটি আয়তাকার ভূমিপরিকল্পনায় নির্মাণ করা হয়েছে। এর বাইরের পরিমাপ দৈর্ঘ্য ৬২ ফুট ও প্রস্থে ২৭ ফুট। এটি একতলা বিশিষ্ট ইমারত ও একটিমাত্র লম্বা হলঘরের মত করে নির্মিত হয়েছে। এর দেয়ালগাত্রের পুরুত্ব ২০ ইঞ্চি। এর সম্মুখ ফ্যাসাদ দক্ষিণমূখী। এর সমতল ছাদ ভেঙ্গে পড়লে পরবর্তীতে টিনের ছাউনী দেয়া হয়। এর দক্ষিণদেয়ালে অনেকগুলো প্রবেশদরজা বিদ্যমান। এর নির্মাণ উপাদান হিসেবে পোড়ানো ইট ও দেয়ালগাত্র চুন সুরকির পলেস্তারা দ্বারা আচ্ছাদিত রয়েছে।

অলংকরণ

সম্মুখভাগের দেয়ালগাত্রে আয়তাকার প্যানেল নকশায় সজ্জিত রয়েছে।

আলোকচিত্র: ৩৭ পুবাইল চৌধুরী বাড়ি বৈঠকখানা, গাজীপুর ।

নাচঘর বা রংমহল
আলোকচিত্র ঃ ৩৮

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা :

কাছারি ভবনের পশ্চাৎভাগে একটি সিঁড়ি দিয়ে এই নাচঘর তথা রংমহলে প্রবেশ করা যায়। এটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মাণ করা হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ ফুট ও প্রস্থে ১৫ ফুট। এটি দ্বিতল বিশিষ্ট ইমারত যাতে একটিমাত্র লম্বা হলঘর বিদ্যমান। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত এর উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট। এর সমতল ছাদ নিমার্ণে কড়ি-বর্গারীতি অনুসৃত হয়েছে। নাচঘরে অনেকগুলো দরজা ও জানালা বিদ্যমান যা প্রচুর আলোবাতাসের সহায়ক। রংমহলটি কাছারি ভবন ও মূলবাসভবনের মধ্যে সংযোজক ইমারত হিসেবে নির্মিত হয়েছে। এর উত্তর ও দক্ষিণে দুটি সিঁড়ি বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

অলংকরণ

দেয়ালগাত্রে পলেস্তারার আচ্ছাদন রয়েছে। কার্নিসে খাজকাটা নকশা ও স্টাকো নকশা বিদ্যমান।

আলোকচিত্র: ৩৮ ধ্বংসপ্রায় পূবাইল চৌধুরী বাড়ি 'নাচঘর বা রংমহল', গাজীপুর ।

অন্দরমহল
আলোকচিত্র ঃ ৩৯

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

পূবাইলের চৌধুরী বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে বৃহদাকার ও উন্মুক্ত অঙ্গণবিশিষ্ট একটি জমকালো বাসভবন যা মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী ১৯১০ সালে তার মাতার নামানুসারে 'মা করুণাময়ী নিবাস' নির্মাণ করেছিলেন। ভবনটির সম্মুখভাগে দ্বিতলের মধ্যভাগে কার্নিসে স্টাকোতে নির্মাণকাল হিসেবে ১৯১০ সাল উৎকীর্ণ রয়েছে। ভবনটি দ্বিতল ও বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মাণ করা হয়েছে। এর বাইরে প্রতিদিকের পরিমাপ ১০০ ফুট। তবে ভবনটি দুটি ভাগে বিভক্ত যথা- সম্মুখভাগে একটি বৃহদাকার আয়তাকার ভবন ও এর পিছনের উত্তরদিকে উন্মুক্ত অঙ্গণকে ঘিরে খিলান বারান্দাসহ পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে কক্ষ বিন্যাস করা হয়েছে। উক্ত ভবনের দক্ষিণ অংশের সম্মুখভাগের বারান্দাটি প্রস্থে ১০ ফুট যা অর্ধবৃত্তাকার খিলান দ্বারা নির্মিত হয়েছে। বারান্দার পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে দুটি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। মধ্যভাগ উন্মুক্ত রয়েছে। এই প্রশস্ত বারান্দার পর তিনটি কক্ষ বিদ্যমান। পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বের কক্ষ দুটি সমানাকৃতির যার পরিমাপ দৈর্ঘ্য ২০ ফুট ও প্রস্থে ১৫ ফুট। মাঝের কক্ষটির পরিমাপ দৈর্ঘ্য ৩৫ ফুট ও প্রস্থে ১৫ ফুট। এই কক্ষগুলোর উত্তর পার্শ্বে আরও একটি বারান্দা বিদ্যমান যাতে কোন কক্ষ নেই। বারান্দাটি প্রস্থে ১০ ফুট। এই একই বিন্যাসে এর দ্বিতল অংশ নির্মিত হয়েছে।

সম্মুখভাগের এই ভবনের সাথে উত্তর পার্শ্বে একটি বৃহদাকার উন্মুক্ত অঙ্গণকে ঘিরে অর্ধবৃত্তাকার খিলান বারান্দাসহ দ্বিতলাকারে নির্মাণ করা হয়েছে। এই অংশের পূর্ব ও পশ্চিমদিকে কক্ষগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। এর উত্তরদিকের কক্ষগুলো বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। এর দক্ষিণদিকে বৃহৎ ভবনটি বিদ্যমান। উন্মুক্ত অঙ্গণের পূর্বদিকে নীচতলায় বিভিন্ন আকৃতির চারটি ও দ্বিতলে তিনটি কক্ষ নির্মিত হয়েছে। এর সম্মুখভাগে ও পশ্চাৎভাগে ৩ ফুট প্রস্থের একটি করে অর্ধবৃত্তাকার খিলান বারান্দা রয়েছে। বারান্দায় দশটি খিলান রয়েছে। নীচতলার প্রথম দুটি কক্ষ বর্গাকার যার অভ্যন্তরের প্রতি দিকের পরিমাপ ১৫ ফুট । এর উত্তরের কক্ষ দুটির পরিমাপ দৈর্ঘ্য ২০ ফুট ও প্রস্থে ১৫ ফুট। একই বিন্যাসে দ্বিতলে তিনটি কক্ষ বিদ্যমান। উন্মুক্ত অঙ্গণের পশ্চিম পার্শ্বে একটি ৩ ফুট প্রস্থের খিলান সম্বলিত বারান্দাসহ দ্বিতলাকারে নির্মিত হয়েছে যার নীচতলা ও দ্বিতলায় তিনটি করে কক্ষ বিদ্যমান। প্রথম ও দ্বিতীয় তলার কক্ষগুলো একই বিন্যাসে নির্মিত হয়েছে। অভ্যন্তরের প্রথম দুটি কক্ষ বর্গাকার যাদের প্রতিদিকের পরিমাপ দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট এবং উত্তর পার্শ্বের কক্ষটির পরিমাপ দৈর্ঘ্য ২০ ফুট ও প্রস্থে ১৫ ফুট। এই অংশের সাথে উত্তর-পশ্চিম কোণায় একটি দ্বিতল আলাদা ইমারত নির্মিত হয়েছে যা উন্মুক্ত প্রশস্ত লম্বা হলঘরের মত। এর শেষপ্রান্তে পুরো প্রাসাদের কেন্দ্রীয় টয়লেট হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ভবনের দক্ষিণ-পূর্বকোনে দ্বিতলে উঠার সিঁড়ি রয়েছে।

অলংকরণ

সম্মুখভাগের ফাসাদটি অসংখ্য অর্ধবৃত্তাকার খিলান দ্বারা নির্মিত হয়েছে যার উপরিভাগে একটি কি স্টোন নকশায় সজ্জিত রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় তলার কার্নিসে পেচানো ও গোলাকার খাজকাটার নকশা সারিবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে। ভবনের ছাদের উপর পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে দুটি অষ্টকোনাকার পার্শ্ব বুরুজ এবং পুরো ভবনের ছাদে ২০টি টারেট রয়েছে যা সৌধটিকে আরও আকর্ষনীয় করে তুলেছ।

আলোকচিত্র:৩৯ পূবাইল চৌধুরী বাড়ি অন্দরমহলের দক্ষিণদিকের দৃশ্য, গাজীপুর।

কাশিমপুর জমিদার বাড়ি, গাজীপুর সদর।

আলোকচিত্র ঃ ৪০,৪১ ভূমি নকশা ঃ ১৩

অবস্থান:

গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর- টাঙ্গাইল মহাসড়কের কোণাবাড়ি থেকে প্রায় ৫ কি: মি: দক্ষিণে কাশিমপুর ইউনিয়নে জমিদারবাড়িটি অবস্থিত। কাশিমপুরের এই জমিদারী মোগল সম্রাট হুমায়ুনের কাছ থেকে ফরমান নিয়ে পত্তন করা হয়েছিল। ভাওয়াল অঞ্চলের সর্বপ্রথম ও বিখ্যাত মুসলিম জমিদারী গাজী বংশের জমিদার কাশিম গাজীর (১৫৯৫-১৬৫০খ্রিঃ) নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় কাশিমপুর পরগণা যা এখন কাশিমপুর জমিদার বাড়ি নামে সুপরিচিত। পরবর্তী ভাওয়াল অঞ্চলে হিন্দু জমিদারীর উত্থানের সমসাময়িক এই কাশিমপুর পরগণায় হিন্দু গুহ বংশীয় বঙ্গের কায়স্থরা আধিপত্য বিস্তার করেন।

আলোকচিত্র :৪০ কাশিমপুর জমিদার প্রাসাদ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর ।

Dhaka University Institutional Repository

কাশিমপুর জমিদার প্রাসাদ

আলোকচিত্র ঃ ৪১

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

কাশিমপুর জমিদার প্রাসাদটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মাণ করা হয়েছে। এর বাইরের পরিমাপ দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৯০ ফুট এবং প্রস্থে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৫৫ ফুট। জমিদার প্রাসাদের সম্মুখভাগে ৩৩ ফুট বর্গাকার একটি উন্মুক্ত অঙ্গণ রয়েছে। উন্মুক্ত অঙ্গণের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে প্রাসাদটি সমপরিমাপে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এই অঙ্গণের উত্তর-পূর্ব-পশ্চিমে তিনদিকেই অর্ধবৃত্তাকার খিলান বারান্দা দ্বারা প্রাসাদটি বেষ্টিত আছে। তিনদিকের খিলানসারিতে উত্তরদিকের প্রাসাদের মূল অংশে সাতটি খিলান ও পূর্বপার্শ্ব এবং পশ্চিমপার্শ্বে ছয়টি করে অর্ধবৃত্তাকার খিলান নির্মাণ করা হয়েছে। খিলানগুলোর উচ্চতা ৯ ফুট। প্রাসাদটির উত্তর-পূর্ব কোণায় দ্বিতলাকার ও অবশিষ্ট অংশটি একতলাকারে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রাসাদটির দ্বিতল অংশটি মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট এবং একতল অংশটির উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট। এর ছাদ কড়ি-বর্গারীতির সমতল। প্রাসাদটিতে নীচতলায় মোট ১১টি ও দ্বিতলে ৪টি কক্ষ রয়েছে। প্রাসাদের উত্তর-পূর্বকোণায় কিছুটা সম্প্রসারিত করা হয়েছে যা দ্বিতলাকারে নির্মাণ করা হয়েছে। এর নীচতলায় একটি কক্ষ ও দ্বিতলে একটি কক্ষ রয়েছে। এই অংশের পূর্বদিকে একটি বারান্দা বিদ্যমান যা দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত উঠে গেছে। বারান্দাটি লোহার স্তম্ভসহযোগে জালি নকশায় নির্মিত হয়েছে। প্রাসাদের দ্বিতলে উঠার জন্য পূর্বপ্রান্ত দিয়ে সম্প্রসারিত অংশের সম্মুখভাগে সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়েছে।

অলংকরণ

জমিদার প্রাসাদটির দেয়ালগাত্র চুন-সুরকির পলেস্তারা দ্বারা আচ্ছাদিত রয়েছে। এর প্রথম তলার দেয়ালগাত্রে তেমন কোনো অলঙ্করণ নেই, তবে দ্বিতীয় তলার কার্নিসে পলেস্তারার সাহায্যে পেঁচানো লতাপাতা ও প্রস্ফুটিত ফুলের নকশা ও জ্যামিতিক নকশা সারিবদ্ধভাবে অলংকিত করা হয়েছে। প্রাসাদটির অলংকরণের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক এর সম্প্রসারিত অংশের বারান্দায় স্থাপিত লোহার স্তম্ভসহযোগে তৈরি খিলানসমূহ। Cast iron এর সাহায্যে এ অংশটুকুতে চমৎকার লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।[১]

১. Cast iron: লোহা গলিয়ে ছাচে ফেলে অলংকরণ যা ১৭শ শতকে জ্যাকবিও অলংকরণ থেকে প্রভাবিত।

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণকাল

বর্তমান কাশিমপুর জমিদার বাড়ির বিদ্যমান ভবনগুলো কখন ও কোন জমিদারের শাসনামলে নির্মিত হয় তা জানা যায় না। এই জমিদার বংশের সর্বশেষ জমিদার ছিলেন অতুল প্রসাদ রায় চৌধুরীর[১] জ্যেষ্ঠ পুত্র অনামী প্রসাদ রায় চৌধুরী (২৬ মার্চ, ১৯২৯ খ্রিঃ ৩ মে ১৯৯২)। স্থাপত্য রীতি অনুযায়ী ভবনগুলো উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে নির্মাণ করা হয়েছিল। আর নির্মাণ উপাদান হিসেবে পোড়ানো ইট, চুন-সুরকি, লোহা, কাঠ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে।

আলোকচিত্র ৪১: কাশিমপুর জমিদার প্রাসাদের পূর্বদিকের দৃশ্য, কালিয়াকৈর, গাজীপুর ।

---

১. ফরিদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

অন্দরমহল
আলোকচিত্র ঃ ৪২

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

কাশিমপুর জমিদার প্রাসাদ এর উত্তরপার্শ্বে আরও একটি ভবন বিদ্যমান রয়েছে যা অন্দরমহল নামে পরিচিত। এই ভবনটিও আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মাণ করা হয়েছে। এর বাইরের পরিমাপ দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ ফুট ও প্রস্থে প্রায় ৩০ ফুট। ভবনটির উত্তর-পূবদিকে কিছুটা সম্প্রসারিত আছে। ভবনের বর্ধিত অংশে অর্ধবৃত্তাকার খিলান বারান্দা রয়েছে। অন্দরমহলটির পশ্চিমপার্শে দ্বিতলাকারে নির্মাণ করা হয়েছে। এই ভবনের উত্তরদিকের বর্ধিত অংশে একটি বারান্দা রয়েছে যা লোহার স্তম্ভসহযোগে জ্যামিতিক নকশায় নির্মাণ করা হয়েছে। অন্দরমহলটির নীচ তলায় সমানাকৃতির ১০টি কক্ষ ও দ্বিতলে ৪টি কক্ষ বিদ্যমান রয়েছে। ভবনের প্রবেশ দরজাগুলো অর্ধবৃত্তাকার খিলান দ্বারা নির্মান করা হয়েছে। আর নির্মাণ উপাদান হিসেবে পোড়ানো ইট, চুন-সুরকির,লোহা, কাঠ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে।

অলংকরণ

ভবনটির দেয়ালগাত্র চুন-সুরকির পলেস্তারা দ্বারা আচ্ছাদিত রয়েছে। ভবনের প্রবেশপথের অর্ধবৃত্তাকার খিলানগর্ভে তথা স্পেন্ড্রিলে ফুল লতাপাতার স্টাকো নকশা রয়েছে[১], খিলানের উপরাংশে পেচানোলতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা স্টাকোতে নির্মিত হয়েছে। স্তম্ভগুলোতে ত্রিভূজাকার খাজকাটা নকশা দেখা যায়।

১. ভাওয়াল শম্মান মন্দিরে একই অলংকরণের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র ৪২: কাশিমপুর জমিদারদের অন্দরমহলের স্টাকো অলংকরণ,কালিয়াকৈর, গাজীপুর ।

রংমহল
আলোকচিত্র ঃ ৪৩

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

কাশিমপুর জমিদার ও অন্দরমহলের উত্তরপার্শ্বের পিছনের একটি রংমহল[১] বিদ্যমান আছে। রংমহলটির বাইরের পরিমাপ দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ ফুট ও প্রস্থে প্রায় ১৫ ফুট। মেঝে থেকে ছাদ শীর্ষ পর্যন্ত উচ্চতা প্রায় ১৮ ফুট। আর নির্মাণ উপাদান হিসেবে পোড়ানো ইট, চুন-সুরকি, লোহা, কাঠ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বে কড়ি-বর্গা রীতির সমতল ছাদ থাকলেও বর্তমানে তা নেই। ভবনটির ফাসাদ দক্ষিণমুখী। ফ্যাসাদে ছয়টি বৃহদাকার গোলাকৃতির স্তম্ভ বিদ্যমান। এতে বর্তমানে দুটি কক্ষ থাকলেও পূর্বে তাতে একটিমাত্র কক্ষ ছিল যাতে জমিদার বাড়ির যাবতীয় অনুষ্ঠান উৎযাপিত হত।

অলংকরণ

ভবনটিতে তেমন অলংকরণ লক্ষ্য করা যায় না। কেননা পূর্বের চুন সুরকির পলেস্তারার পরিবর্তে আধুনিক কালের পলেস্তারা ও লাল রং দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়েছে।

১. সাধারণত : জমিদারদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নির্মিত নাচঘর গুলোকে 'রংমহল' বলে অভিহিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র ৪৩: কাশিমপুর জমিদার বাড়ির রংমহল, কালিয়াকৈর, গাজীপুর ।

প্রবেশতোরণ:
আলোকচিত্র ঃ ৪৪

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

কাশিমপুর জমিদার বাড়ির দক্ষিণপার্শ্বে প্রবেশতোরনটি অবস্থিত। এটি জমিদার বাড়ির প্রহরীদের বাসগৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হত। এটি নিজেই একটি ইমারত হিসেবে দণ্ডায়মান। এর বাইরের পরিমাপ দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ ফুট ও প্রস্থে ১২ ফুট। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উচ্চতা ১৫ ফুট। বর্তমানে পূর্বের কড়ি-বর্গারীতির ছাদ নেই। তবে এর দেয়ালগাত্র চুন-সুরকির পলেস্তারা দ্বারা আচ্ছাদিত রয়েছে। এই প্রবেশতোরণদ্বারের মধ্যভাগ একটি উন্মুক্ত গলিপথ রয়েছে এবং এর দুপাশে দুটি প্রহরীদের বিশ্রামের জন্য কক্ষ রয়েছে। কক্ষগুলোর পরিমাপ দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট ও প্রস্থে ১২ ফুট। আর নির্মাণ উপাদান হিসেবে পোড়ানো ইট, চুন-সুরকি,লোহা, কাঠ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে।

অলংকরণ:

প্রবেশতোরণটির দেয়ালগাত্রে চুন-সুরকির পলেস্তারা দ্বারা আচ্ছাদিত রয়েছে। প্রবেশতোরণটির সামনে ও পিছনের দেয়ালগাত্রে খাজকাটা নকশা,আয়তাকার প্যানেল নকশা ও স্থানে স্থানে পেচানো লতাপাতা ও প্রস্ফুটিত ফুলের নকশার মাধ্যমে অলংকৃত রয়েছে।

আলোকচিত্র ৪৪: কাশিমপুর জমিদার বাড়ির প্রবেশতোরণ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর ।

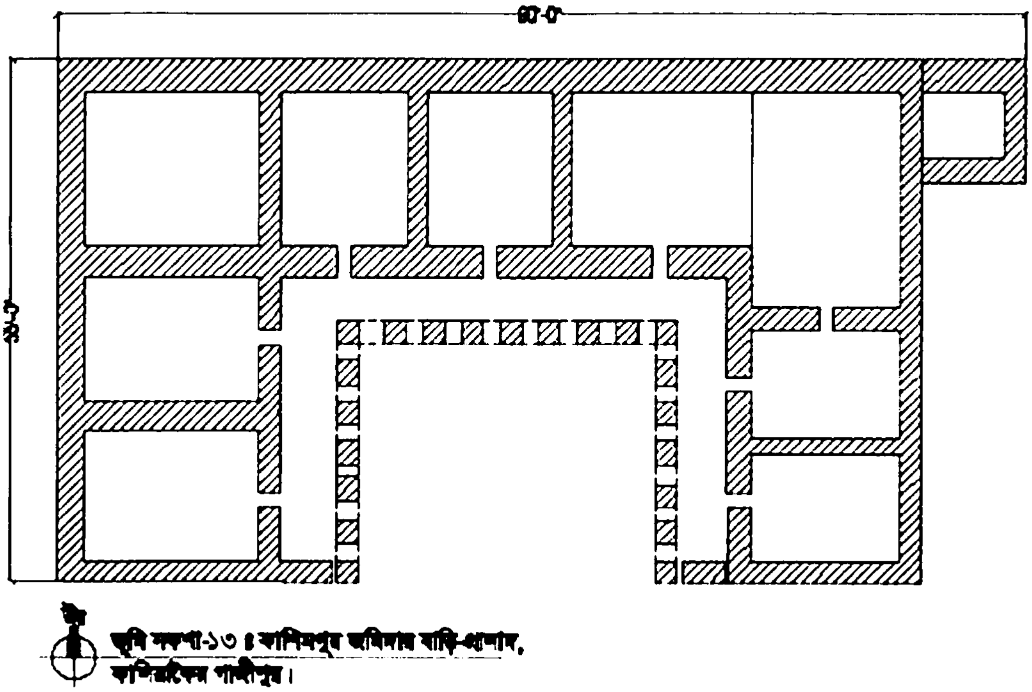

ভূমি নকশা-১৩ ঃ কাশিমপুর জমিদার বাড়ি-প্রাসাদ,
কাশিমপুর গাজীপুর।

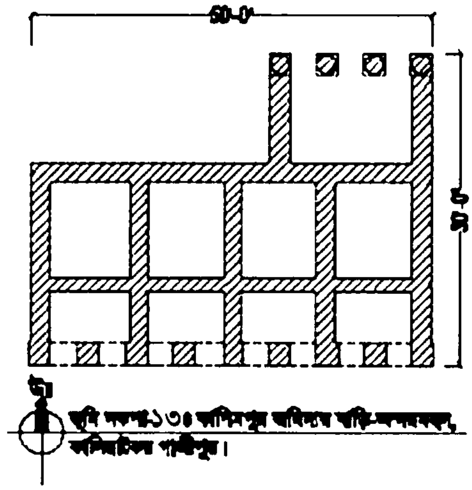

ভূমি নকশা-১৩ঃ কাশিমপুর জমিদার বাড়ি-অন্দরমহল,
কাশিমপুর গাজীপুর।

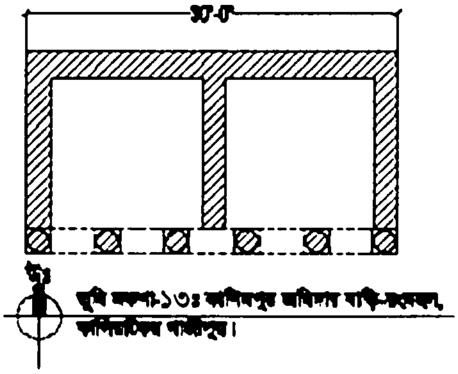

ভূমি নকশা-১৩ঃ কাশিমপুর জমিদার বাড়ি-কাচারি,
কাশিমপুর গাজীপুর।

বলিয়াদি জমিদার বাড়ি, শ্রীফলতলী, কালিয়াকৈর।
আলোকচিত্র ঃ ৪৫,৪৬ ভূমি নকশা ঃ ১৪

অবস্থান

কালিয়াকৈর থানার শ্রীফলতলী ইউনিয়নের বলিয়াদি গ্রামে বলিয়াদি জমিদার বাড়িটি অবস্থিত। এটি কালিয়াকৈর থানা থেকে ৪ কি: মি: দক্ষিণ-পশ্চিমে কালিয়াকৈর ডিগ্রী কলেজ এর দক্ষিণে অবস্থিত। তাছাড়া কালিয়াকৈর শ্রীফলতলী জমিদার বাড়ি হতে দক্ষিণের দিকে এর অবস্থান। বর্তমানে প্রায় ২১ একর সম্পত্তির বলিয়াদি এস্টেটটি ওয়াকফ এস্টেট হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের ফরমান বলে ইংরেজী ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র কালিয়াকৈর থানা, ধামরাই থানা, সাভার থানা এবং বাসাইল থানা নিয়ে বলিয়াদি এষ্টেট প্রতিষ্ঠিত হয়। দিল্লীর মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক নিযুক্ত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদার নবাব কুতুবউদ্দিন সিদ্দিকীর পুত্র নবাব সাদ উদ্দিন সিদ্দিকী বলিয়াদি এষ্টেটের প্রথম কর্ণধার ছিলেন। সা'দ উদ্দিন সিদ্দিকী যিনি জাহাঙ্গীরের সনদ বলে চন্দ্রপ্রতাপ,আমিনাবাদ, তালেবাবাদ এই তিনটি পরগণার জায়গীরদারী লাভ করেন। পরিবারের তিনিই প্রথম বাংলাদেশে বৃহত্তর ঢাকার এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন।

বলিয়াদি জমিদার প্রাসাদ।
আলোকচিত্র ঃ ৪৫
স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন বলিয়াদি জমিদার প্রাসাদটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মাণ করা হয়েছে। বাইরে এর প্রতি দিকের পরিমাপ প্রায় ৭০ ফুট। মেঝে থেকে গম্বুজের ছাদ শীর্ষ পর্যন্ত উচ্চতা প্রায় ৬৫ ফুট। এর দেয়ালের পুরুত্ব ২ ফুট ৪ ইঞ্চি। জমিদার প্রাসাদটির ফাসাদ দক্ষিণমুখী। এটি তিনতলা বিশিষ্ট ইমারত। এর নির্মাণ উপাদান হিসেবে পোড়ানো ইট, চুন-সুরকি, লোহা ও কাঠ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ছাদ সমতল ও কড়ি-বর্গা রীতিতে নির্মিত হয়েছে। প্রাসাদটির উত্তর-দক্ষিন ও পশ্চিম পার্শ্বে বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছে। এর নীচতলায় বিভিন্ন আকৃতির ৭টি কক্ষ ও দ্বিতীয় তলায় ৭টি কক্ষ ও তিনতলায় একটি বৃহদাকার আয়তাকার কক্ষ বিদ্যমান। তিনতলার কক্ষের ছাদের উপর একটি পেচানো সিঁড়ি বেয়ে চারতলার ছাদের উপর আটটি স্তম্ভের উপর এর বিশালাকৃতির আকর্ষণীয় গম্বুজটি বিদ্যমান। প্রাসাদের দক্ষিণে একটি গাড়ি বারান্দা রয়েছে যার পরিমাপ দৈর্ঘ্য ২৫ ফুট ও প্রস্থে ১৬ ফুট। এই গাড়ি বারান্দা সংলগ্ন উত্তরে ১১ ফুট প্রস্থের পূর্ব-পশ্চিমে ধাবমান আরও একটি বারান্দা রয়েছে। বৃহদাকার এই বারান্দার উত্তরদিকে একটি বিশাল আয়তাকৃতির হলঘর রয়েছে যার পরিমাপ দৈর্ঘ্য ৪৩ ফুট ও প্রস্থে ১৫ ফুট। এই হলঘরের পশ্চিম পার্শ্বে একটি কক্ষ রয়েছে যা দৈর্ঘ্য ১১ ফুট ও প্রস্থে ১৬ ফুট। হলঘরের পূর্ব পার্শ্বে সিঁড়ি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। হলঘরের উত্তরে পর্যায়ক্রমে

Dhaka University Institutional Repository

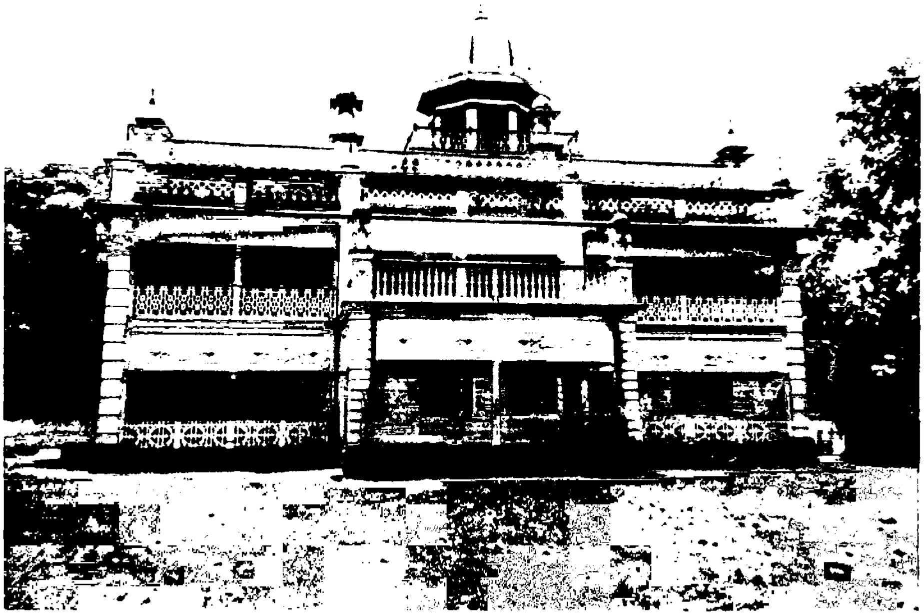

আলোকচিত্র :৪৫ বলিয়াদি জমিদার প্রাসাদ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর ।

কাছারি ভবন (ক)
আলোকচিত্র ঃ ৪৬

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

বলিয়াদি জমিদার বাড়ির নবনির্মিত মসজিদের পূর্বদিকে কাছারি ভবনটি অবস্থিত। এটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যভাগে একটি ১৫ ফুট প্রস্থের একটি প্রবেশতোরণ রয়েছে। এর দুপাশে আয়তাকার বিন্যাসে মোট চারটি কক্ষ রয়েছে। প্রবেশতোরণদ্বারটি কাঠের বিশালাকার দরজা দ্বারা নির্মিত হয়েছে। এই তোরণদ্বারে উপরে স্টাকোতে উৎকীর্ণ রয়েছে "সদর দপতর, বলিয়াদি এষ্টেট, স্থাপিত ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দ"। এই তোরণদ্বারটির উপরাংশে গির্জার পেডিমেন্ট এর মত ত্রিকোনাকার করে নির্মিত হয়েছে। দুপাশে দুটি স্তম্ভের সাহায্য পেডিমেন্টটি দণ্ডায়মান রয়েছে। এই তোরণদ্বারের দক্ষিণপাশে একটি আয়তাকার কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে যার পরিমাপ দৈর্ঘ্য ২০ ফুট ও প্রস্থে ১৫ ফুট। তোরণদ্বারটির দুপাশে কিছুটা উন্মুক্ত রয়েছে। এর পরিমাপ দৈর্ঘ্য ২২ ফুট ও প্রস্থে ১৫ ফুট। তোরনদ্বারের উত্তরে আয়তাকার তিনটি কক্ষ রয়েছে। এদের পরিমাপ যথাক্রমে প্রথমটি দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট প্রস্থে ৮ফুট, দ্বিতীয়টি দৈর্ঘ্য ২৬ ফুট প্রস্থে ১৫ ফুট ও তৃতীয়টি দৈর্ঘ্য ১২ফুট প্রস্থে ১৫ ফুট। এটি পূর্বে কাছারি ভবনরূপে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে তা বলিয়াদি সরকারি পোস্ট অফিসরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে।

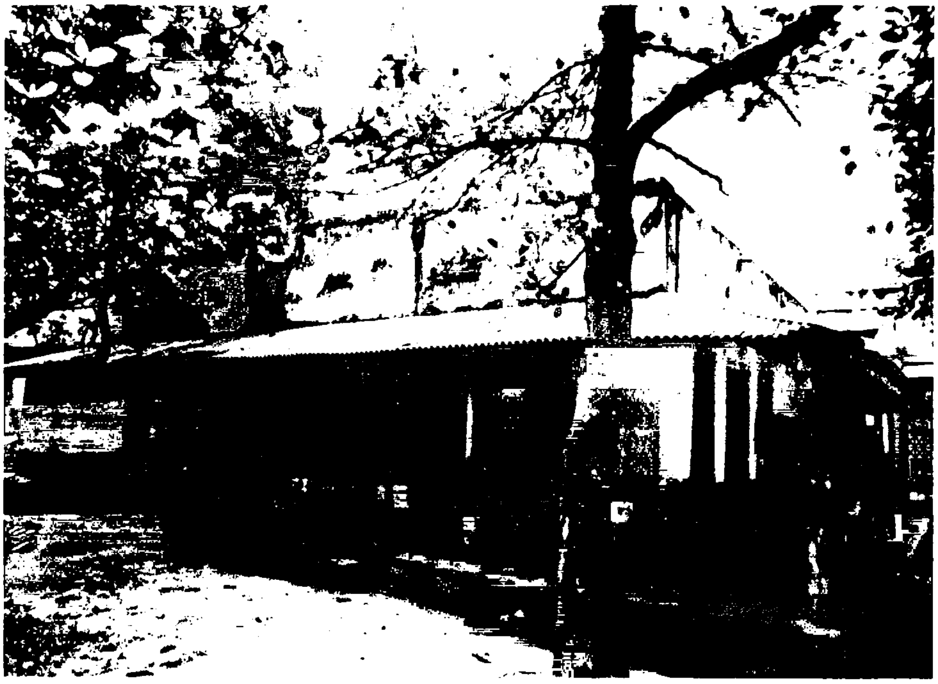

আলোকচিত্র ৪৬: বলিয়াদি জমিদার বাড়ির কাছারি ভবন (ক) , গাজীপুর ।

কাছারি ভবন (খ)
আলোকচিত্র ঃ৪৭

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

কাছারি ভবন এর বিপরীত পার্শ্বে তথা পূর্ব পার্শ্বে আরেকটি কাছারি ভবনটি অবস্থিত। এটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মাণ করা হয়েছে। এর বাইরের পরিমাপ দৈর্ঘ্য ৪৮ ফুট ও প্রস্থে ১৫ ফুট। এর নির্মাণ উপাদান হিসেবে পোড়ানো ইট ও চুন-সুরকি ব্যবহৃত হয়েছে। এর দেয়ালের পুরুত্ব ১ ফুট ১০ ইঞ্চি। এর অভ্যন্তরে সমানাকৃতির তিনটি কক্ষে বিন্যাাসিত রয়েছে। প্রতিটি কক্ষের পরিমাপ দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট প্রস্থে ১৫ ফুট করে। ছাদ হিসেবে টিনের চালা ব্যবহার করা হয়েছে। তেমন অলংকরণ দেখা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র :৪৭ বলিয়াদি জমিদার বাড়ির কাছারি ভবন (খ) , গাজীপুর ।

কাছারি ভবন (গ)
আলোকচিত্র ঃ ৪৮

প্রথম ও দ্বিতীয় কাছারি ভবন এর দক্ষিণপার্শ্বে আরও একটি কাছারি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মাণ করা হয়েছে। এর বাইরের পরিমাপ দৈর্ঘ্য ৫৭ ফুট ও প্রস্থে ৩৫ ফুট। এর দেয়ালের পুরুত্ব ১ ফুট ১০ ইঞ্চি। এর অভ্যন্তরে চারটি সমানাকৃতির বর্গাকার কক্ষ রয়েছে ও একটি বৃহদাকার আয়তাকার কক্ষ বিদ্যমান রয়েছে। এর ছাদ হিসেবে টিনের চালা ব্যবহার করা হয়েছে। এর দেয়ালগাত্র পলেস্তারা দ্বারা আচ্ছাদিত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র :৪৮ বলিয়াদি জমিদার বাড়ির কাছারি ভবন (গ) , গাজীপুর ।

আলোকচিত্র :৪৯ বলিয়াদি জমিদারবাড়ির গম্বুজ, গাজীপুর ।

Dhaka University Institutional Repository

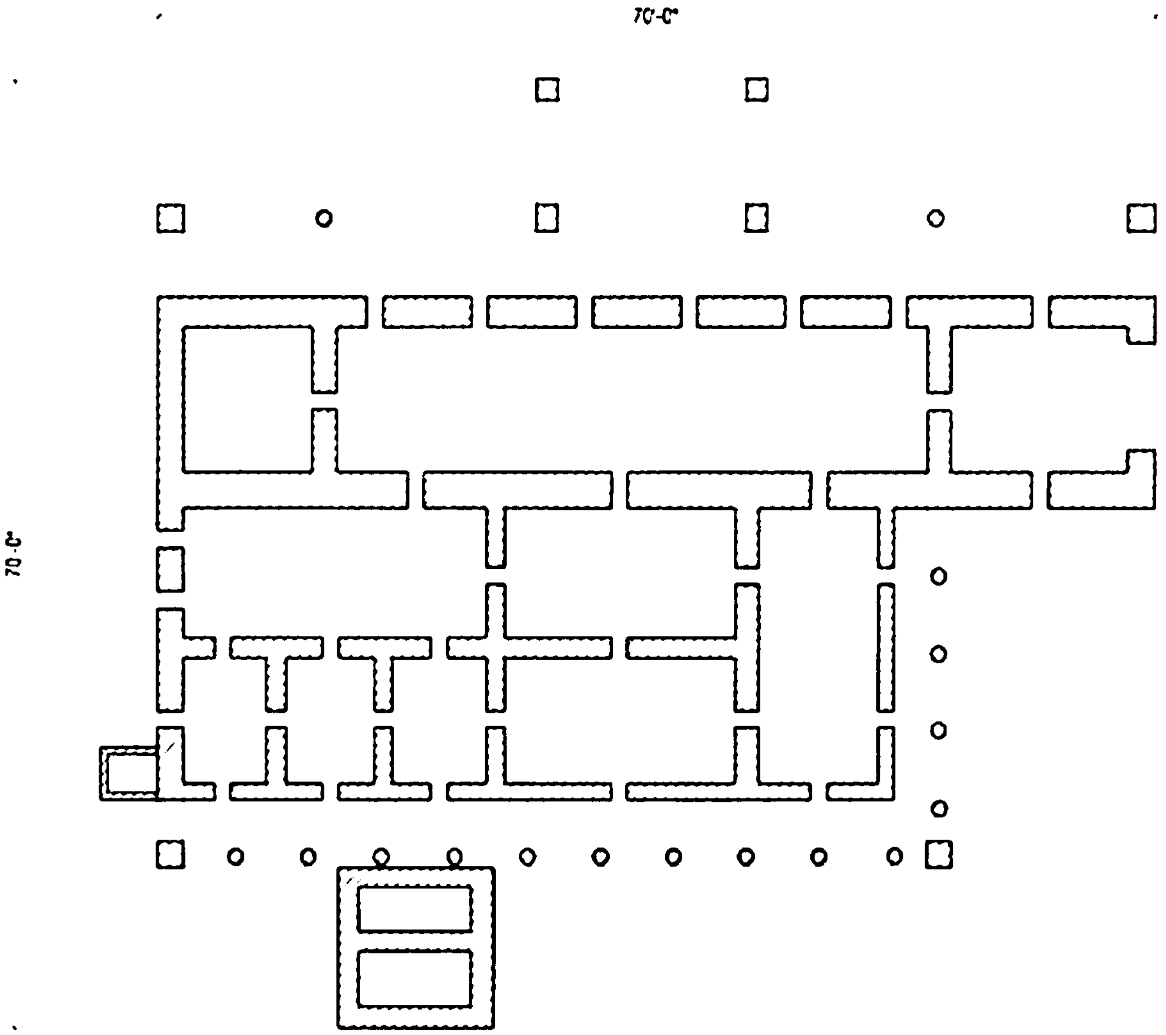

ভূমি নকশা-১৪ ঃ বলিয়াদি জমিদার বাড়ি,
উঃ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীফলতলী জমিদার বাড়ি, শ্রীফলতলী, কালিয়াকৈর

আলোকচিত্র ঃ ৫০,৫১ ভূমি নকশা ঃ ১৫

অবস্থান

শ্রীফলতলী জমিদারবাড়িটি কালিয়াকৈর থানার শ্রীফলতলী ইউনিয়নের শ্রীফলতলী গ্রামে অবস্থিত। কালিয়াকৈর-টাঙ্গাইল মহাসড়কের চান্দুরা বাস স্ট্যান্ড থেকে প্রায় ২ কি: মি: দক্ষিণে এর অবস্থান। জানা যায় যে, তালিবাবাদ পরগনার শ্রীফলতলী জমিদারী ১০০ একর ও ৩২০টি মৌজা নিয়ে গঠিত ছিল।

জমিদার প্রাসাদ (ক)

আলোকচিত্র ঃ৫০

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানার শ্রীফলতলী জমিদারদের স্থাপত্যিক ঐতিহ্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নির্দশন হল শ্রীফলতলী জমিদার প্রাসাদ। এটি কালিয়াকৈর থানা হতে ২ কি: মি: পশ্চিমে, পার্শ্ববতী তুরাগ নদীর দক্ষিণে, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ১০০ মিটার পশ্চিমে শ্রীফলতলী গ্রামে ও জমিদার বাড়ি জামে মসজিদ এর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। দৃষ্টিনন্দন এই প্রাসাদটি ১১৯২ তৌজিভুক্ত খারিজা তালুক ইমামবক্স মোদাফতিও মালিকানা খতিয়ান ভুক্ত। ইমারতটিতে কোন শিলালিপি নেই। তবে এর নির্মাণ কাল সর্ম্পকে জমিদার বংশীয় (বর্তমানে এর অধিবাসী) সৈয়দ আফজাল হোসেন বলেন, এটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জমিদার বাড়ি মসজিদের সমসাময়িক। ইমারতটির নির্মাণ উপাদান হিসাবে পোড়ানো ইট, চুন-সুরকি ব্যবহার করা হয়েছে । বর্তমানে এর দেয়ালগাত্র পলেস্তারা দ্বারা আবৃত। এর ছাদ কড়ি-বর্গা রীতিতে নির্মাণ করা হয়েছে।

আকর্ষণীয় এই প্রাসাদটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। এটি পূব-পশ্চিমে বিস্তৃত যার বাইরের পরিমাপ দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০ ফুট, প্রস্থে ৩০ ফুট। প্রাসাদটির মধ্যভাগ কিছু নিচু ও অপর দুই পার্শ্ব বেশ উদগত। প্রাসাদটির মধ্যভাগ ২৫ ফুট ও দুপাশের ছাদ কিছুটা বর্হিগত যা ভূমি থেকে প্রায় ৪০ ফুটের মত উঁচু। ইমারতটির ফাসাদ দক্ষিণমুখী। প্রাসাদটির পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণে তিনটি বারান্দা, ছোট বড় বিভিন্ন আয়তনের ৭টি কক্ষ ও ২টি গোসলখানা নিয়ে গঠিত। উত্তরদিকের মধ্যভাগে বারান্দা রয়েছে যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৩০ফুট ও ১২ ফুট । বারান্দাটি পাচঁটি অর্ধবৃত্তাকার খিলানের সমন্বয়ে গঠিত। খিলানগুলোর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৮ ফুট ও ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি। প্রাসাদটির সম্মুখের বারান্দার দুপাশে দুটি করে বর্গাকার কক্ষ, মধ্যভাগে দুটি আয়তাকার কক্ষ, এদের পূর্বে ও পশ্চিমে আরও একটি করে কক্ষ বিদ্যমান। জমিদারবাড়িটি একটি

মসজিদ, ২টি জমিদার প্রাসাদ, ৩টি কাছারি ভবন, ১টি অন্দরমহল, ২টি প্রহরী কক্ষ, ২টি প্রবেশতোরণ নিয়ে গঠিত। আলোচনার সুবিধার্থে শ্রীফলতলী জমিদারবাড়িটির প্রতিটি ভবনকে ক,খ,গ ইত্যাদি শিরোনামে আলোচনা করা হলো।

অলংকরণ

শ্রীফলতলী প্রাসাদটিও সমকালীন অন্যান্য জমিদারবাড়ির মতো ইউরোপিয় স্টাইলের অলঙ্করণে সমৃদ্ধ। ইঁট দিয়ে নির্মিত প্রাসাদটির অলঙ্করণের মাধ্যম চুন-সুরকির পলেস্তারা দিয়ে তৈরি। প্রাসাদের দেয়াল ছাড়াও দরজা-জানালার উপরাংশে, চার কোণের সংযুক্ত স্তম্ভ ও কার্নিশে অলঙ্করণ সবচেয়ে উজ্জ্বলভাবে দৃশ্যমাণ। অলঙ্করণের মোটিফ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে প্যানেল নকশা, খাঁজ কাটা নকশা, ফুল লতা পাতার ও জ্যামিতিক নকশা। বারান্দার খিলানের উপরাংশে ফুলদানী থেকে উত্থিত ফুলের স্টাকো নকশা দেখা যায়। জমিদার বাড়ির পেরাপেটের উপরে মুকুটাকারে নির্মিত স্টাকো নকশাটি ভবনটিকে একটি রাজকীয় রূপদান করেছে। এই ধরনের অলংকরণ ১৯০১ সালে নির্মিত সোনারগাঁয়ে সর্দার বাড়িতে লক্ষ করা যায়।[১]

নির্মাণকাল

জমিদারবাড়িটিতে এর নির্মাণ তারিখের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। জমিদার বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলী নেওয়াজ খান ও তার পত্নী রমজান বিবি চৌধুরানী। ধারণা করা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই জমিদার বাড়ির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। তালিবাবাদ পরগনার জমিদারী ১৯৫২ সালের জামিদারী প্রথা উচ্ছেদের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তদুপরি তাদের বংশধরেরা আজও শ্রীফলতলীতে বসবাস করে আসছেন। জমিদারবাড়িটি একটি মসজিদ, ২টি জমিদার প্রাসাদ, ৩টি কাছারি ভবন, ১টি অন্দরমহল-, ২টি প্রহরী কক্ষ-, ২টি প্রবেশতোরণ সমন্বয়ে নির্মিত ।

১. Nazimuddin Ahmed, *Building of the British Raj in Bangladesh*, Dhaka, Univesity Press Limited, 1986, P-61

আলোকচিত্র ৫০: শ্রীফলতলী জমিদার প্রাসাদ (ক) এর ফ্যাসাদ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর ।

জমিদার প্রাসাদ (খ)
আলোকচিত্র ঃ ৫১

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

শ্রীফলতলীর জমিদারদের প্রাসাদ হতে ৫০ মিটার পূর্বে, জমিদার বাড়ি মসজিদ হতে ৩০ মিটার পূর্ব-উত্তরে জমিদার প্রাসাদটি অবস্থিত। এর নির্মাণেও পোড়ানো ইট, চুন-সুরকি ও কড়ি-বর্গা পদ্ধতির সমতল ছাদ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি অনিয়মিত আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত যার ফাসাদ দক্ষিণমুখী। ইমারতটি প্রাসাদের চেয়ে কিছুটা ব্যতিক্রমী। এর মধ্যভাগের সিঁড়ি ব্যতীত অপর দুপাশে কিছুটা বর্হিগত যা অষ্টভুজাকার। প্রাসাদটি দ্বিতল। যার বাইরের পরিমাপ দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৫ ফুট ও প্রস্থে ৬০ ফুট এবং ভূমি খেকে কার্নিস পর্যন্ত মধ্যভাগের উচ্চতা ২০ ফুট ও দুপাশের উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট। প্রাসাদটিতে প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় পাঁচটি করে মোট ১০টি ছোট বড় বিভিন্ন আয়তনের কক্ষ বিদ্যমান । এর দক্ষিণের বারান্দা যার প্রবেশপথে পাঁচটি খিলান রয়েছে যার তিনটি বহুখাজ ও বাকী দুটি ত্রিখাজ বিশিষ্ট। ইমারতটিতে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের চলাচলের জন্য অসংখ্য কাঠের দরজা ও জানালা দেয়া হয়েছে। দরজা ও জানালা গুলো বহুখাজ, ত্রিখাজ ও অর্ধবৃত্তাকার খিলানের সমন্বয়ে তৈরি। এর পুরো দেয়াল গাত্র চুন-সুরকির মসৃন পলেস্তারা দ্বারা আবৃত। এই ইমারতটির সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ছাদের উপরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছত্রীগুলোর সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারে।

অলংকরণ

শ্রীফলতলী জমিদারবাড়ির দ্বিতীয় ভবনটির দেয়ালে খুব বেশি অলঙ্করণ নেই। তবে প্রাসাদটির ব্যতিক্রমী নির্মাণ ও গঠনশৈলী এর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছে। ভবনটি নির্মাণে ত্রিপত্র ও বহুখাঁজবিশিষ্ট খিলানের পর্যায়ক্রমিক ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া এর দেয়াল গাত্রে অসংখ্য দরজা এবং জানালা স্থাপন করে আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থার পাশাপাশি আলঙ্কারিক আবহও তৈরি করা হয়েছে। দরজা ও জানালায় ব্যবহৃত হয়েছে ইউরোপিয় ঐতিহ্যের ভেনিসিয়ান ব্লাইন্ড। প্রথম ও দ্বিতীয় তলার ছাদের উন্মুক্ত অংশকে ঘিরে রয়েছে নকশাকৃত রেলিং, আর এই রেলিংয়ের স্থানে স্থানে স্থাপিত ক্ষুদ্রাকৃতির নিরেট গম্বুজ (কিউপোলা) প্রাসাদটির অলংকরণকে আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

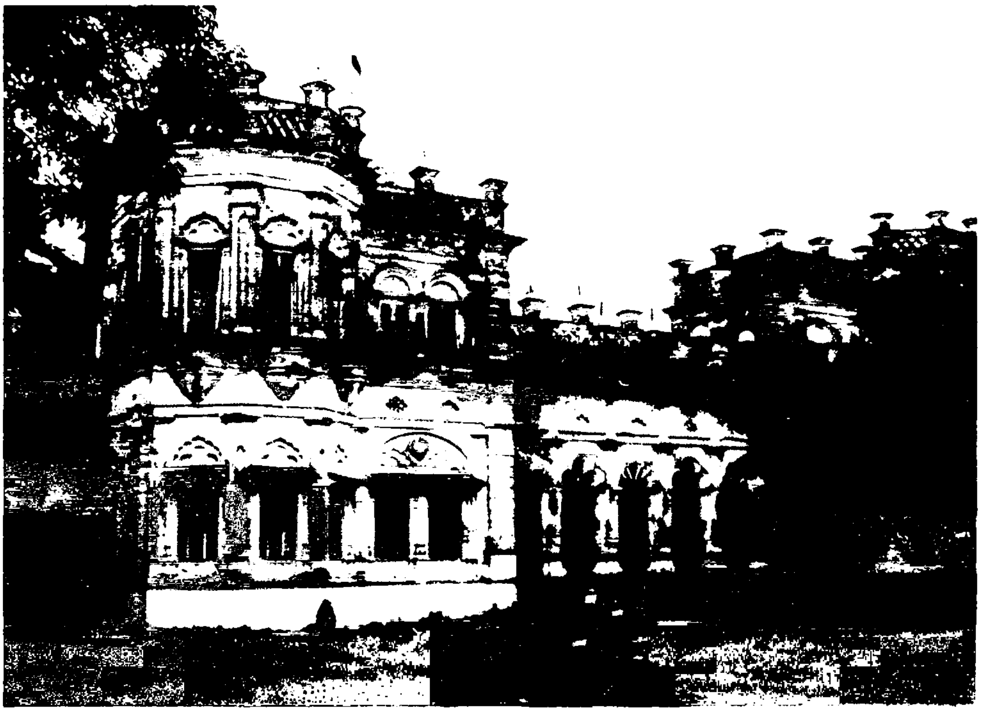

আলোকচিত্র ৫১: শ্রীফলতলী জমিদার প্রাসাদ (খ),কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

কাছারি ভবন (ক)
আলোকচিত্র ঃ৫২

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

জমিদার প্রাসাদের পশ্চিমে কাছারি ভবনটি আজও দণ্ডায়মান। এর নিমার্নকাল জমিদার প্রাসাদ এর সমসাময়িক। ইমারতের দেয়ালে কোন শিলালিপি নেই। এর নির্মাণে পোড়ানো ইট, চুন-সূরকি কাঠ, লোহা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। ইমারতটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মাণ করা হয়েছে। যার বাইরের পরিমাপ দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৪ ফুট,প্রস্থে ৩০ ফুট এবং ভূমি থেকে ছাদ পর্যন্ত এর উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট। এর ছাদ নিমার্নে কড়ি-বর্গা রীতি অনুসৃত হয়েছে। ভবনটির ফাসাদের মধ্যভাগে ১২ফুট ৪ ইঞ্চি পরিমাপের একটি বারান্দা রয়েছে । বারান্দাতে পর্যায়ক্রমে অর্ধবৃত্তাকার খিলানসারি দিয়ে নির্মিত যার পরিমাপ দৈর্ঘ্য ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি ও ১২ ফুট উঁচ। ভবনটিতে ৩টি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যভাগে একটি বৃহৎ ও অপর দু'পাশে দুটি তুলনামূলক ছোট আয়তাকার কক্ষ বিদ্যমান। পুরো ইমারতটি পলেস্তারা দ্বারা আবৃত ও সাদা রঙে রঞ্জিত।

অলংকরণ

কাছারি ভবনটিতে তেমন কোনো অলংকরণ নেই, এর দেয়ালগাত্র পলেস্তারা দিয়ে আচ্ছাদিত। দরজা ও জানালার ওপরের স্প্যান্ড্রিলে পলেস্তারার সাহায্যে ভেনিসিয়ান ব্লাইন্ডের অনুরূপ নকশা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া দেয়ালগাত্রের স্থানে স্থানে রয়েছে খোপনকশা।

আলোকচিত্র ৫২: শ্রীফলতলী জমিদার কাছারি ভবন (ক) কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

Dhaka University Institutional Repository

কাছারি ভবন (খ)
আলোকচিত্র ঃ ৫৩

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

এই ইমারতটি কাছারি ভবনের বিপরীত দিকে ও জমিদার প্রাসাদের পূর্ব দিকে মসজিদের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। এর দেয়ালে কোন শিলালিপি নেই। এর নির্মাণ ও গঠনশেলী কাছারি ভবন (ক) এর অনুরূপ। এটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মাণ করা হয়েছে যার বাইরের পরিমাপ দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ ফুট ,প্রস্থে ৩০ ফুট এবং ভূমি থেকে ছাদ পর্যন্ত উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট । এর নির্মাণ উপাদান হিসাবেও পোড়ানো ইট, চূন,সরকির প্রলেপ, কড়ি-বর্গা পদ্ধতির সমতল ছাদ ব্যবহৃত হয়েছে। কাছারি ভবনটি উত্তর-দক্ষিনে ধাবমান। ভবনটির ফাসাদ পশ্চিমমূখী যাতে কাছারি ভবন (ক) এর মত অর্ধবৃত্তাকার খিলান সমেত বারান্দা নির্মিত হয়েছে। এর বারান্দার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ১২ ফুট ৪ ইঞ্চি, ও ৯ ফুট ৫ ইঞ্চি । খিলানগুলোর উচ্চতা ১০ফুট ও প্রস্থ ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি। ভবনটির মধ্যভাগে একটি বৃহৎ আযতাকার কক্ষ এবং এর দুপাশে দুটি ছোট আযতাকার কক্ষ রয়েছে।

অলংকরণ

কাছারি ভবনটিতে তেমন কোনো অলংকরণ নেই, এর দেয়ালগাত্র পলেস্তারা দিয়ে আচ্ছাদিত। দরজা ও জানালার ওপরের স্প্যান্ড্রিলে পলেস্তারার সাহায্যে ভেনিসিয়ান ব্লাইন্ডের অনুরূপ নকশা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া দেয়ালগাত্রের স্থানে স্থানে রয়েছে খোপনকশা।

আলোকচিত্র ৫৩: শ্রীফলতলী জমিদার কাছারি ভবন (খ) কালিয়াকৈর, গাজীপুর ।

কাছারি ভবন (গ)
আলোকচিত্র ঃ ৫৪
স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

গাজীপুরের কালিয়াকৈর থানার শ্রীফলতলী জমিদারদের স্থাপত্যিক ঐতিহ্যর উলেখযোগ্য নির্দশন হল কাছারি ভবন। এটি জমিদার প্রাসাদের এর প্রায় ৩০ মিটার উত্তর -পূর্বে প্রান্তে অবস্থিত। এর দেয়াল গাত্রে কোন প্রকার শিলালিপি নেই তথাপি এটি শতাব্দীরও অধিক কাল ধরে তার আদি জৌলুস বজায় রেখে আজও বিদ্যমান আছে। এই কাছারি ভবনটির নির্মাণ শৈলীতে পূর্বের দুটি কাছারি ভবনের চেয়ে কিছুটা ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। পূর্বের দুটি কাছারি ভবন আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত হলেও এটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মাণ করা হয়েছে। এর নির্মাণ উপাদান হিসেবে পোড়ানো ইট, চুন-সুরকির প্রলেপ, কড়ি-বর্গা রীতির সমতল ছাদ ব্যবহৃত হয়েছে। ইমারতটির ফাসাদ দক্ষিনমূখী। বাইরে এর প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫ ফুট এবং প্রস্থ ৪৫ ফুট বর্গাকার প্রাসাদটি ভূমি থেকে ছাদ পর্যন্ড় উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট। এটি দ্বিতল পরিকল্পনায় নির্মাণ করা হয়েছে। এর দেয়াল গাত্র চুন-সুরকির মসৃন ধূসর পলেস্তারা দ্বারা আবৃত। ইমারতটির চর্তুদিকে প্রচুর কাঠের দরজা ও জানালা রয়েছে যা পযার্প্ত আলো বাতাস চলাচলে কার্য়করী ভুমিকা পালন করেছে। ভবনটির দক্ষিন পার্শ্বে দুই তলাতেই একটি অপ্রশস্ত বারান্দা বিদ্যমান। এই ইমারতের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় চারটি করে আটটি কক্ষ বিদ্যমান। এর দ্বিতীয় তলায় উঠার জন্য উত্তর দিকে একটি সিঁড়ি রয়েছে। এই কাছারি ভবনটির ছাদের চারকোণায় চারটি পার্শ্ব বরুজ আছে।

Dhaka University Institutional Repository

অলংকরণ

শ্রীফলতলী জমিদারবাড়ির কাছারি ভবন-৩ এর অলংকরণের সঙ্গে জমিদার ভবন-২ এর যথেষ্ট মিল দৃশ্যমান। জমিদার ভবনটির মতোই এ ভবনটিও দ্বিতল। এর দ্বিতীয় তলের ছাদের চারকোনে নির্মিত চারটি ছত্রী ভবনটির সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ছত্রীগুলোর নিচে ভবনটির চার কোণের পার্শ্ববুরুজগুলোয় অনেকটা আহসান মঞ্জিলের পার্শ্ববুরুজের অনুরূপ উদগত এবং গভীর গাঁথুনির সাহায্যে নির্মিত হয়েছে।[১] দ্বিতীয় তলার ছাদের চতুর্দিকে ফতেহপুর সিক্রির দিওয়ানই আম-এর অনুরূপ ঠেকনার সাহায্যে দেওয়াল থেকে বহির্গত একটি সান-শেডও ভবনটির অলংকরণকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর স্থাপত্য শৈলীতে এই ধরনের ঠেকনা (bracket) যুক্ত ছাইচ প্রায়শঃই লক্ষ্য করা যায়।[২]

আলোকচিত্র ৫৪: শ্রীফলতলী জমিদার কাছারি ভবন (গ) কালিয়াকৈর, গাজীপুর ।

১. Enamul Haque, *Dhaka Alias Jahangir Nagar 400 years,* International Centre for Study of Bengal Art, Dhaka, 2009, Pl. 318, p. 145.
২. ঐ।

অন্দর মহল
আলোকচিত্র ঃ ৫৫

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

শ্রীফলতলী জমিদারদের স্থাপত্যিক ঐতিহ্যর আরেকটি চিত্তাকর্ষক নির্দশন হল এর অন্দরমহলটি। এটি জমিদার প্রাসাদ এবং কাছারি ভবন এর পশ্চিম পার্শ্বে দৃষ্টিনন্দন অন্দরমহলটি অবস্থিত। এই ইমারতের দেয়ালগাত্রে কোন শিলালিপি নেই। এই ভবন পূর্ব-পশ্চিম দিকে ধাবমান এবং এর ফাসাদ উত্তরমূখী। অন্দরমহলটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মাণ করা হয়েছে যার বাইরের পরিমাপ দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ ফুট এবং প্রস্থে ৩৫ ফুট। ভূমি থেকে এর ছাদ র্পযন্ত উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট। আর এর নির্মাণ উপাদান হিসাবে আগুনে পোড়ানো ইট, চুন, সুরকির প্রলেপ, লোহা, কাঠ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর ছাদ নিমার্ণে যথারীতি কড়ি-বর্গা পদ্বতিতে সমতল ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। এর প্রবেশপথ ইমারতের মধ্যভাগে যেখানে একটি বারান্দা বিদ্যমান। বারান্দাটি কয়েকটি অর্ধবৃত্তাকার খিলানের মাধ্যমে নির্মিত। বারান্দাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ ফুট ও প্রস্থে প্রায় ৯ ফুট। এর বারান্দার খিলানগুলোর দৈর্ঘ্য ১০ ফুট ও প্রস্থে ৫ ফুট। অন্দরমহলটি দক্ষিণ পার্শ্বে অনুরূপ আরেকটি বারান্দা আছে। উত্তর পাশের বারান্দার পূর্ব-পশ্চিমে দুটি অনুরূপ বর্গাকার কক্ষ আছে। ভবনটিতে দুটি বারান্দা ছাড়াও মধ্যভাগে একটি প্রশস্ত আয়তাকার হল কক্ষ, এর পূর্ব-পশ্চিমে দুটি সমআয়তনের আয়তাকার কক্ষ রয়েছে। এই ইমারতের দক্ষিণের বারান্দার পূর্ব-পশ্চিমে দুটি গোসলখানা রয়েছে।

অলংকরণ

শ্রীলফলতলি জমিদারবাড়ির কাছারি-ভবনগুলোর ন্যায় এর অন্দর মহলটিতেও তেমন কোনো অলংকরণ পরিলক্ষিত হয় না। বর্তমানে এ ভবনটির দেওয়ালগুলো পলেস্তারা আচ্ছাদিত, দরজা ও জানালার খিলানের স্প্যান্ড্রিলে ভেনিসিয়ান ব্লাইন্ডের অনুরূপ নকশা রয়েছে। এছাড়া দেয়ালের গায়ে রয়েছে খোপ নকশা।

আলোকচিত্র ৫৫: শ্রীফলতলী জমিদার অন্দর মহল, কালিয়াকৈর, গাজীপুর ।

প্রহরী ভবন

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

শ্রীফলতলী জমিদারদের স্থাপত্যিক ঐতিহ্যর অন্যতম নিদর্শন গুলোর মধ্যে দুটি প্রহরী ভবন অন্যতম। প্রথমটি জমিদার প্রাসাদ এর দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং দ্বিতীয়টি জমিদার বাড়ি মসজিদের দক্ষিনে অবস্থিত। প্রহরী ভবন দুটির প্রথমটি আয়তাকার পরিকল্পনায় এবং দ্বিতীয়টি বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোর ফাসাদ দক্ষিন মুখী। ভবন দুটির নির্মানে পোড়ানো ইট, চুন-সুরকি,কড়ি-বর্গা রীতির ছাদ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম প্রহরী ভবনটি দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫ ফুট এবং প্রস্থে ও উচ্চতায় প্রায় ১৫ ফুটের মত। এর অভ্যন্তরে দুটি আয়তাকার কক্ষ দ্বারা বিন্যাসিত। বর্গাকারে নির্মিত দ্বিতীয় ভবনটি দৈর্ঘ্য, প্রস্থে ও উচ্চতায় প্রায় ১৫ ফুটের মত। এর অভ্যন্তরে একটি কক্ষ বর্তমান।

অলংকরণ

ভবন দুটির দেয়াল চুন-সুরকির পলেস্তারা দ্বারা আচ্ছাদিত এবং দেয়ালগাত্র খাজকাটা নকশা দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে। এদের প্রধান প্রবেশপথ দক্ষিন দিকে বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবেশতোরণ (ক)
আলোকচিত্র ঃ৫৬

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

শ্রীফলতলী জমিদারদের স্থাপত্যিক নির্দশনগুলোর মধ্যে দুটি প্রবেশতোরণ উলেখযোগ্য। প্রথম প্রবেশতোরণটি জমিদার বাড়ি মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে এবং জমিদার প্রাসাদ, কাছারি ভবন ও অন্য কাছারি ভবন এর দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত যা প্রধান প্রবেশতোরণ রুপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নির্মাণকাল অন্যান্য ইমারতের সমসাময়িক। প্রবেশতোরনটির দেয়ালগাত্রে চার স্থানে আলাহ, মোহাম্মদ (রাঃ) ও কালিমা উৎকীর্ণ আরবীতে শিলালিপি রয়েছে। এগুলো তোরণের উপরাংশের চূড়ায় একটি, খিলানের উপরে একটি, ও নীচে খাঁজকাটা স্তম্ভের দুপাশের মাঝে দুটি। এর নির্মাণ উপাদান হিসাবে পোড়ানো ইট, চুন,সুরকি ব্যবহৃত হয়েছে। তোরণটি আয়তাকার পরিকল্পনায় বৃহৎ আকারে নির্মাণ করা হয়েছে যার পরিমাপ দৈর্ঘ্য ২৮ ফুট,প্রস্থে ১৪ ফুট এবং ভূমি থেকে এর শীর্ষ পর্যন্ত উচ্চতা প্রায় ২৪ ফুট। এর ছাদ নির্মাণে কড়ি-বর্গা রীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রবেশতোরনটির সম্মুখে ও পশ্চাতে দুটি বৃহৎ অর্ধবৃত্তাকার খিলান লক্ষ্য করা যায়।

অলংকরণ

তোরণটির পুরো দেয়ালগাত্র গোলাপী রঙে রঞ্জিত ও এর দু'পার্শ্বের সংযুক্ত স্তম্ভে খাজ কাটা নকশা দ্বারা শোভিত। খিলানের দু'পাশে দু'টি করে সংযুক্ত স্তম্ভ যাদের শীর্ষে এ্যাকান্থাস নকশা বিদ্যমান। তোরণের খিলান প্রান্ত সরু স্তম্ভ ও উপরাংশ পেচানো রশির নকশা দেখা যায়। এর ছাদের শীর্ষে চার কোণায় চারটি সরু গোলাকার ছত্রী বিদ্যমান।

আলোকচিত্র ৫৬ঃ শ্রীফলতলী জমিদার বাড়ির প্রবেশতোরণ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর ।

প্রবেশতোরণ (খ)
স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

এই প্রবেশতোরণটি অপেক্ষাকৃতা ছোট আকৃতির। এটি দ্বিতীয় জমিদার প্রাসাদের পশ্চিম পাশে ও জমিদারবাড়ি জামে মসজিদ এর ৫০ মিটার উত্তরে অবস্থিত। প্রবেশতোরণ (ক) এর চেয়ে কিছু পরে নির্মিত যার নিমার্নে পোড়ানো ইট ,চুন, সুরকি ব্যবহৃত হয়েছে।এটি ১৬ ফুট উটচু ,দৈঘ্য ১৪ ফুঠ ও প্রস্থে ৪ ফুট।

অলংকরণ

এতে খাজ নকশা,সরু স্তম্ভ নকশা, ফুল লতাপাতার স্টাকো নকশা বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

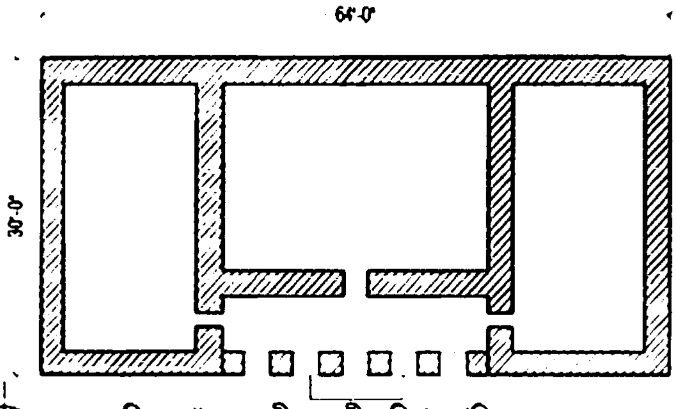

ভূমি নকশা-১৫ ঃ শ্রীফলতলী জমিদার বাড়ি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর(ক-কাছারি ভবন)।

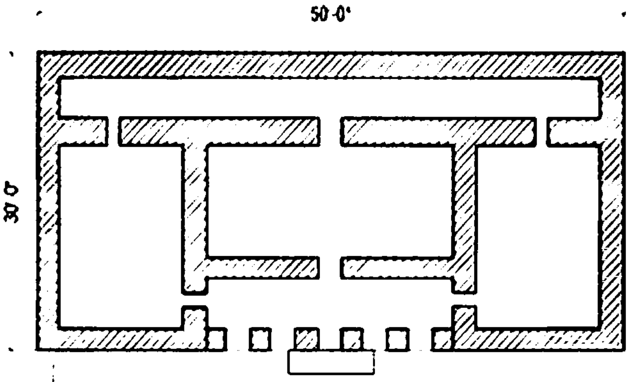

ভূমি নকশা-১৫ ঃ শ্রীফলতলী জমিদার বাড়ি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর(খ-কাছারি ভবন)।

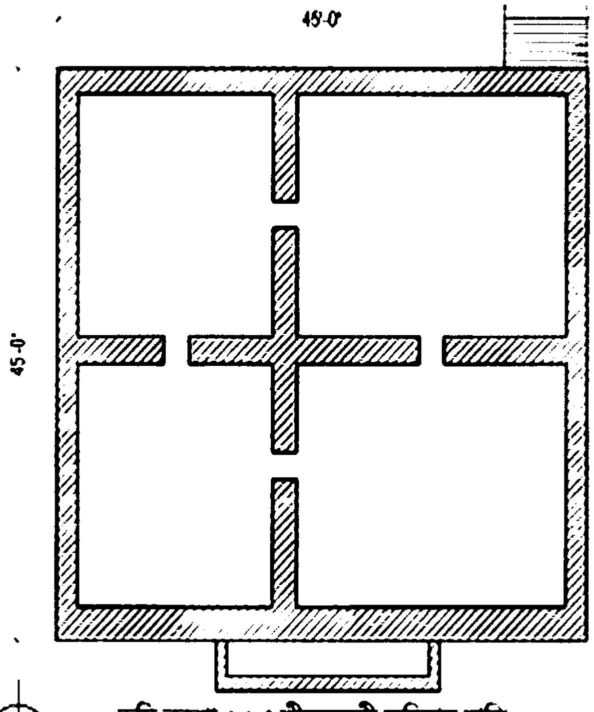

ভূমি নকশা-১৫ ঃ শ্রীফলতলী জমিদার বাড়ি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর(গ-কাছারি ভবন)।

পানাম প্রাসাদ (৩ নং বাড়ি)

আলোকচিত্র ঃ ৫৭,৫৮ ভূমি নকশা ঃ ১৬

অবস্থান

নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ লোকশিল্প যাদুঘর হতে প্রায় দুই কি.মি. পূর্বে পানাম শহরের মধ্য দিয়ে যে রাস্তাটি চলে গেছে রাস্তার প্রবেশের মুখেই ডান পাশে বাড়িটি অবস্থিত।

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

আয়তাকার এই ইমারতটি একটি হল ঘর কেন্দ্রিক ইমারত। হলঘরটির দৈর্ঘ্য ১৫.২৫ মি. এবং প্রস্থ ১০.৩৬ মি. এর প্রবেশ পথটির দুই পাশে দুটি করে চারটি কম্পোজিট স্তম্ভ দিয়ে বর্ধিত আকারে নির্মাণ করা হয়েছে। এই স্তম্ভ সারিটির ঠিক পিছনে রয়েছে নয় খিলান বিশিষ্ট্য একটি বারান্দা। বারান্দার খিলানগুলি আয়তাকার স্তম্ভের উপর নির্মিত এবং ঠিক ফ্রিজের নিচে প্রতিটি স্তম্ভ বরাবর স্তম্ভ শীর্ষের অলংকরণ সংযুক্তি করা হয়েছে। প্রতিটি উন্মুক্ত খিলানের পিছনে বারান্দার অপর পাশে রয়েছে একটি করে দরজা। মাঝখানের এবং দুই দিকের শেষ প্রান্তের খিলান দুটি ছাড়া অন্য সব খিলানের সামনে রয়েছে cast-iron এর রেলিং। দ্বিতল ইমারতের উপরের তলায় নিচের প্রবেশ পথের স্তম্ভ সারির ঠিক উপরে নির্মিত হয়েছে একটি ঝুলানো বারান্দা। বারান্দাটি ক্ষুদ্র চারটি স্তম্ভ সহযোগে cast-iron এর রেলিং দিয়ে ঘেরা। নিচের খিলান সারির ন্যায় দ্বিতলেও রয়েছে নয়টি খিলান। তবে এই খিলান গুলোতে উপরের খিলান পটে এবং নিচে cast-iron এর গ্রীল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া। এর মাঝখানে রয়েছে ভেনিসিয় সাটারযুক্ত জানালা। প্রতি দুটি খিলানের মাঝে এবং দুই প্রান্তে আয়তাকার ভিত্তির উপর নির্মিত হয়েছে শিরাল সংযুক্ত স্তম্ভ। স্তম্ভ গুলোর শীর্ষ করিন্থীয় পাতার নকশায় সজ্জিত। খিলানের উপরে স্টাকো দ্বারা তিন খাজ খিলান নকশা নান্দনিকভাবে দেয়ালসজ্জায় ব্যবহৃত হয়েছে। নিচে খিলান সারির পিছনে বারান্দার বাম পাশে রয়েছে দোতলায় উঠার সিঁড়ি। বারান্দা থেকে তিনটি দরজা দিয়ে যে কক্ষটিতে প্রবেশ করা যায় সেটি একটি হলঘর। কক্ষটির ছাদ দ্বিতল পর্যন্ত বিস্তৃত। হলঘরটি একপাশে প্রথম তলার একপাশে পাঁচ খিলান বিশিষ্ট একটি গ্যালারির ব্যবস্থা আছে এবং দ্বিতীয় তলায় হলঘরকে কেন্দ্র করে চারদিকে গ্যালরির ব্যবস্থা রয়েছে। ঘরটি স্টাকো নকশা ও রং দ্বারা অপূর্ব নকশায় সজ্জিত। ঘরটির ব্যবস্থাপনায় এটাকে একটি নাচঘর বলে প্রতীয়মান হয়। হলঘরটির পিছনে রয়েছে একটি বর্গাকার অঙ্গণ। অঙ্গণটির বাকী দুই দিক ঘিরে রয়েছে দ্বিতল ইমারত। আর বাকী একপাশে উঁচু প্রাচীর দ্বারা ঘেরা। ইমারতের এই স্থানে রয়েছে বাইরে যাওয়ার জন্য অপর একটি খিড়কি দরজা। দ্বিতল ইমারতটির প্রথম

তলার কক্ষগুলো সরাসরি বারান্দার পিছনে নির্মিত। দ্বিতীয় কক্ষগুলো সরাসরি বারান্দার পিছনে নির্মিত। দ্বিতীয় তলার বারান্দায় লোহার স্তম্ভ মাঝে রেলিং দিয়ে ঘেরা। এক তলায় বারান্দার উপরের অংশ কাঠের অলংকৃত ছাইচ দিয়ে ঘেরা। হলঘর কেন্দ্রিক ইমারত পানামে আরো লক্ষ করা যায় ১,২, ১৬ ও ২৬ নং বাড়িতে।[১] পানামের ইমারত গুলোর মধ্যে এই হলঘরটি সবেচেয় বড়।[২]

অলংকরণ

ইমারটিতে স্টাকো, cast-iron রঙিন কাঁচ, কাঠ এবং চিনি টিকরি দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে।[৩] স্টাকো সজ্জা ও রংয়ের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় নাচ ঘরে। নাচ ঘরের খিলান গুলোর উপরের স্প্যানড্রিলে রঞ্জিত পটভূমিতে অনুচ্চ স্টাকো নির্মিত ফুল ও লতার নকশা রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্যানেলের উপরে স্টাকো নির্মিত মুকুট নকশাও দেখা যায়। স্টাকোর আরো ব্যবহার রয়েছে ভবনের সম্মুখে খিলানের উপরে স্তম্ভ ভিত্তিতে স্তম্ভ শীর্ষে ও দেয়ালের ফ্রিজে। cast-iron এর নকশা মূলত ব্যবহৃত হয়েছে রেলিং এবং খিলান পটের গ্রীলে এবং ইমারতের বাইরের দিকের জানালাগুলোর নিচের অংশ। খিলান পটে গ্রীলের পিছনে রঙিন কাঁচের ব্যবহার হয়েছে। কাঠের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় জানালার ভেনিসিয় শাটারে(shutter), বারান্দার চারপাশে ছাইচ নির্মাণে। চিনি টিকরির নকশামূলত নাচ ঘরে অধিক লক্ষ্য করা যায়। খিলানের কিনারা দিয়ে এবং দ্বিতীয় তলার উত্তর পাশে বৃহৎ খিলানটির উপরে একটি প্যানেল আকারে ফুল ও জ্যামিতিক নকশা নির্মাণে চিনি টিকরির ব্যবহার হয়েছে।

নির্মাণ কাল

নাচ ঘরের দ্বিতীয় তলায় একটি প্যানেলের মাঝখানে একটি লিপি পাওয়া যায়। সেখানে লেখা আছে "শ্রী শ্রী যুক্ত গোপীনাথ জিউর শ্রী চরণ ভরসা ১৩১৬ সন" স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এটি বিংশ শতকের প্রথম দিকের একটি ইমারত। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের পানাম সিটি অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১. A.B.M Hosain (ed.), "*Sonargaon- Panam*" Dhaka, Asiafic Society of Bangladesh, 1997, p.123

২. এ.বি.এম হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮২।

৩. Abdul Momin Chowdhury & Abu H. Imamuddin, *Op.cit*, pp. 166-171

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র ৫৭: পানাম প্রাসাদ (৩নং বাড়ি), সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

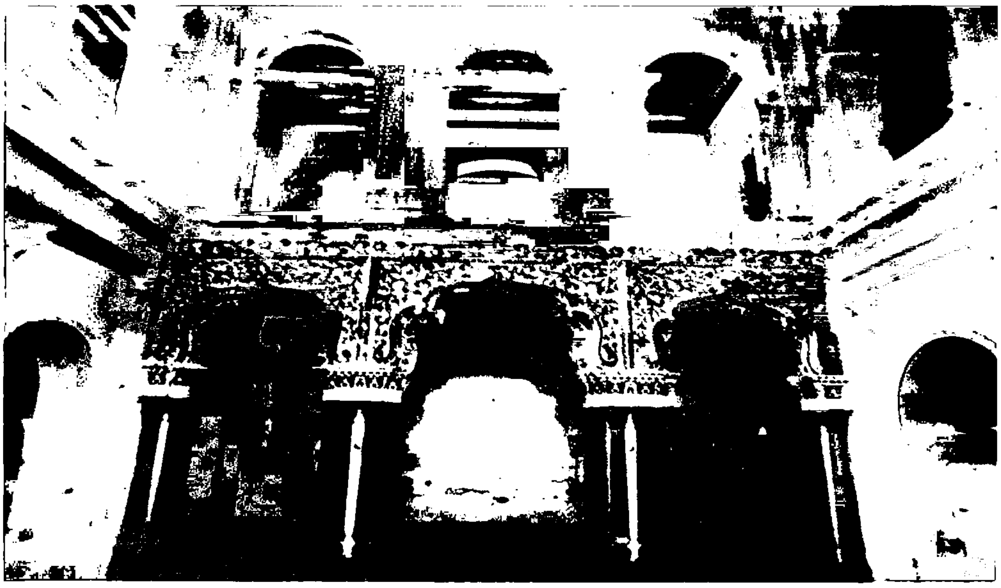

আলোকচিত্র ৫৮: পানাম প্রাসাদ (৩নং বাড়ি), অভ্যন্তরিন দৃশ্য, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

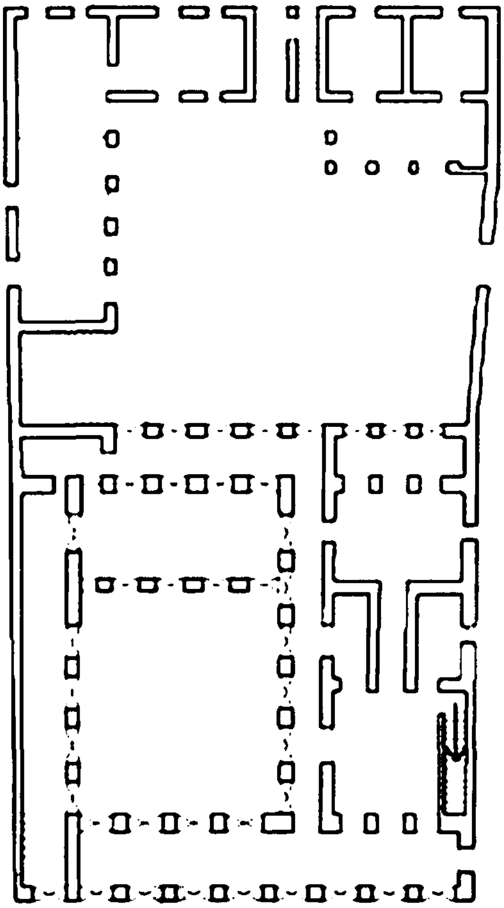

ভূমি নকশা-১৬ : পানাম প্রাসাদ(৩নং ভবন), নীচতলা, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।

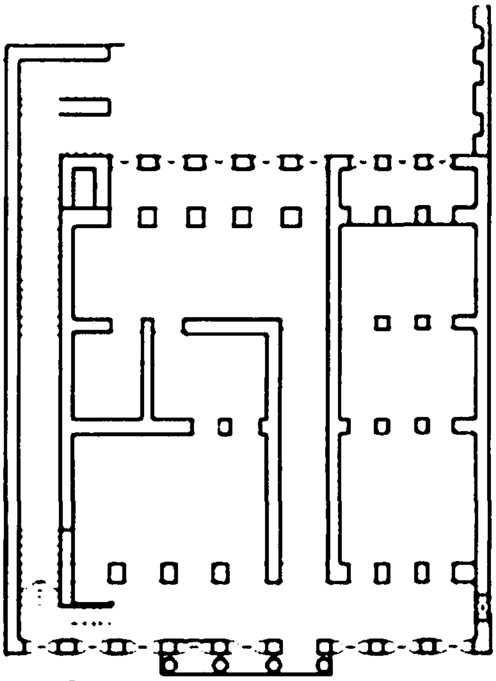

ভূমি নকশা-১৬ : পানাম প্রাসাদ(৩নং ভবন), দোতলা, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

রাধারমন রায়ের বাড়ি

আলোকচিত্র ঃ ৫৯,৬০,৬১,৬২ ভূমি নকশা ঃ ১৭

অবস্থান

ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার কলাকোপা ইউনিয়নের প্রধান সড়কের উত্তর দিকে এই বাড়িটি অবস্থিত।

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

দ্বিতল ও দক্ষিণমুখী এই ইমারতটি একটি অনুচ্চ ভিত্তির উপর নির্মিত। সমতল ভূমি থেকে সাত ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি দ্বারা মূল ভবনের বারান্দায় পৌছাতে হয়। বারান্দাটি দোতলার ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত চারটি কম্পোজিট শীর্ষযুক্ত বৃহৎ স্তম্ভের সহযোগে নির্মিত। কক্ষগুলো বারান্দার দুই পাশে এবং পিছনে সারিবদ্ধভাবে নির্মিত হয়েছে। বারান্দার দুই পাশের অংশ সামান্য বর্ধিত করে নির্মিত। বারান্দার ঠিক উপরে ইমারতের মাঝখানে অনুচ্চ প্যারাপেটের উপরে পেডিমেন্টের বিকল্প হিসেবে নির্মিত হয়েছে অলংকৃত মুকুট ধরণের নকশা। এর উপরের অংশে বৃত্তাকার ফোকর রয়েছে। এবং দুই পাশে নির্মিত হয়েছে ফুলদানির ন্যায় শীর্ষদণ্ড। বারান্দার দুই পাশে বর্ধিত অংশের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় রয়েছে প্রতিটি অংশে দুটি করে মোট চারটি উন্মুক্ত খিলান। সকল খিলানই অর্ধবৃত্তাকারে নির্মিত কিন্তু দোতলার খিলান নির্মানে তিনখাজ বিশিষ্ট খিলানের ব্যবহার দেখা যায়। প্রথম তলার পিছনে ভবনের জানালা ও দরজার খিলানে অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় তলার কক্ষের দরজাগুলোর উপরে এই ধরনের খিলানের ব্যবহার হয়নি। দোতলার বর্ধিত অংশের সম্মুখের দিকে এবং অপর পাশে রয়েছে একটি করে সরু সংলগ্ন স্তম্ভ। স্তম্ভের ভিত্তিটি সম্পূর্ণ কলস আকারে নির্মিত এবং শীর্ষে করন্থীয় পাতার নকশা। দোতলার বারান্দার cast iron এর রেলিং সংযুক্ত করা হয়েছে।

অলংকরণ

স্থাপত্য অলংকরণ তিনটি মাধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছে (১) স্টাকো (২) cast iron (৩) চিনি টিকরী ও টিনামাটির আসবাব। স্টাকো অলংকরণ মূলত: স্তম্ভশীর্ষ, খিলানের স্প্যানড্রিল এবং ইমারতের উপরে নির্মিত পেডিমেন্ট সদৃশ অলংকরণ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে। স্তম্ভগুলোর শীর্ষ করন্থীয় ও আয়ওনীক নকশা দ্বারা সজ্জিত। খিলান এর স্প্যানড্রিলে ফুল ও লতার নকশার উপরে নির্মিত হয়েছে মুকুট পরিহিত সিংহের মুখ এবং এর দুই পাশে উপবিষ্ট পরী।

Dhaka University Institutional Repository

cast-iron মূলতঃ ব্যবহৃত হয়েছে বারান্দার রেলিং এ এবং জানালার খিলান পটতে। সুদৃশ্য লতানো ও জ্যামিতিক নকশার সমন্বয়ে নির্মিত এই রেলিং ও খিলান পট অলংকরণ গুলো উনবিংশ বিংশ শতকের শিল্প ঐতিহ্য ধারণ করে আছে। চিনি টিকরীর নকশা এই ইমারতটিতে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করা হয়েছে। ইমারতের ফ্রিজ এবং তার নিচের অংশ, সিঁড়ির ধাপের উলম্ব অংশে এবং সিঁড়ির বাকের মেঝেতে চিনি টিকরীর নকশা গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। ইমারতের ফ্রিজে স্টাকো নির্মিত লতানো ফুলের নকশার উপরে চিনামাটির ভাংগা টুকরো বসিয়ে আকর্ষনীয় সজ্জার সৃষ্টি করা হয়েছে। এই নকশার সবচেয়ে উলে- খযোগ্য বিষয়টি হলো লতানো নকশার কিছু দুর পরপর চিনামাটির আস্ত থালা বসিয়ে অভিনবত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। অলংকরণে এই ধরনের পূনাঙ্গ থালা বসিয়ে নকশা সৃষ্টির উদাহরণ একমাত্র এখানকার দু'একটি ইমারতেই দেখা যায়।

নির্মাণকাল

ইমারতের গায়ে নির্মাণ তারিখ সম্বলিত কোন লিপি নেই। ইমারতের বারান্দার স্তম্ভগুলোর মধ্যে বাম দিক থেকে তৃতীয় স্তম্ভের ভিত্তিতে পলেস্তারার উপরে খোদাই করে একটি লিপি পাওয়া যায় তাতে তিনজন ব্যক্তির নাম উল্লেখিত হয়েছে- (১) শ্রী বল্লাম দাস (২) শ্রী রাধা বল্লভ দাস (৩) শ্রী রাধা রমন দাস। ইমারতের সম্মুখে দুটি শশ্মান মন্দির রয়েছে। শিলালিপি অনুযায়ী রাধারমন রায় কর্তৃক তাঁর মাতা কোকিল প্যারী দাসস্যা পবিত্র শশ্মান মন্দির যা ১৩৩৬ বাংলা সনে নির্মিত। এখানে উল্লেখ্য যে, মূল ভবনে উল্লেখিত রাধারমন দাস এবং এই মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ রাধা রমন রায় যদি একই ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে ভবনটি উনিশ-বিশ শতকের একটি ইমারত। অলংকরণ, বৈশিষ্ট এমন দিক নির্দেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র ৫৯: রাধারমন রায়ের বাড়ি, কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

আলোকচিত্র ৬০: রাধারমন রায়ের বাড়ি, কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

আলোকচিত্র ৬১: রাধারমন রায়ের বাড়ি, কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

আলোকচিত্র ৬২: করিন্থীয় স্তম্ভ, রাধারমন রায়ের বাড়ি, কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

জজ বাড়ি

আলোকচিত্র ঃ ৬৩,৬৪,৬৫ ভূমি নকশা ঃ ১৮

অবস্থান

ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার কলাকোপা ইউনিয়নের প্রধান সড়কের উত্তর দিকে জজ বাড়িটি অবস্থিত।

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

একটি বাগানকে সামনে রেখে কলাকোপার জজ বাড়িটি খুব জাকালোভাবে নির্মিত হয়েছে। মূল বাড়িটি আয়তাকার ও দ্বিতল আকারে নির্মিত। অঙ্গণে প্রবেশের জন্য প্রথমেই রয়েছে একটি আনুষ্ঠানিক প্রবেশপথ। প্রবেশ পথটির দুপাশে জোড়া কলামের উপর প্রবেশ পথের সেডটি নির্মিত যার মাঝখানে রয়েছে একটি ত্রিকোনাকার অংশ। জোড়া কলামের উপরে এবং ত্রিকোণ অংশের শীর্ষে তিনটি কলাম আকারে শীর্ষদণ্ড নির্মাণ করা হয়েছে। দক্ষিণমুখী বাড়িটির বারান্দায় পৌছানোর জন্য অঙ্গণ থেকে ছয় ধাপ বিশিষ্ট একটি সিঁড়ি রয়েছে। ইমারতটির বারান্দায় ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত পাঁচটি কম্পোজিট ধরনের শীর্ষযুক্ত স্তম্ভ রয়েছে। বারান্দায় দুপাশে এবং পিছনে কক্ষগুলো বিন্যস্ত। ইমারতের মাঝখানে বারান্দার ঠিক উপরে নির্মিত প্যারাপেটের উপর ত্রিকোনাকার পেডিমেন্ট। পেডিমেন্টের উপরে দুই পাশে ফুলদানি সদৃশ শীর্ষদণ্ড রয়েছে। পেডিমেন্টের মধ্যে একটি বৃত্তাকার ফোকর দেখা যায়। এই ধরণের আরো কিছু ফোকর ছাদের উপরে প্যারাপেটের নির্ধারিত দুরত্বে নির্মিত হয়েছে। প্যারাপেটের চারকোনায় এবং বারান্দার দুপাশের সংযুক্ত কলামের ঠিক উপরে নির্মিত হয়েছে ছোট ছোট মিনার। ইমারতের ফাসাদটি বেশ জাকালো। বারান্দার দ্বিতলে ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত স্তম্ভগুলোর দুপাশের অংশে এবং ইমারতের দুই কোণে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় তলাতে সরু ও জোড়া স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। স্তম্ভ গুলোর শীর্ষ কম্পোজিট স্তম্ভের অনুরূপ অর্থাৎ এখানে করন্থীয় পাতার সাথে আয়ওনীয় ধরণের প্যাঁচানো নকশা সহযোগে অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। স্তম্ভ গাত্র গুলো প্যাচানো ও খোপ নকশায় সজ্জিত। বারান্দার দুই পাশের অংশ গুলোতে অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলানযুক্ত দুটি করে জানালা রয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় তলাতে। জানালার উপরের অংশ ও দুটি জানালার মাঝের অংশের স্তম্ভের শীর্ষ চমৎকার স্টাকো নির্মিত অলংকরণ রয়েছে। বারান্দার পিছনে এবং দুইপাশে সারিবদ্ধ ভাবে ছয়টি করে দুই তলা মিলে মোট বারোটি কক্ষ রয়েছে। ইমারতের পূর্ব প্রান্তে রয়েছে দোতলায় ওঠার জন্য একটি সোপান শ্রেণি। নীচের তলার প্রবেশপথ ও জানালাগুলোর উপরে বদ্ধ খিলান নকশা দেখা যায়। জানালাগুলো ফ্রেঞ্চ জানালা আকারে নির্মিত। দোতলার বারান্দার সম্মুখে রয়েছে একটি cast-iron এর রেলিং। বারান্দার দুই পাশের

Dhaka University Institutional Repository

জানালাগুলোর খিলান পটেও cast-iron এর নকশাযুক্ত ফ্রেম লক্ষ্য করা যায়। জানালায় ভেনিসীয় খড়খড়ির ব্যবহার দেখা যায়।

অলংকরণ

ইমারতের প্রবেশ পথ ও ফাসাদে রয়েছে স্টাকো নির্মিত নানান ধরণের নকশা। প্রবেশ পথের স্তম্ভ শীর্ষ এবং স্থাপত্যিক রেখা ধরে স্টাইলাইজ পাতার নকশা সারিবদ্ধভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। মূল ভবনের অলংকরণের স্টাকো, cast-iron, চিনি টিকরী ও কাঠের নকশা দেখা যায়। প্রাসাদের সম্মুখের বারান্দায় স্তম্ভগুলোর শীর্ষে স্টাকো নির্মিত করন্থীয়ান পাতা ও আয়ওনীক ধরনের প্যাচানো নকশা রয়েছে। এর ঠিক উপরে কার্ণিশের নীচে একসারি ফুলের পাড় নকশা লক্ষ্য করা যায়। এর উপরের অংশে নির্ধারিত দূরত্বে মেডেল আকারে কিছু বিশেষ ধরণের ফুলও পাতার নকশা লক্ষ্য করা যায়। এর উপরে কর্নিশ বরাবর ফুলের তোড়ার আকারে একসারি নকশা রয়েছে। ইমারতের প্যারাপেটেও যথেষ্ট স্টাকো নকশা রয়েছে। ক্ষুদ্র মিনার গুলোর সম্মুখ ভাগে বিশেষ ধরণের ফুল ও পাতার চক্রাকার নকশা তৈরি করা হয়েছে। এই ধরনের চক্রাকার একসারি নকশা পেডিমেন্টের ঠিক নীচে প্যারাপেটের গায়ে লক্ষ্য করা যায়। বারান্দার দুই পাশের জানালা ও দরজাগুলোর উপরে মুকুট ও পতাকাযুক্ত স্টাকো নকশা রয়েছে। এছাড়া প্রথম তলার কর্নিশের ব্রাকেটে পাতার নকশা দেখা যায়। cast-iron এর ব্যবহার ইমারতটির দোতলায় গ্রীল ও জানালার খিলান পটে ব্যবহৃত হয়েছে। জানালার নকশায় ফুল পাতার ব্যবহার হলেও গ্রীল নির্মাণে জ্যামিতিক ও লতানো ধরণের নকশার সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। কাঠের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় প্রথম তলার ছাদের সম্মুখে ছাইচ নির্মানে। এখানেও কাঠের উপরে খোদাই করা ফুল ও লতার নকশা ও পাড় নকশা লক্ষ্য করা যায়।

চিনি টিকরীর নকশা দেখা যায় ভবনের সম্মুখের কলামগুলোর গায়ে। স্তম্ভের গায়ে লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি-ভাবে কাঁচ ও আয়নার টুকরো বসিয়ে স্তম্ভ গুলোকে অলংকরণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণকাল

ইমারতটিতে কোন তারিখ সম্বলিত শিলালিপি নেই। তবে স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যে একে বিশ শতকের প্রথম দিকের ইমারত বলে মনে করা যেতে পারে। বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন সুধোসন চন্দ্র নামে একজন হিন্দু ব্যবসায়ী।[১] সেই সময়ে বাড়িটি ব্রজনিকেতন নামে পরিচিত ছিল।[২] ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর সুধোসন চন্দ্র ভারতে চলে যান এবং বাড়িটি তৎকালীন একজন সরকারী কর্মকর্তা মরহুম আব্দুল আলীম খন্দকার কিনে নেন। বর্তমানে তাঁর পুত্র স্পেশাল ট্রাইবুনাল জজ আবুল হোসেন খন্দকার এই বাড়িটির মালিক এবং বর্তমানে বাড়িটি জজ বাড়ি নামে পরিচিত।

আলোকচিত্র ৬৩: জজবাড়ি, কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

১. আলহাজ্জ আবুল হোসেন খন্দকার (৫২) (স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল জজ) এর আলোচনা থেকে জানা যায়।
২. স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র ৬৪: জজবাড়ি, কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

আলোকচিত্র ৬৫: পেডিমেন্ট, জজবাড়ি, কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

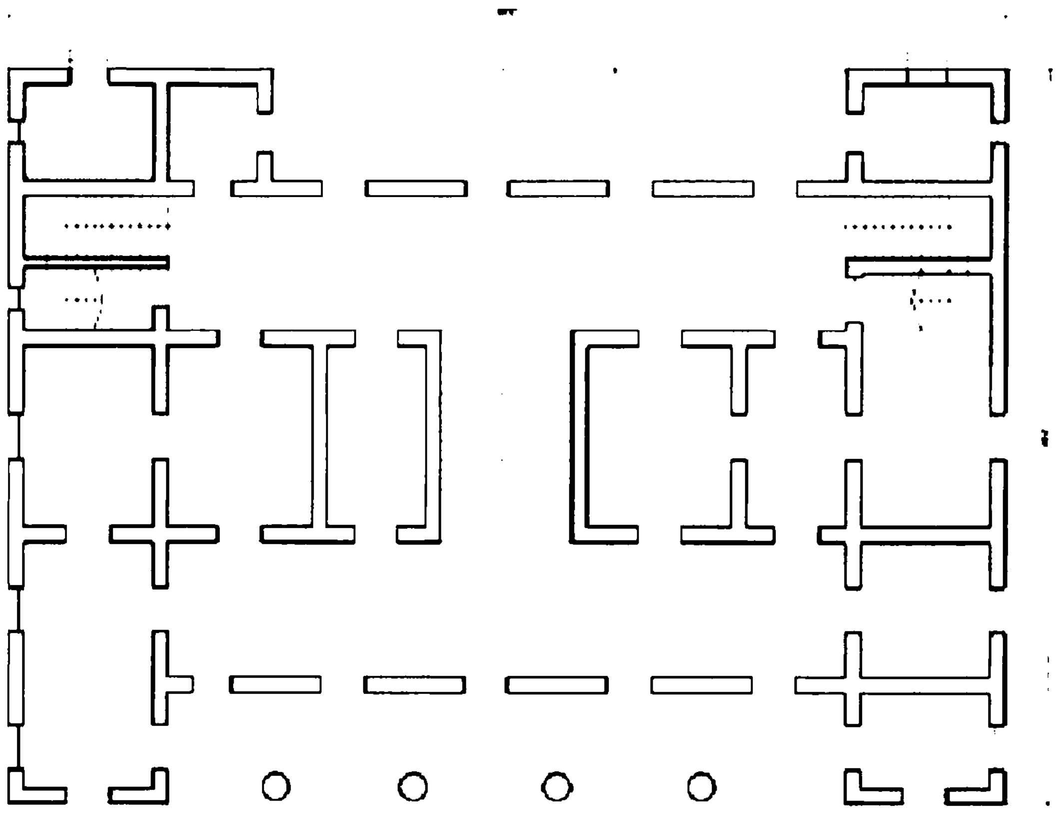

ভূমি নকশা-১৮ ঃ জজ বাড়ি(নীচতলা),
কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

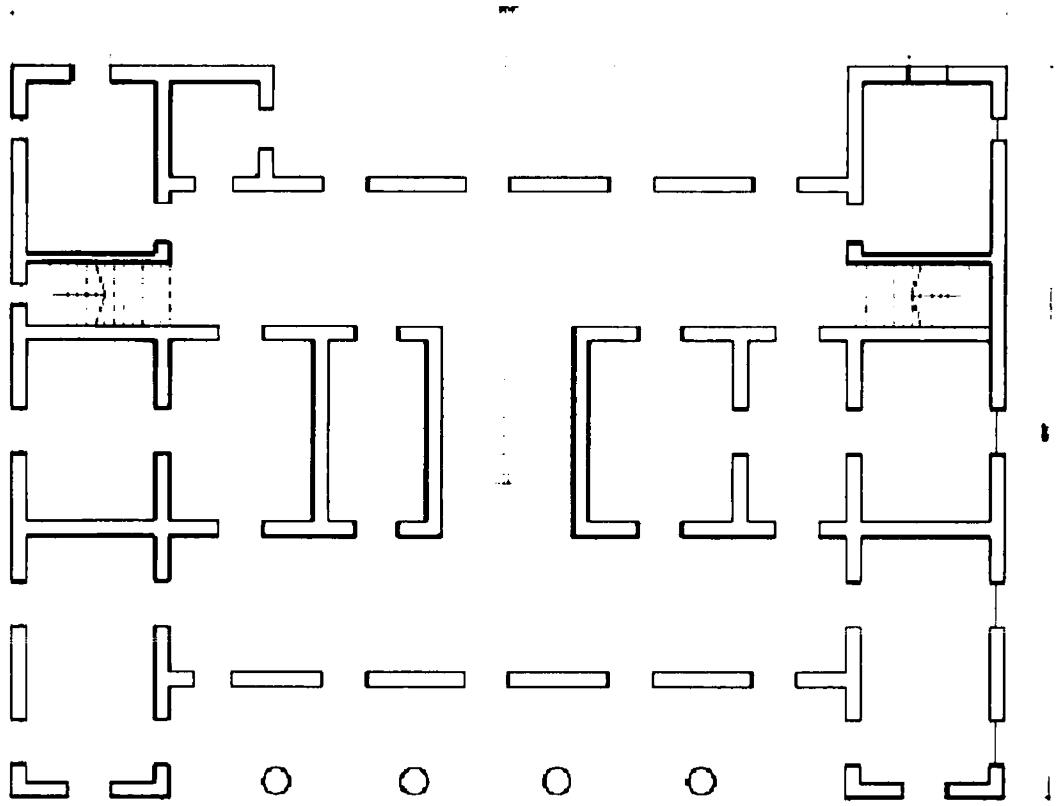

ভূমি নকশা-১৮ ঃ জজ বাড়ি (দোতলা),
কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

যদুনাথ প্রাসাদ

আলোকচিত্র ঃ ৬৬,৬৭ ভূমি নকশা ঃ ১৯

অবস্থান

মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার ভাগ্যকুল গ্রামে যদুনাথ প্রাসাদটি অবস্থিত।

স্থাপত্যিক পর্যালোচনা

চারিদিকে পরিখা বেস্টিত মুন্সিগঞ্জের যদুনাথ প্রাসাদটি দুটি বাসগৃহ, একটি রাজলক্ষী নারায়ণ মন্দির, একটি আরতি মন্দির, একটি নাট মন্দির, একটি কাছারি এবং একটি বড় জলাশয় সমন্বয়ে নির্মিত। বাসগৃহ গুলির সঙ্গে গোলা, রান্নাঘর কর্মচারীদের বাসস্থান ইত্যাদি সংযুক্ত হয়েছে। বাসগৃহ দুটি একই পরিকল্পণায় মুখোমুখিভাবে নির্মিত। একটি পশ্চিমমুখী এবং অপরটি পূর্বমুখী। মাঝে একটি হলঘর রেখে ইমারতের দুইধারে দুটি করে মোট চারটি কক্ষ রয়েছে। বারান্দার দুই ধারের কক্ষগুলো কিছুটা সামনের দিকে বর্ধিত আকারে নির্মিত। হলঘরের মাঝখানে এবং পিছনে রয়েছে টানা বারান্দা ও সিঁড়ি। দুটি ইমারতই দ্বিতলভাবে নির্মিত। বারান্দাগুলো দুটি গোলায়িত স্তম্ভ সহযোগে নির্মিত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতলের পরিকল্পণা একই রকম। বারান্দার পিছনে হলঘরে প্রবেশের জন্য দরজা নির্মিত হয়েছে। ইমারত দুটির দক্ষিণ পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব কক্ষ দুটিতে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি নির্মিত হয়েছে। সম্মুখের দিকে প্রতিটি তলায় বারান্দার দুই ধারে কক্ষগুলোতে দুটি করে একেক দিকে চারটি করে মোট আটটি জানালা রয়েছে। জানালাগুলোতে ভেনিসিয়ান শাটার ব্যবহৃত হয়েছে। ইমারতের উপরে অনুচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। দোতলার ছাদে নির্মিত হয়েছে একটি সিঁড়ি ঘর।

অলংকরণ

ইমারতটি বাহ্যিকভাবে কিছুটা সাদামাটা ভাবে তৈরি। যে সামান্য অলংকরণ রয়েছে তা ইমারতের ফ্যাসাদে লক্ষ্য করা যায়। বারান্দার সরু স্তম্ভগুলোর শীর্ষ স্টাকো নির্মিত ফুল ও লতা পাতায় সজ্জিত। বারান্দার উপরের দিকে কাঠের ছাইচের আকারে স্টাকো নির্মিত একটি পর্দা রয়েছে। এখানে ভিতরে আলো বাতাস চলাচলের জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইমারতের বারান্দায় দুই পাশের বর্ধিত অংশের দুই পাশে চতুষ্কোণাকার সংলগ্ন স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভগুলোর ভিত্তিতে এক ধরণের খাজকাটা ফুলদানী নকশা লক্ষ্য করা যায়। বারান্দার রেলিং এ cast- iron এর নকশাকৃত গ্রীল ব্যবহৃত হয়েছে। উপরের ছাদ প্রাচীরটি ডিমাকৃতির ফোকরযুক্ত এবং নির্দিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

দুরত্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ সহযোগে গঠিত। চতুষ্কোণ স্তম্ভ গুলোর সম্মুখে লাল ইটের গোলাকার দানা নকশা রয়েছে।

নির্মাণকাল

ইমারতটিতে কোন নির্মাণ তারিখ উল্লেখ না থাকলেও পার্শ্ববর্তী রাজলক্ষী নারায়ণ জিউ মন্দিরে একটি নির্মাণ কাল পাওয়া যায়। সেই অনুযায়ী মন্দিরটি ১৮২৯ সালে নির্মিত। সম্ভবতঃ জমিদার বাড়িটিও ঐ সময়ে নির্মিত হয়েছিল।

রাজলক্ষী নারায়ণ মন্দির

বাসস্থান গুলোর দক্ষিণ পশ্চিমে রাজলক্ষী নারায়ণের মন্দিরটি অবস্থিত। এটি সামনে স্তম্ভ সহযোগে নির্মিত একটি বর্গাকার ইমারত। স্তম্ভগুলো গোলায়িত এবং জোড়াভাবে নির্মিত হয়েছে। স্তম্ভ বরাবর ছাদের উপরেও ক্ষুদ্র চতুষ্কোণাকার ভিত্তির উপরে ক্ষুদ্র গম্মুজ নির্মিত হয়েছে। গম্মুজগুলো খাজকাটা অমলক ধরনের এবং উপরের শীর্ষে দণ্ডযুক্ত। চতুষ্কোণাকার ভিত্তির মাঝখানে রয়েছে স্টাকো নির্মিত ফুলের নকশা। মন্দিরের দুইধার অষ্টকোণাকারভাবে নির্মিত এবং ছাদ থেকে কিছুটা উঁচু পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অংশের ফ্রিজে স্টাকোর তৈরি ফুল ও দানা নকশা রয়েছে। মন্দিরের গর্ভগৃহের উপরে রয়েছে একটি খাজকাটা গম্মুজ। গম্মুজটি ক্ষুদ্র গম্মুজ গুলোর অনুরূপ তবে বৃহদাকারে নির্মিত। মন্দিরের সিড়িগুলো একসময় সাদা মার্বেল পাথরে আচ্ছাদিত ছিল বর্তমানে এর বেশীরভাগই বিলুপ্ত।

কাছারি বাড়ি

মন্দিরের পূর্ব পাশে এবং বাসভবন গুলোর দক্ষিণে মন্দিরের পরিকল্পনায় অনুরূপভাবে কাছারি বাড়িটি নির্মিত দুইধারে অষ্টকোণাকার কক্ষ রেখে মাঝখানে বারান্দাযুক্ত পরিকল্পনায় নির্মিত। কাছারি বাড়িটির বারান্দার স্তম্ভগুলো cast-iron এর তৈরি। বারান্দার পিছনে এবং অষ্টকোণাকার কক্ষগুলো পিছনে রয়েছে আরো তিনটি কক্ষ। বর্তমানে ভবনটি পরিত্যাক্ষ অবস্থায় পড়ে আছে।

আলোকচিত্র ৬৬ঃ যদুনাথ প্রাসাদ, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।

আলোকচিত্র ৬৭ঃ যদুনাথ প্রাসাদ (রাজলক্ষী মন্দির), শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ ।

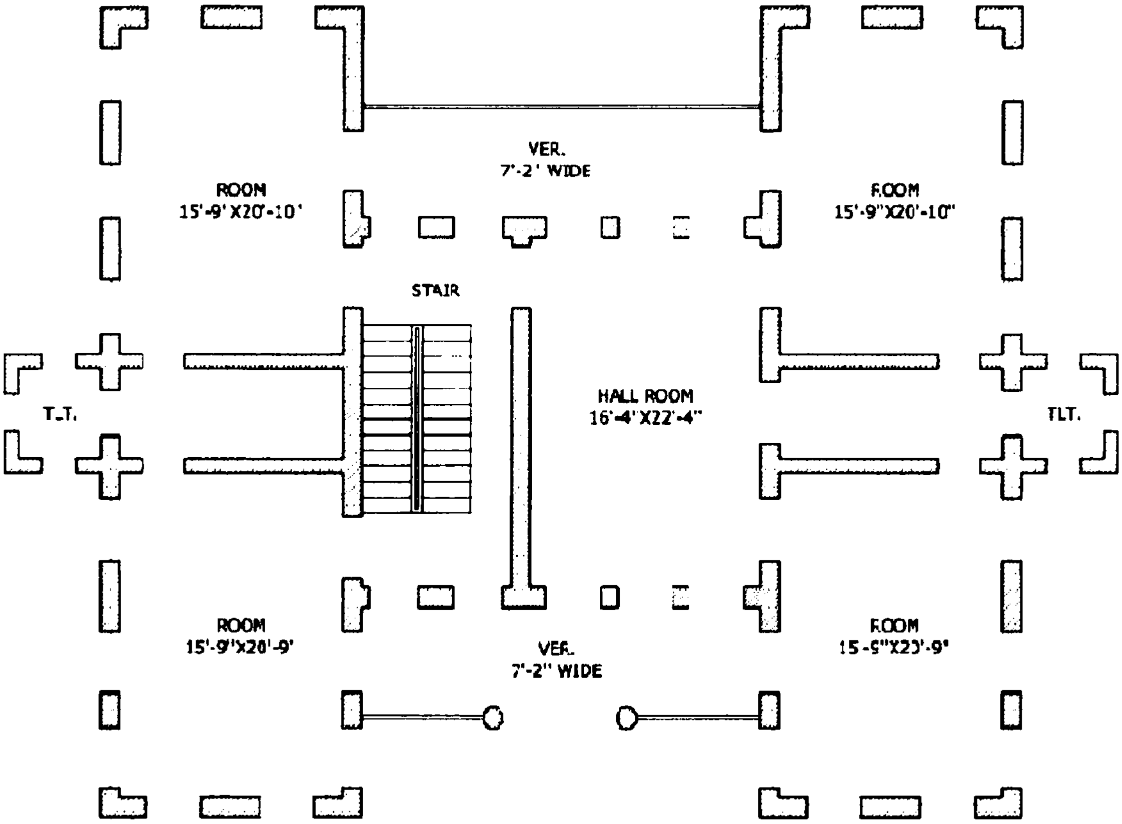

ভূমি নকশা-১৯ ঃ যদুনাথ প্রাসাদ,
শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

স্থাপত্য সমূহের অলংকরণ

ভূমিকা

মানুষ সুন্দরের পুজারী। খাদ্য, পোষাক ও আবাসস্থল নিশ্চিত হওয়ার পর আদিম শিকারী মানুষকে দেখা গেছে তার আশ্রয়ের জায়গাটুকু সৌন্দর্য মন্ডিত করতে। যেমন আমরা দেখি আলতামিরা গুহা চিত্র। আমাদের এই উপমহাদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানুষের আঁকা শিকার দৃশ্য দেখা যায় সেখানকার গিরিগুহায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে আনাতোলিয়ায় সাতালুয়েক (Catalhuyuk) [১] এ তাদের ধর্মীয় স্মৃতি চিহ্নের দেয়ালে চিত্র এবং রিলিফ চিত্র এবং মেসোপটেমিয়া[২] সভ্যতার দেয়ালচিত্রের এবং আবাসস্থল অলংকরণের নিদর্শন পাওয়া গেছে। ইতিহাসে মিশরীয় সভ্যতায় প্রথম পিড়ামিড, মন্দির, রাজপ্রাসাদের দেয়ালে চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও নানা ধরণের রিলিফ ভাস্কর্য ইত্যাদি প্রচলন ঘটে। স্তম্ভগাত্রেও এই সময় থেকেই আমরা পৃথিবীর সমস্ত স্থাপত্যে অলংকরণ দেখতে পাই। গ্রীক ধ্রুপদী[৩] যুগের মন্দির গুলোতেও মিশরীয়দের মতো স্তম্ভরাজি দ্বারা সজ্জিত ছিল এবং মন্দির গুলোতেও চিত্রিত রিলিফ ভাস্কর্যর উদাহরণ রয়েছে। ধ্রুপদী, গ্রীক স্থাপত্যে যে রীতি দাড়িয়ে যায় পরবর্তীতে যা অন্যান্য সভ্যতার হাত ধরে বিশেষকরে রেনেসাঁ ও নিওক্লাসিক্যাল ধারায় ইউরোপীয় উপনিবেশকদের দ্বারা ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করে। ভারতের প্রাগ-ইসলামি যুগের একটি নিজস্ব ধ্রুপদী স্থাপত্যের ধারা গড়ে উঠেছিল যার বিশদ বিবরণ আমরা পাই বস্তুশাস্ত্রে ।[৪] রেনেসাঁ, নিওক্লাসিক্যাল ও ভারতীয় ধ্রুপদী ধারার সংমিশ্রনে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মত বাংলায়ও একটি মিশ্র অলংকরণের প্রবনতা প্রচলিত ছিল।

কোন বস্তুর সৃজন প্রক্রিয়া হলো রীতি যার কিছু শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য থাকে। আর অলংকরণ হলো একটি অতিরিক্ত সংযোজন বস্তু সৃজনে যার কোন উপযোগিতা না থাকলেও চলে। এটা রীতির সৌন্দর্য্য বর্ধনে কাজ করে। অলংকরণের জন্য শূন্য স্থানের প্রয়োজন যা রেখা, বস্তুর পরিধি ও রংয়ের উপর নির্ভরশীল। গুহা চিত্রের যুগ থেকেই অলংকণের নমুনা পাওয়া যায়। প্রতিটি সভ্যতার সাংস্কৃতিক বিকাশে অলংকরণের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। অলংকরণ মানব সভ্যতার অতি সাধারণ একটি বহিঃ প্রকাশ যা মৃৎশিল্প, বস্ত্র শিল্প, দারু ও ধাতব শিল্প,পুঁথি, কারুশিল্প আসবাব ও সর্বোপরি স্থাপত্য শিল্পে লক্ষ্য করা যায়।

---

[১] Banister Fletcher, *A History of Architecture,*(ed.,John Musgrove)[19th Indian,ed.] Delhi, S,K. Jain for CBS Publishers, 1992,p-29.
[২] *Ibid,*p-74
[৩] *Ibid,*pp-109;111
[৪] D.N.Shukla,*Vastu-Sastra*,Vol-1,(Hindu Science of Architechture),New Delhi:Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 1995, p-179-224.

Dhaka University Institutional Repository

অলংকরণ সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১। স্থাপত্যের গঠনগত অলংকরণ

২। অলংকৃত মোটিফ এবং প্যাটার্ন

একটি সফল অলংকরণ সৃষ্টির জন্য কিছু পূর্ব শর্ত রয়েছে। এটি যে বস্তুর উপর অলংকরণ করা হবে তার উপর নির্ভর করে। সফল অলংকরণের বৈশিষ্ট্য গুলো হলো ঃ

১। যেখানে অলংকরণটি করা হবে সেই জায়গাটির সাথে অলংকরণের সুসামঞ্জস্যতা।

২। এটা মূলবস্তুর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করবে।

৩। বস্তুর আকার ও তলের উপর ভিত্তি করে অলংকরণ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

৪। এটা বস্তুর মূল গঠনকে গুরুত্ব দেয় এবং শক্তিশালী করে।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলার স্থাপত্য শিল্পের অলংকণের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল এর পরে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্মীয় জনসাধারণের আগমন এদেশের স্থাপত্য ক্ষেত্রকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে ছিল। এই সূত্রে উনবিংশ বিংশ শতকে বাংলায় স্থাপত্যের ধারায় ইউরোপীয় প্রভাব প্রকট আকার ধারণ করে। তবে ভৌগলিক অবস্থা ও প্রায়োগিক চাহিদার কারণে স্থাপত্য রীতিতে কিছু স্থানীয় চিন্তা ধারার সংযোজন ঘটেছে। উনবিংশ বিংশ শতকে ঢাকার জমিদার বাড়ীগুলোর অলংকরণকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) প্রাচ্য অলংকরণ (২) প্রাতীচ্য অলংকরণ ।

প্রাচ্য অলংকরণ

স্থানীয় অলংকরণের মধ্যে মোগল স্থাপত্য অলংকরণ ঢাকার জমিদার স্থাপত্যে লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে কুঁড়ে ঘরের মতো বাঁকানো ছাদ, ক্ষুদ্র ছত্রী ও গম্মুজ, কলস আকারের ভিত্তি, বাল্বের মতো গম্মুজ ইত্যাদি। এছাড়াও ব্র্যাকেট, জালির কাজ, বাইরের দিকে বের করা কোণাযুক্ত কর্নিশ, স্থানীয় ফুলের নকশা, কাঠের কাজ এসব কিছুই ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি ঢাকার জমিদার বাড়ী গুলোর অলংকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাতীচ্য অলংকরণ

বাইরে থেকে আমদানিকৃত অলংকরণ সমূহ যেমন- ইউরোপীয় ধ্রুপদী রীতিতে অলংকৃত স্তম্ভ, বিভিন্ন ধরণের খিলান, অলংকৃত পেডিমেন্ট, ফ্রিজ, চক্র, অলংকৃত ব্যন্ড, ফেস্টুন, ফিনিয়াল রোজেক্ট, মোল্ডিং প্রভৃতি যা স্থাপত্য অলংকরণে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলাতে প্রতীচ্যিয় ধারা সুস্পষ্ট। এদের মধ্যে কিছু কিছু অলংকরণ

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপত্যের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন স্তম্ভ, খিলান, গম্বুজ, ভল্ট ইত্যাদি। আর কিছু অলংকরণ শুধুমাত্র স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য বর্ধনে সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের মধ্যে পেডিমেন্ট, মোল্ডিং পিনাকেল, ক্রেস্ট, চক্র প্রভৃতি গ্রীক এবং রেনেসাঁ স্থাপত্য রীতিতে এখানকার স্থাপত্যে সংযোজিত হয়েছে।

স্থাপত্য গঠন উপাদান দ্বারা সৃষ্ট অলংকরণ ঃ

ক) **স্তম্ভ** ঃ স্থাপত্যের ভার বহনকারী হিসেবে স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর অলংকৃত ভিত্তি, শীর্ষ এবং শিরালগাত্র এদেরকে নান্দনিক ও শৈল্পিক সৌন্দর্য প্রদান করে। ঢাকার জমিদারবাড়ির নির্মিত স্তম্ভগুলোর স্থানীয় কারিগরদের প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পূর্ব বৈশিষ্ট্য মোগল থেকে পরিবর্তিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ঃ এ সময়ে নির্মিত জমিদার বাড়ি গুলোর করিন্থীয় শীর্ষের সাথে ধ্রুপদী স্থাপত্যের খুব কমই মিল রয়েছে। এ সময়কার স্থাপত্যে পরিবর্তিত ধ্রুপদীরীতির পাশাপাশি প্রাচ্য ধরণের স্তম্ভ শীর্ষ লক্ষ্য করা যায়। (চিত্র-৬৮)

চিত্র -৬৮ ঃ তুসকান স্তম্ভের উপরে উল্টানো কলস ও অমলক এর ব্যবহার, যদুনাথ প্রাসাদ, মুন্সিগঞ্জ।

যেমন- মুন্সিগঞ্জের যদুনাথ প্রাসাদের স্তম্ভ শীর্ষে উল্টানো কলসের উপর অমলকের উপস্থাপন, এছাড়া স্তম্ভ ভিত্তি নির্মাণেও প্রাচ্য ও প্রাতীচ্যের সংমিশ্রন লক্ষ্যনীয়। এদের মধ্যে যদুনাথ প্রাসাদ, রাধারমন প্রাসাদ, রোজগার্ডেন ইত্যাদি স্থাপত্যের স্তম্ভ ভিত্তিতে কলস ও অমলক ভিত্তির ব্যবহার দেখা যায় (চিত্র-৬৯,৭০,৭১)।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -৬৯ ঃ স্তম্ভ ভিত্তিতে কলস এর ব্যবহার, রাধারমণ রায়ের বাড়ী, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

চিত্র -৭০ ঃ স্তম্ভ ভিত্তিতে অমলক এর ব্যবহার, রোজ গার্ডেন, ঢাকা।

চিত্র -৭১ ঃ স্তম্ভ ভিত্তিতে কলস এর ব্যবহার, বালিয়াটি প্রাসাদ, মানিকগঞ্জ।

তবে বালিয়টি, রোজগার্ডেনের স্তম্ভ ভিত্তিতে উঁচু বর্গাকারে বা আয়তাকার ভিত্তির ব্যবহারটি প্রাতীচ্যের উদাহরন। স্তম্ভগাত্র অধিকাংশ সময়ে গোলাকার তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিয়াল গাত্রও দেখা যায়। যেমন বালিয়াটি প্রাসাদের স্তম্ভ শিরাল গাত্রাকারে নির্মিত।(চিত্র-৭২)

চিত্র -৭২ ঃ উচ্চ স্তম্ভ ভিত্তি, বালিয়াটি প্রাসাদ, মানিকগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) **খিলান ঃ** উনবিংশ শতকের ঢাকার জমিদার বাড়িগুলোতে বিভিন্ন ধরনের খিলানের প্রয়োগ দেখা যায়। সরু করিন্থীয় কলামের উপর অর্ধ গোলাকার খিলান পথ এসময়কার জমিদার বাড়িগুলোর বারান্দা এবং প্রাসাদের অন্যান্য স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে- যা ভারতের বৃটিশ সরকারি ভবন গুলো থেকে উদ্ভব হয়েছে বলে মনে হয়। এই ধরনের খিলান গুলোর কোথাও কোথাও উপনিবেশিক শাসকদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- খিলানের কী স্টোনের স্থানে সিংহের মুখাবয়ব ও মুকুট অলংকরণের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা যায় (চিত্র-৭৩)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খিলানের কি স্টোন বৃহদাকারে নির্মানের উদাহরণ পাওয়া যায়। আহসান মঞ্জিলের খিলানগুলি এভাবে নির্মিত হয়েছে। এই সময় খিলান অলংকরণে খিলানের প্রান্ত রেখা ধরে বিভিন্ন লতানো নকশা ও ফুলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মুরাপাড়া জমিদারবাড়ি, রাধারমন রায়ের বাড়ি, রোজগার্ডেন ইত্যাদি স্থানে অলংকরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি মূর্ত হয়ে উঠেছে। খিলান নির্মাণেও বিভিন্নতা ইমারতের নান্দনিকতা বৃদ্ধি করেছে। কখনো অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলান, ইংলিশ গথিক খিলান, ত্রিখাজ বিশিষ্ট খিলান নির্মাণের পাশাপাশি খিলান পটহকে লোহার গ্রীল দিয়ে আবদ্ধ করে বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত কাচের শার্সি স্থাপনের মাধ্যমে খিলানের আলংকারিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। কোন কোন স্থানে যেমন- রোজ গার্ডেনের দ্বিতীয় তলার বারান্দার খিলান সজ্জায় এর উপরে ত্রিকোনাকার পেডিমেন্টের ব্যবহারও চোখে পড়ে।

চিত্র -৭৩ ঃ খিলানের কি স্টোনে মুকুট ও সিংহের মুখাবয়ব উপনিবেশিক শাসনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, রাধারমণ রায়ের বাড়ী, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

কখনও কখনও স্থানীয় অলংকরণ হিসাবে আনারস ডালিমফুল, নয়ন তারা ফুল, সহ দেশীয় ফুলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় (চিত্র-৭৪)।

চিত্র -৭৪ ঃ আনারস সহ দেশজ উদ্ভিদের উপস্থাপন, ঠাকুর দালান, মুরাপাড়া জমিদার বাড়ী নায়ারনগঞ্জ।

মোগল স্থাপত্যের প্রভাব খাঁজকাটা খিলানের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠে। অপর দিকে ইংলিশ গথিক খিলানের ব্যবহারে নব্য ধ্রুপদী স্থাপত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট

(গ) **গম্মুজ ঃ** গম্মুজ মুসলিম স্থাপত্যের একটি পরিচয় বহনকারি উপাদান হলেও উনবিংশ বিংশ শতকে ঢাকায় বেশ কিছু জমিদারের বাড়িতে গম্মুজের ব্যবহার হয়েছে। তবে এদের সবগুলোই ইউরোপীয় ধ্রুপদী স্থাপত্যের পরিচয় বহন করে। এদের মধ্যে আহসান মঞ্জিল, ভাওয়াল প্রাসাদ, রোজগার্ডেন প্রভৃতি প্রাসাদের গম্মুজের কথা উল্লেখ করা যায়। আহসান মঞ্জিলের গম্মুজটি শিরাল এবং উঁচু ড্রামের উপর নির্মিত (চিত্র-৭৫)।

চিত্র -৭৫ ঃ উঁচু ড্রামের উপর শিরাল গম্মুজ, আহসান মঞ্জিল, ঢাকা।

চিত্র -৭৬ ঃসরু স্তম্ভের উপর গম্বুজ, রোজগার্ডেন, ঢাকা।

ড্রামের চারিদিকে অলংকরণ হিসেবে আয়ওনীক ধরনের সরু স্তম্ভ রয়েছে। রোজগার্ডেনের গম্বুজটিও শিরাল ও ছত্রী আকারে নির্মিত। গম্বুজটি সরুস্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত আটটি খিলানের উপর নির্মিত হয়েছে (চিত্র-৭৬)। আহসান মঞ্জিলের গম্বুজের নীচে এবং স্তম্ভগুলোর উপরে একসারি ইটের নকশা লক্ষ্য করা যায়। গম্বুজের ভার বহণকারী স্তম্ভগুলোর শীর্ষ আওনীক ধরণের প্যাঁচানো নকশায় সজ্জিত।

(ঘ) **ভিত্তি ঃ** ভিত্তি স্তরে অলংকরণে মূলত: প্যানেল ও মোল্ডিং যুক্ত নকশা ব্যবহৃত হয়েছে। উচু ভিত্তিযুক্ত প্রাসাদগুলোতে কখনও একক বা একের অধিক স্তরের প্যানেল অথবা বদ্ধ খিলান দেখা যায় (চিত্র-৭৭)।

চিত্র -৭৭ ঃ ভিত্তি ভুমিতে বদ্ধ খিলানের ব্যবহার, আহসান মঞ্জিল, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) **বন্ধনী বা ব্রাকেট ঃ** ব্রাকেট মুলতঃ একটি স্থাপত্য গঠন উপাদান। তবে উনবিংশ বিংশ শতকে ঢাকার জমিদার বাড়ি গুলোতে এদের উপস্থাপন অনেকটা অলংকরণের পর্যায়ে পড়ে। বেশ কিছু জমিদার বাড়ীতে ব্রাকেটগুলো চক্রাকার। প্রাণীর প্রতিকৃতি অথবা জ্যামিতিক নকশাসহ বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে শ্রীফলতলী জমিদারবাড়িতে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই ধরনের ব্রাকেট ভারতীয় মোগল ধাঁচের অনুকরনে নির্মিত (চিত্র-৭৮)।

চিত্র - ৭৮ ঃ বন্ধনী বা ব্রাকেট, শ্রীফলতলী জমিদারবাড়ী, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

স্থাপত্যের সজ্জাগত অলংকরণ

ক) পেডিমেন্ট ঃ পেডিমেন্ট মূলতঃ গ্রীক, রোমান এবং রেঁনেসাযুগের অঙ্গ সজ্জার উপাদান হিসেবে স্থাপত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। বৃটিশ শাসনামলের প্রথম থেকে কলকাতার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী ইমারতগুলোতে পেডিমেন্ট প্রায় অপরিহার্য উপাদান হিসাবে ব্যবহৃতহয়েছে।[১] পরবর্তীতে জমিদার বাড়ীগুলোতেও পেডিমেন্টের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ বারান্দার উপরে ছাদ প্রাচীরের মাঝ বরাবর এবং কখনও জানালার উপরে পেডিমেন্টের ব্যবহার হয়েছে। ত্রিকোনাকার এবং গোলাকার দুই ধরনের

---

[১] Sten Nilsson, *European Architecture in India 1750-1850*, Faber and Faber 1968, PL-67.

পেডিমেন্ট লক্ষ্য করা যায়। উনিশ বিশ শতকে ঢাকায় জমিদারবাড়ি গুলোর মধ্যে যে সব পেডিমেন্ট অঙ্গ সজ্জায় ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে ত্রিকোনাকার পেডিমেন্টের সংখ্যই বেশী। যেমন রূপলাল হাউজের ও মুড়াপাড়া জমিদার বাড়ীর ত্রিকোন পেডিমেন্ট (চিত্র-৭৯)।

চিত্র -৭৯ ঃ পেডিমেন্ট, মুরাপাড়া জমিদার বাড়ী, নারায়নগঞ্জ।

পেডিমেন্টের মধ্যে স্থানীয় বিবর্তনে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মাথার মুকুট বা তাজের নকশায় এই সময়ে অনেক জমিদার বাড়িতেই পেডিমেন্ট নির্মিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ: বালিয়াটী জমিদারবাড়ি (চিত্র-৮০)।

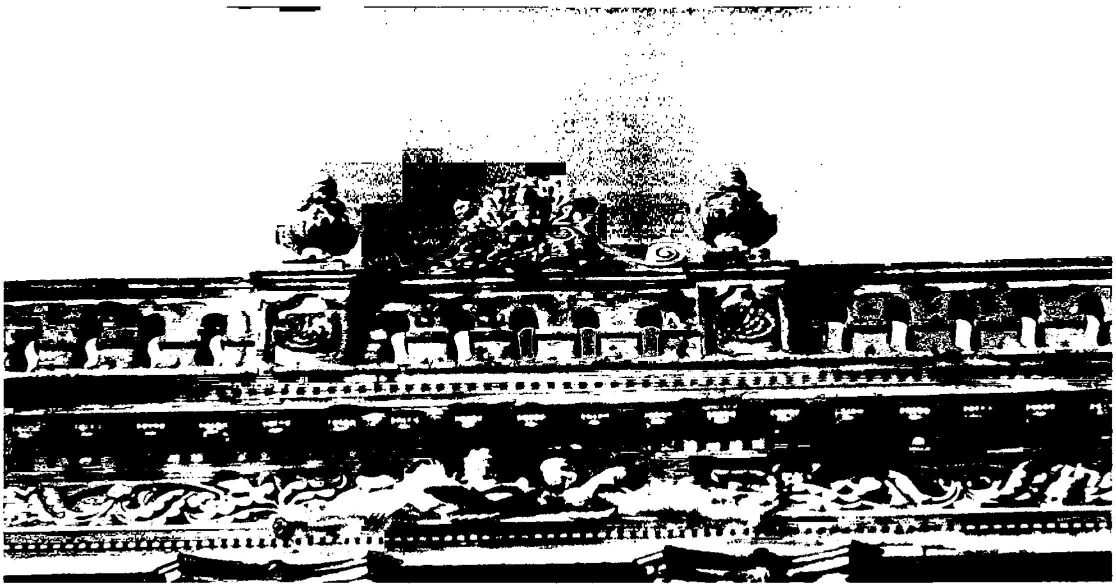

চিত্র -৮০ ঃ মুকুট বা তাজ নকশা পেডিমেন্ট, বালিয়াটি জমিদার বাড়ী, মানিকগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারগন নিজেদের রাজকীয় ভাব প্রকাশের জন্য সম্ভবত: স্থাপত্যে এই ধরনের পেডিমেন্টের ব্যবহারে উৎসাহী হয়েছিলেন। এভাবে ইউরোপীয় ধ্রুপদীযুগের স্থাপত্যের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি বাংলার জমিদারদের রাজকীয় ভাব প্রকাশের একটি মাধ্যমে পরিণত হয়।এছাড়া পাশ্চাত্যের স্থাপত্যিক উপাদান, মোটিভ ইত্যাদির ব্যবহার বৃটিশ শাসকদের প্রতি আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

(খ) **কর্ণার** ঃ উনবিংশ বিংশ শতকের ঢাকার জমিদার বাড়িগুলোর অলংকরণের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটি ইমারতের কোনাগুলোকে সরু গোলাকার স্তম্ভ, খাজকাটা চৌকোনা স্তম্ভ, চতুষ্কোনাকার স্তম্ভে ইটের উদগত ও অনুপ্রবিষ্ট নকশা ইত্যাদির ব্যবহার (চিত্র-৮১)।

চিত্র -৮১ ঃ কর্ণারে চতুস্কোনাাকার স্তম্ভে ইটের উদগত অনুপ্রবিষ্ট নকশা, আহসান মঞ্জিল, ঢাকা।

এই সমস্ত স্তম্ভ গুলোর ভিত্তি প্রায়শই চতুষ্কোনাকার তবে অনেক ক্ষেত্রেই কলস আকারের ভিত্তিও লক্ষ্য করা যায়।

(গ) **মোল্ডিং** ঃ ধ্রুপদী ও রেঁনেসা যুগের স্থাপত্যের ডেনটিল ও মোল্ডিং নকশা বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যা পরবর্তীতে উপমহাদেশের জমিদারবাড়ি গুলোতে পুনঃ পুনঃ অনুসৃত হয়েছে। ডেনটিল এবং মোল্ডিং সাধারণ স্থাপত্যের কর্নিশের অংশ অলংকরণে বিভিন্ন প্রাসাদে বিভিন্নভাবে এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় । উনিশ-বিশ শতকের ঢাকার জমিদারবাড়ির ফ্রিজ, খিলানের প্রান্তরেখা, ক্ষুদ্র মিনারগুলোর চতুস্পার্শ্ব, ভাস্কর্যের ভিত্তি এবং পেডিমেন্ট ইত্যাদি স্থানে মোল্ডিং ব্যবহৃত হয়েছে। অলংকরণের ক্ষেত্রে ফুল, লতানো নকশা, মনুষ্য মুখায়বব বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। এর মধ্যে মুড়াপাড়া জমিদারবাড়ি, রাধারমণ রায়ের বাড়ির

Dhaka University Institutional Repository

ফ্রিজ অলংকরণে ফুল ও লতার মোল্ডিং ব্যবহৃত হয়েছে (চিত্র-৮২) । বালিয়াটি জমিদারবাড়ির ফ্রিজে লতানো নকশার মাঝে পরির প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করা হয়েছে (চিত্র-৮৩) ।

চিত্র -৮২ ঃ ডেনটিল ও মোল্ডিং নকশা, মুরাপাড়া জমিদার বাড়ী, নারায়নগঞ্জ ।

চিত্র -৮৩ ঃ লতানো নকশার মাঝে উৎকীর্ণ পরির প্রতিকৃতি, বালিয়াটি, মানিকগঞ্জ ।

(ঘ) **জালি নকশা** ঃ সিমেন্ট ও লোহার জালি নকশা উনিশ-বিশ শতকে ঢাকার বেশীর ভাগ স্থাপত্যে লক্ষ্য করা যায়। কাঠের জালি নকশা সাধারণতঃ বারান্দার ও জানালার উপরের অংশে ব্যবহার করা হতো। কাঠের জালি নকশা উপনিবেশিক আমলে প্রাথমিক পর্যায়ে সূর্যের আলো, বৃষ্টির ছাট নিরোধক বা সেড হিসেবে উপনিবেশিক স্থাপত্য গুলোতে প্রয়োগ করা হত।[১] পরবর্তীকালে বিশেষ করে বিশ শতকের দিকে এই কাঠের পরিবর্তে সিমেন্টের জালি নকশা এক্ষেত্রে জনপ্রিয় হয়েছিল (চিত্র-৮৪)।

চিত্র -৮৪ ঃ সূর্যের আলো ও বৃষ্টির ছাট নিরোধক বা সেড, যদুনাথ প্রাসাদ, মুন্সিগঞ্জ।

(ঙ) **লোহা ও ধাতুর কাজ** ঃ ঢাকার উপনিবেশিক স্থাপত্যে ধাতু বিশেষ করে লোহার অলংকরণ জমিদার বাড়িগুলোতে জনপ্রিয় ছিল। সাধারণত প্রধান প্রবেশ ফটকগুলো জ্যামিতিক ও লতানো নকশায় অলংকৃত লোহা দ্বারা নির্মিত হতো (চিত্র-৮৫)।

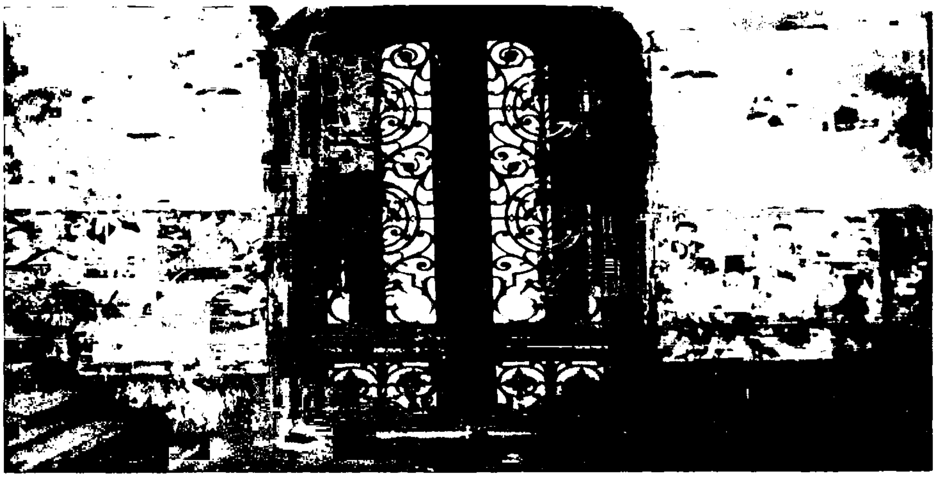

চিত্র -৮৫ ঃ উদ্ভীজ নকশায় কাষ্ট আয়রনের দরজা, মুরাপাড়া জমিদার বাড়ী, নারায়নগঞ্জ।

---

১. Sten Nilsson, *ibid,* p. 180.

Dhaka University Institutional Repository

ধাতুর অলংকরণ আরো লক্ষ্য করা যায় প্রাসাদ গুলোর রেলিং, সিঁড়ি, স্তম্ভ, প্যারাপেটের উপরিঅংশ ইত্যাদি জায়গায় বারান্দার রেলিং (চিত্র-৮৬)

চিত্র -৮৬ ঃ ফ্যানলাইটে কাষ্ট আয়রনের ফ্রেম, মুরাপাড়া জমিদার বাড়ী, নারায়নগঞ্জ।

এবং সিড়িতে নকশায় বিভিন্নতা চোখে পড়ে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে খিলানের উপরি অংশ, লাইট পোষ্ট (চিত্র-৮৭)

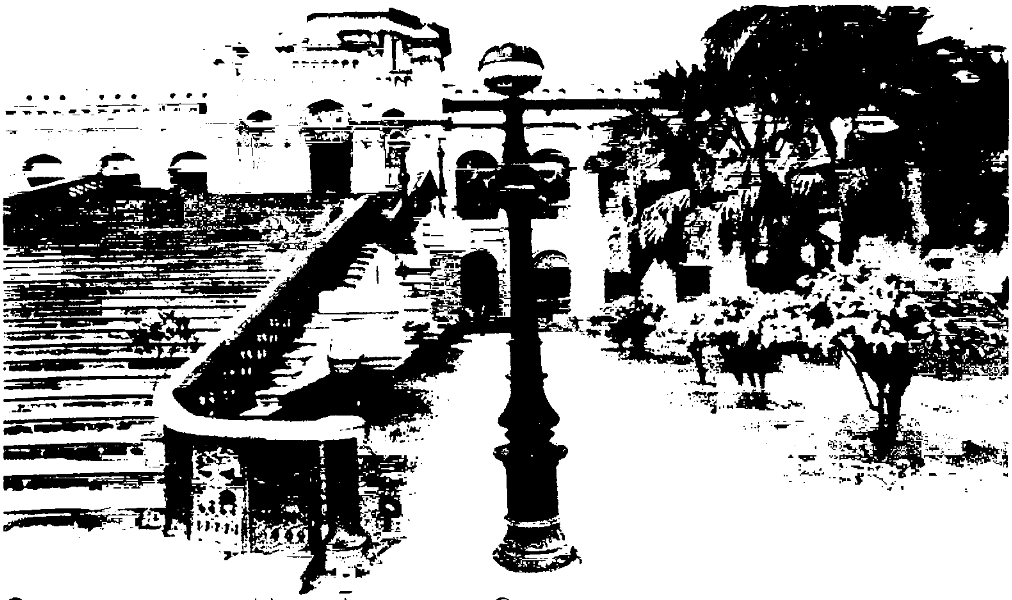

চিত্র -৮৭ ঃ লোহার লাইট পোস্ট, আহসান মঞ্জিল, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ও ফ্যান লাইটের ফ্রেম হিসেবে অলংকৃত ধাতু ব্যবহৃত হয়েছে। স্তম্ভ গুলোতে অলংকরণ সাধারত: এর নিম্ন ও উপরি অংশে লক্ষ্য করা যায়।

(চ) **ভাস্কর্য ঃ** জমিদার বাড়িগুলোর প্রাঙ্গন ও ফ্যাসাদে প্রায়শই ভাস্কর্যের ব্যবহার দেখা যায় যা এ সময়কার জমিদারদের শিল্প অনুরাগের পরিচয় বহন করে। রোজগার্ডেনের অঙ্গনে নির্মিত ভাস্কর্যগুলো গ্রীক ভাস্কর্যের অনুকরণে তৈরী। এছাড়া মানুষ ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি তোরণ, ছাদ প্রাচীর, মন্দির ইত্যাদি জায়গায় লক্ষ্য করা যায়। মানুষের মুখায়ব, উড়ন্ত ঈগল, পৌরানিক দেব-দেবী ও সিংহ মূর্তি সাধারণভাবে ভাস্কর্য উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (চিত্র-৮৮)।

চিত্র -৮৮ ঃ ভাস্কর্য, রোজগার্ডেন, ঢাকা।

এই ভাস্কর্যগুলো কখনও স্বতন্ত্রভাবে এবং কখনও রিলিফ আকারে স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে। প্রবেশ তোরণের দুইপাশে সিংহ প্রতিকৃতির সংযোজন ছিল সম্ভ্রান্ত জমিদারের অভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ (চিত্র-৮৯)।

Dhaka University Institutional Repository

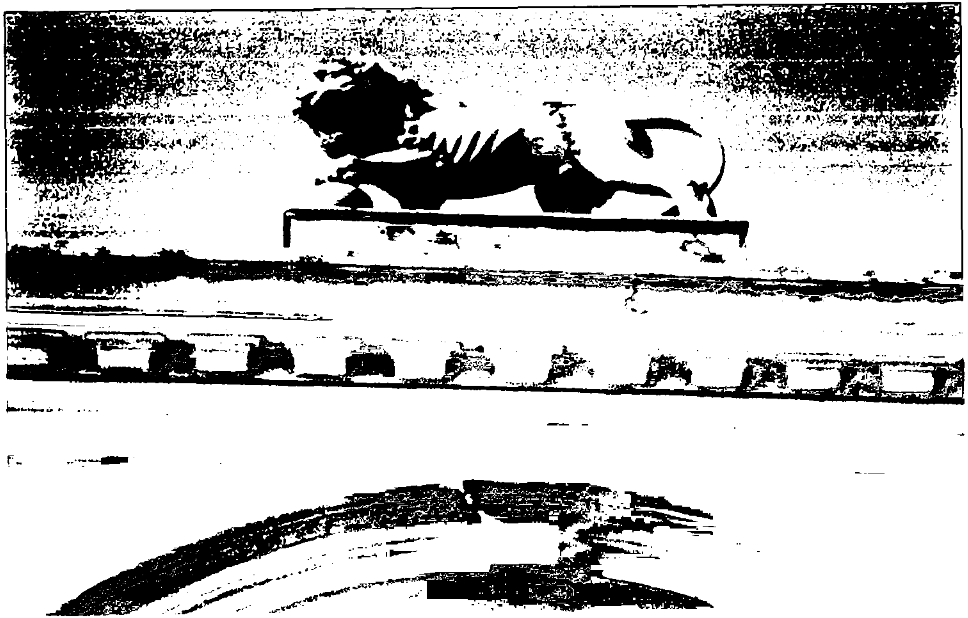

চিত্র -৮৯ ঃ প্রবেশ তোরণের উপরে সিংহ প্রতিকৃতি, বালিয়াটি প্রাসাদ, মানিকগঞ্জ।

(ছ) **ট্যাবলেট ঃ** ট্যাবলেটের ব্যবহার সাধারণত স্থাপত্যের ভিত্তি দরজা, খিলান, পেডিমেন্ট এবং ছাদের উপরিভাগ এবং ছাদ প্রাচীর অংশে ব্যবহৃত হয়েছে অলংকৃত এই ট্যাবলেট গুলো বিভিন্ন আকারে

নির্মিত হয়েছে। যেমন- গোলাকার, বর্গাকার বা অন্যান্য ধরণের ট্যাবলেট নকশা জমিদার বাড়িগুলোর সৌন্দর্য্য বর্ধনে বিশেষ ভূমিকা রাখে (চিত্র-৯০)।

চিত্র -৯০ ঃ ট্যাবলেট অলংকরণ, রোজগার্ডেন, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ট্যাবলেট অলংকরণে জ্যামিতিক নকশার পাশাপাশি প্রাকৃতিক উপাদান যেমন- ফুল ও লতা পাতার নকশা লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে পদ্ম, গোলাপ ও একান্থাস পাতার নকশার ব্যবহারই বেশী। এছাড়া ঢাল, মুকুট, মস্তক ইত্যাদি নকশাও জনপ্রিয় হয়েছিল।

গাত্র অলংকরণের জন্য ব্যবৃহত নকশা

(ক) রেখা, ব্যন্ড ও অলংকৃত মোটিভ ঃ রেঁনেসা স্থাপত্যের অলংকরণে প্রাসাদের একঘেয়েমি ভাব দুর করার জন্য প্রায়শই উলম্ব ও আড়াআড়ি রেখা ও ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়েছে। প্লাস্টারের মাধ্যমে দেয়ালে উদগত ও অনুপ্রবিষ্টভাবে সৃষ্টির প্রবনতা এ সময়কার অনেক প্রাসাদেই লক্ষ্য করা যায়। দেয়াল গাত্রে আড়াআড়ি জ্যামিতিক ও ফুলেল নকশা ব্যবহার বেশ জনপ্রিয় ছিল। এছাড়া খিলানের উপরিঅংশ, পেডিমেন্ট ইত্যাদি স্থানে, ফেস্টুন, রিবন আঙ্গুরলতা ইত্যাদি অঙ্গ সজ্জায় ব্যবহৃত হয়েছে।

(খ) Texture(দেওয়াল, মেঝে ইত্যাদির উপরতলের আস্তরন) : অলংকরণে চিনিটিকরী, মোজাইক, স্টাকো, নকশা দেয়াল গাত্র ও মেঝে নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে মোজাইক ছিল অধিক জনপ্রিয়, জ্যামিতিক ও ফুলের নকশা এক্ষেত্রে ব্যবহার হতে দেখা যায়। চিনিটিকরীর কাজ মোগল আমলে উত্তর ভারতে শুরু হলেও উপনিবেশিক আমলে বাংলায় এর বহুল ব্যবহার হয়েছে। আলোচ্য সময়ের প্রাসাদ অলংকরণে চিনিটিকরীর ব্যবহার বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। জমিদার প্রাসাদের ছাদগুলো নানাভাবে অলংকৃত ছিল। এর মধ্যে ছাদ নির্মাণে কাঠের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেণখযোগ্য। এভাবে রং, সজ্জা ও নির্মাণে এ সময়কার স্থাপত্যগুলো প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের সংমিশ্রনে গড়ে উঠেছিল।

(গ) রং ঃ স্থাপত্যের অলংকরণে রংয়ের ব্যবহার বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল । বাংলাদেশের জমিদারবাড়ি গুলো রঞ্জিত করণে খনিজ ও উদ্ভিজ্য উভয় প্রকারের রং ব্যবহার হয়েছে। এর মধ্যে indigo(নীল), virmilion(সিদুঁরের রং), saffron(হলুদ), creamson(গোলাপী লাল), ochre (গিরী মাটির রং), এ সময় স্থপতিদের পছন্দের রং ছিল। এছাড়া চুন সাধারণতঃ স্থাপত্য গাত্র সাদা করণে ব্যবহৃত হতো যাকে চুনামও বলা হতো। অনেক জমিদার বাড়িতে খিলানের উপরে ব্যবহৃত ফ্যান লাইট গুলো লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি রংএ রঞ্জিত করা হতো। এছাড়া জানালা ও দরজা রংয়ের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

মুসলিম পূর্ব যুগ হতে বাংলায় জমিদারি প্রথা প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রকে নিয়মিত ভূমি রাজস্ব প্রদান ও সৈন্য সরবরাহের শর্তে ভূমি বন্দোবস্ত লাভ করে সামন্তরাজ বা সামন্ত অধিপতিগণ মহারাজাধিরাজের অনুগত থাকতেন। এই শ্রেণীর ভূম্যধিকারীদের মধ্যে অনেকেই সাধারণ প্রজাবর্গের উপর তাদের প্রভূত্ব বিস্তার করে বিশেষ মর্যদা সম্পন্ন ও ক্ষমতাশীল অভিজাত শ্রেণীতে পরিনত হয়। মুসলিম শাসনামলেও ভূমি ব্যবস্থায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এসব বংশগত ভূম্যাধিকারীগণ এ সময় বিভিন্ন পদবী যেমন- ভূইয়া, ভৌমিক, রাজা, চৌধুরী, চাকলাদার, বিষয়ী ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিলেন। মুসলিম শাসনামল হতে এসব ভূস্বামীগণ 'জমিনদার' এবং পরবর্তীতে 'জমিদার' হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। মোগল আমলে রাজনৈতিক কারণে রাজধানী হতে দূরবর্তী এলাকায় বৃহৎ জমিদারের উপস্থিতি বিপদজনক বিবেচিত হওয়ায় এ সকল অঞ্চলে ক্ষুদ্র জমিদারী গঠনের অনুমতি দেওয়া হয়। ঢাকা জেলা মোগল বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চলে ক্ষুদ্র জমিদারদের সংখ্যাই বেশী, বিশেষ করে উনিশ-বিশ শতকে ব্যবসায়ীদের হাতে প্রচুর অর্থ আগমণের ফলে ঢাকার জমিদারদের একটি বিরাট অংশ ছিলেন ব্যবসায়ী জমিদার। এরা মূলতঃ ব্যবসায়ী হলেও পরবর্তীতে ভূমি ক্রয় করে জমিদারী ক্রয়ের মাধ্যমে নব্য জমিদারে পরিণত হন। ঢাকার জমিদারদের মধ্যে বালিয়াটির জমিদারগণ, আব্দুল গণি, রূপলাল, নিকি পোগজ, আরাতুন ছিলেন এই ধরণের ব্যবসায়ী জমিদার। এছাড়া ঢাকা শহরের বাইরে গাজীপুরের ভাওয়াল জমিদার, মানিকগঞ্জের শিবালয়, মুরাপাড়া এরা কেউ কোন বৃহৎ বা প্রাচীন জমিদার ছিলেন না বরং তারা সকলেই ছিলেন নব্য প্রতিষ্ঠিত ভূমিস্বত্তাধিকারী। এই সকল নব্য জমিদারগণ তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও আভিজাত্য প্রকাশের লক্ষ্যে নিজেদের আবাসস্থল গুলো নির্মাণে বিশেষ সচেতনতা অবলম্বন করেন এবং তৎকালীন ইউরোপীয় শাসক শ্রেণীর স্থাপত্য চিন্তাকে নিজেদের নির্মাণে প্রতিফলিত করতে প্রয়াসী হন।

উনিশ-বিশ শতকের পূর্বে নির্মিত ঢাকা জেলায় কোন জমিদার বাড়ি টিকে নাই। উপরোক্ত সময় নির্মিত জমিদারবাড়ী গুলোতে যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা জেলায় যে সমস্ত জমিদারবাড়ীগুলো পাওয়া যায় সেগুলোকে পরিকল্পনার দিক দিয়ে মূলত দুইভাগে ভাগ করা যায় (ক) উন্মুক্ত অঙ্গনকেন্দ্রিক প্রাসাদ ও (খ) হলঘর কেন্দ্রিক প্রাসাদ। অঙ্গন এসময়কার জমিদার বাড়ীগুলোর প্রায় অপরিহার্য অংশ ছিল। উন্মুক্ত অঙ্গন কেন্দ্রিক প্রাসাদে সম্মুখ অঙ্গন ও ভিতর অঙ্গন উভয়ই লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ মুরাপাড়া জমিদারবাড়ি, ভাওয়াল প্রাসাদ, তেওতাঁ জমিদারবাড়ি ইত্যাদিতে এই ধরনের বহিঃ ও ভিতর অঙ্গনের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। অপর দিকে রোজ গার্ডেন, আহসান মঞ্জিল বা পানামের জমিদার বাড়ি গুলো হলঘর কেন্দ্রিক হলেও প্রাসাদের সামনে বিস্তৃত অঙ্গন চোখে পড়ে। সাধারণত এই সকল প্রাসাদ নির্মাণে ভুমি মালিকের রুচি ও এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপযোগিতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। উপনিবেশিক আমলে একটি আর্দশ প্রাসাদ সাধারণ দুইভাগে বিভক্ত থাকতো। যথা ঃ

১. বহিঃবাড়ি যা কাছারী, প্রবেশদ্বার ও মূল প্রাসাদের মধ্যবর্তী অংশ অতিথিশালা, নহবতখানা ইত্যাদি সহযোগে গঠিত হয়।

২. ভিতরবাড়ি বা অন্দরমহল বসবাসের ঘর ও একেবারে পারিবারিকভাবে ব্যবহার্য স্থান নিয়ে গঠিত হত। প্রাসাদ নির্মাণ পরিকল্পনায় বাংলায় নির্মিত জমিদারবাড়ি গুলোতে গ্রাম বাংলার বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনাকে অনুসরণ করা হয়েছে। মাঝখানে উঠান রেখে এর চারদিকে কাছারী, ঠাকুর দালান, বসবাসের স্থান ইত্যাদি নির্মাণ, বাড়ি সংলগ্ন পুকুর, গোশালা, আস্তাবল ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই গ্রাম বাংলার শ্বাসত গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা উপনিবেশিক আমলে নির্মিত জমিদারবাড়ি গুলোকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে উপনিবেশিক আমলে নির্মিত হিন্দু জমিদারবাড়ি গুলোতে ভারতের বাস্তুশাস্ত্রের প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষনীয়। মুরাপাড়া, তেওঁড়া, ভাওয়াল জমিদারবাড়ি গুলোতে বাস্তুশাস্ত্রকে অনুসরণ করা হয়েছে। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে জমিদার বাড়ীগুলোর ঠাকুর দালানটি অঙ্গনের উত্তরে নির্মিত হয়েছে। যাদের প্রবেশ পথ পূর্বমূখী। ভুমি পরিকল্পনায় চারটি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে- (১) বহি:বাড়ি (২) মন্দির/ মসজিদ (৩) অন্দর মহল (৪) সহযোগি স্থাপনা। এই চারটি স্থাপনা ছাড়াও দৈনন্দিন কার্য সমাধা ও পানির উৎস হিসাবে অঙ্গন ও জলাশয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জমিদার বাড়িকে আকর্ষনীয় ও দৃষ্টিনন্দন করার লক্ষ্যে ভূমি পরিকল্পনায় মূল প্রাসাদের চারিদিকে সবুজলনের ব্যবহার লক্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ পরিকল্পনায় নদী গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করা হয়েছে। এ সময় নির্মিত ঢাকার বেশীর ভাগ জমিদার বাড়ি নদীর তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত। যাতায়াত, প্রতিরক্ষা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নদীর ভূমিকাকে মাথায় রেখে প্রাসাদ পরিকল্পনায় নদী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আহসান মঞ্জিল, রূপলাল হাউজ, বুড়িগঙ্গা নদী, মুরাপাড়া জমিদারবাড়ি শীতলক্ষ্যা নদী, তেওতাঁ জমিদারবাড়ি যমুনা নদীর তীরে নির্মিত।

বাংলাদেশের জমিদার বাড়িগুলোতে সাধারণত দুই ধরনের প্রবেশ পথ দেখা যায়, (ক) আনুষ্ঠানিক প্রবেশ তোরণ (খ) সাধারণ প্রবেশ দ্বার।

ক. **আনুষ্ঠানিক প্রবেশ তোরণ** : এটি জমিদারবাড়িতে ঢোকার আনুষ্ঠানিক প্রবেশ পথ। মোগল আমল হতে এই ধরণের প্রবেশ দ্বারের উপস্থিতি বাংলায় দেখা যায় যা 'নহবতখানা' নামে পরিচিতি ছিল। রাজা বা বাদশাহের আগমনের সংকেত হিসাবে এসব 'নহবতখানা' হতে সানাই বা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজানো হত। উনিশ বিশ শতকের ঢাকার জমিদার বাড়িগুলোতে এ ধরণের 'নহবতখানার' উপস্থিতি না থাকলেও আনুষ্ঠানিক প্রবেশ পথ হিসাবে সিংহদ্বার বা খিলানযুক্ত দ্বার নির্মিত হয়েছে। বালিয়াটি জমিদার বাড়ীতে সিংহদ্বার ও আহসান মঞ্জিল, ভাওয়াল প্রাসাদে সাধারণ খিলানযুক্ত আনুষ্ঠানিক প্রবেশ দ্বার আছে। আনুষ্ঠানিক প্রবেশ দ্বারের পর মূল ভবনে প্রবেশ করার জন্য একটি মূল ফটক প্রত্যেক জমিদার বাড়িতে বেশ জাঁকালো ভাবেই নির্মিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এসকল প্রবেশদ্বারের সামনে নির্মিত হয়েছে গাড়ি বারান্দা।

খ. **সাধারণ প্রবেশ দ্বার** : আনুষ্ঠানিক প্রবেশ দ্বার ছাড়াও প্রাসাদে মহিলা ও গৃহপরিচারকদের ঢোকার জন্য খিড়কি বা দরজা থাকতো। প্রায় প্রতিটি জমিদার বাড়িতে এই ধরণের দরজা রয়েছে।

জমিদার বাড়িগুলো নির্মাণে সর্দল ও খিলান ভিত্তিক উভয় প্রকাররীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত মূল প্রবেশ দ্বার ও বারান্দায় খিলানের ব্যবহার হয়েছে এবং দরজা ও ছাদ নির্মাণে সর্দল পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। নির্মাণ সহযোগী যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োগ এসময়কার জমিদারবাড়ি গুলোতে দেখা যায় তা হল-

স্থাপত্য নির্মাণে স্তম্ভ সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উনিশ-বিশ শতকে ইউরোপীয় উপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে এদেশে কিছু নতুন রীতির স্তম্ভ যেমন- ডরিক (Doric),

আয়নীক (Ionic), করেন্থিয় (Corinthian) ও মিশ্ররীতির স্তম্ভ বহুলভাবে চর্চিত হয়েছে। ঢাকার জমিদার বাড়ি গুলোর মধ্যে ভাওয়াল প্রাসাদ ও বলিয়াটি জমিদারবাড়িতে ডরিকরীতির স্তম্ভ দেখা যায়। গ্রীকরীতির ডরিক স্তম্ভ অধিক ভার বহনের জন্য বিশেষ উপযোগী। আয়নীয় রীতির স্তম্ভগুলোর মাথায় প্যাচ বিশিষ্ট অলংকরণ থাকে। আহসান মঞ্জিল, তেওঁতা জমিদারবাড়িতে এই ধরণের স্তম্ভের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। করেন্থিয় স্তম্ভ বাংলাদেশের সর্বত্রই জনপ্রিয় ছিল। ঢাকার জমিদার বাড়ি গুলোর মধ্যে তেওতাঁ, ভাওয়াল, বালিয়াটি, জমিদারবাড়িতে করেন্থিয় স্তম্ভের ব্যবহার দেখা যায়। এছাড়া রোজগার্ডেন, রূপলাল হাউজ, রাধারমন রায়ের বাড়ি ও জজবাড়ির ফাসাদ নির্মাণে দ্বিতল উচ্চতায় নির্মিত স্তম্ভের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ইটের স্তম্ভের পাশাপাশি ঊনিশ-বিশ শতকের জমিদার বাড়িতে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মুন্সিগঞ্জের যদুনাথ প্রাসাদ ও আহসান মঞ্জিলের কথা উল্লেখ করা যায়। স্তম্ভ গুলো সাধারণত গোলাকারে নির্মিত হয়েছে। তবে আয়তাকার ও কখনো কখনো গোলাকার গুচ্ছ কলামও জমিদার বাড়িগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে। স্তম্ভের ব্যবহার মূলত: বারান্দার খিলান নির্মাণে, জানালা বা দরজার সহযোগী নির্মাণ উপাদান, গাড়ী বারান্দায় লক্ষ্য করা যায়। স্তম্ভগুলোর ভিত্তি হিসাবে আয়তাকার; বা কলসাকার ভিত্তি দেখা যায়।

স্থাপত্যের স্থায়িত্ব বিধানে খিলান ভিত্তিক নির্মাণ কৌশল মধ্যযুগীয় স্থাপত্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ঊনিশ-বিশ শতকে যদিও নির্মাণ ক্ষেত্রে সর্দল ভিত্তিক নির্মাণ অনুসৃত হয় কিন্তু খিলানের ব্যবহার তখন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অপরিহার্যভাবেই প্রচলিত ছিল। যেমন-বারান্দার খিলান সারি নির্মাণ, জানালা ও দরজা নির্মাণে খিলান ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই সময় ঢাকার জমিদার বাড়ি গুলোতে বিভিন্ন ধরণের খিলান চোখে পড়ে অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলান, ত্রিখাঁজ খিলান, বহুখাজ খিলান, ভেনিশিয় খিলান ইত্যাদি।

ঊনিশ-বিশ শতকে নির্মিত ঢাকার জমিদার বাড়ি গুলোর মধ্যে রোজগার্ডেন ও আহসান মঞ্জিলে গম্বুজ ব্যবহৃত হয়েছে। স্থাপত্যের আড়ম্বরতা বৃদ্ধিই ছিল গম্বুজ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য। ইউরোপীয় ধরণের শিরাল ও স্তম্ভ নির্ভর গম্বুজ গুলোর কোন ব্যবহারিক উপযোগীতা নাই।

ব্রাকেট বা বাট্রেস সাধারণত বর্ধিত বারন্দা বা কর্নিশের ঠেকনা হিসাবে নির্মিত হয়। এ সময়কার প্রাসাদ গুলোতে বিভিন্ন ধরণের ব্রাকেটের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে স্টাকো, ইট, কাঠ ও লোহার

ব্রাকেট প্রধান। ব্রাকেট গুলো স্থাপত্যের ভার বহনের পাশাপাশি অলংকারিক উপাদান হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে।

শেড বা ছাইচ একটি ইন্দো-ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত হয়। সূর্যের আলো ও বৃষ্টির ছাট থেকে গৃহের অভ্যন্তরভাগের সুরক্ষার জন্য জানালা বা দরজার উপরে বর্ধিত আকারে শেডগুলো নির্মিত হত। অনেক সময় জানালা বা বারান্দার সামনে জালি আকারেও শেড নির্মানের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

স্থাপত্যে ঘুলঘুলি বা ভেন্টিলেটর ব্যবহার বাংলার গ্রীষ্মমন্ডলীয় আবহাওয়ার কারণে এ অঞ্চলের স্থাপত্যে সংযোজিত হয়েছে। আলো বাতাসের চলাচলের প্রয়োজনীয়তার কারণে উপমহাদেশীয় স্থাপত্যে ঘুলঘুলির ব্যবস্থা রাখা হত। উনিশ বিশ শতকের নির্মিত ঢাকার জমিদারবাড়ি গুলোতে বিভিন্ন ধরনের ঘুলঘুলি পরিলক্ষিত হয়। বর্গাকার বা চক্রাকারে নির্মিত এই ঘুলঘুলি গুলো অনেক সময়ই লোহার গ্রীল দ্বারা আবদ্ধ রাখ হত।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর কারণে উপমহাদেশীয় জমিদারবাড়ি গুলোতে কক্ষের সম্মুখে বারান্দার ব্যবস্থা রাখা হয়। এ সকল বারান্দার রেলিংগুলো সাধারণত কাঠ ও লোহার দ্বারা নির্মিত হত। এছাড়া সিঁড়ি ছাদের কিনারেও রেলিং এর ব্যবহার লক্ষ্যনীয়।

জমিদারবাড়িগুলোর প্রধান সিড়ি গুলো সাধারণত ইটের অনেক ক্ষেত্রে শ্বেত পাথরের আস্তরন সহ নির্মিত হত। কিন্তু গৃহপরিচারকদের জন্য নির্মিত বা অপ্রধান সিড়ি সাধারণত লোহা দ্বারাই নির্মিত হতে দেখা যায়। লোহার সিঁড়ি গুলো ছিল প্যাঁচানো ও অনেকক্ষেত্রেই বহুল অলংকৃত।

জমিদারবাড়িগুলো সম্পূর্ণ ইটের তৈরী। গাথুনি হিসাবে চুন সুরকী ব্যবহৃত হয়েছে। ছাদগুলি কাঠের কড়ি বর্গার উপরে স্থাপিত। এছাড়া কিছু স্থানে বিশেষ করে সিড়ি ধাপে শ্বেত অথবা কালো মার্বেল পাথরের আচ্ছাদন ব্যবহৃত হয়েছে। মুরাপাড়া জমিদারবাড়ির সম্মুখের শিব মন্দিরটি বেলে পাথরের তৈরী। জমিদারবাড়িগুলোর মেঝে নির্মাণে অনেক ক্ষেত্রে নানা বর্ণের মার্বেল পাথর ও মোজাইক ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন উপকরণের দ্বারা স্থাপত্য অলংকরণ হয়ে থাকে। ঢাকার জমিদার প্রাসাদে স্টাকো, ছাঁচে ঢালাই লোহার নকশা ও চিনিটিকরি নকশা দেখা যায়।

স্টাকো : উনিশ-বিশ শতকের ঢাকার প্রাসাদ অলংকরণে স্টাকো এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রবেশ পথের উপরে পেডিমেন্টের দু'পাশে প্যাঁচানো নকশা, মেডেল নকশা, স্তম্ভ শীর্ষদেশে করন্থীয় পাতা, বিভিন্ন চক্র নকশা, কর্নিশে উড়ন্ত ফিতা নকশা ইত্যাদিতে স্টাকো বহুল ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

কাস্ট আয়রন: উনিশ-বিশ শতকে জমিদার স্থাপত্যে cast-iron এর বহুল ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। ঢাকার জমিদারবাড়ি গুলোর খিলানপট অলংকৃত ছাচে ঢালা লোহার নকশায় নানা রংয়ের কাঁচের সার্শি ব্যবহৃত হয়েছে। বারান্দার গ্রীলে, ব্রাকেটে, প্রধান ফটকে, অলংকৃত প্যাঁচানো সিঁড়ি ইত্যাদিতে cast-iron এর ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চিনিটিকরী: ঢাকার জমিদার বাড়িগুলোর কোন কোনটিতে অঙ্গসজ্জায় চিনিটিকরি ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণত খিলান ও এর পার্শ্ববর্তীস্থান, ফ্রিজে, স্তম্ভে এই মাধ্যমটির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

উনিশ-বিশ শতকের ঢাকার জমিদার বাড়ি গুলোর স্থাপত্য পর্যালোচনা করলে এর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা সম্ভব।

১. **ইউরোপীয় প্রভাব :** এ সময়ে নির্মিত জমিদারবাড়ি গুলোতে ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতি ব্যাপকভাবে চর্চিত হয়েছে। বিশেষ করে ফাসাদ নির্মাণে ইউরোপীয় রেনেসাঁ যুগীয় স্থাপত্যরীতি অনুসৃত হয়েছে। সমগ্র ফ্যাসাদকে ত্রিধাবিভক্ত করা, ফ্যাসাদের মাঝের অংশকে প্রাধান্য দিয়ে কিছুটা বর্ধিত ভাবে নির্মাণ, কোন কোন ক্ষেত্রে পেডিমেন্টের ব্যবহার গ্রেকো-রোমান রীতির প্রভাব লক্ষ্যণীয়। এছাড়া স্তম্ভ গুলো নির্মাণের একই রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মুরাপাড়া জমিদার বাড়ি (নারায়নগঞ্জ) বালিয়াটি জমিদার বাড়ি (মানিকগঞ্জ), রূপলাল হাউজ (ঢাকা) ইত্যাদি জমিদারবাড়িতে পেডিমেন্ট ও ত্রিধাবিভক্ত প্রাসাদ পরিকল্পনা দৃশ্যমান। ছাঁচে তৈরী লোহার সিড়ি, রেলিং, ব্রাকেট, দরজা, খিলানপটের জালি ইত্যাদিও নব্য ধ্রুপদী চিন্তা চেতনা ও কৌশলে নির্মিত খিলান নির্মাণে অর্ধগোলাকৃতির খিলান ও ইংলিশ গথিক বা কোন কোন ক্ষেত্রে ভেনিসিয় খিলান নির্মাণের মধ্য দিয়ে নির্মাণ পদ্ধতিতে ইউরোপীয় প্রভাব লক্ষ্যণীয়। মূলত: উনিশ-বিশ শতকে বাংলায় যে সমস্ত জমিদার বাড়ি বা এই ধরণের বড় বড় অট্রালিকা নির্মিত হয়েছে এদের প্রায় সবগুলিই তৎকালীন ক্ষমতাসীন ইউরোপীয় বিশেষ করে ইংল্যান্ডে চর্চিত স্থাপত্যরীতিকে প্রায় অন্ধেরমত অনুসরণ করেছে। সিঁড়িযুক্ত ভীত, পেডিমেন্ট, কাঠের ব্যালাসট্রেড সিড়ি ইত্যাদিতে ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। গাড়ী বারান্দার উপস্থিতিও প্রচলিত ইউরোপীয় রীতি।

ভেনিসিয় জানালা, খিলানপটহ, ভূঁসুয়া পদ্ধতিতে অর্ধবৃত্তাকৃতিতে খিলানসারিতে অষ্টাদশ ঊনিবিংশ শতকে ইউরোপে চর্চিত নব্য ধ্রুপদী বৈশিষ্ট্য প্রকট। খিলানপটহতে রঙিন কাঁচ ও ভেনিসিয় দরজা জানালা, করিন্থীয় স্তম্ভ শীর্ষ ও ছাঁদ পাচিল নির্মাণেও একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়।

২. **দেশীয় প্রভাব :** বাংলা তথা ভারতবর্ষের আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভিন্নতার কারণে স্থাপত্য ক্ষেত্রে এর বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলার আবহাওয়া জলবায়ু ও ভৌগলিক অবস্থার ভিত্তিতে গড়ে উঠা সংস্কৃতি প্রাচীনকাল থেকে এখানকার স্থাপত্যের স্বরূপ নির্ধারণ করেছে। এখানকার সমতল ভূমিতে বাসগৃহগুলো মাঝখানে উঠান রেখে চারিদিকে কক্ষগুলো নির্মিত হত। তাই বাংলায় নির্মিত জমিদারবাড়ি গুলো অঙ্গন কেন্দ্রিকভাবে নির্মিত হতে দেখা যায়। হিন্দু জমিদার বাড়িগুলোতে কক্ষ বিন্যাসে হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্র বাস্তুশাস্ত্রের অনুসরণ এখানে লক্ষ্যণীয়। বাস্তুশাস্ত্র অনুসরণে মুড়াপাড়া জমিদারবাড়ির মন্দিরটি বহিংবাড়ির উত্তর দিকে নির্মিত হয়েছে যা দক্ষিণমুখী প্রতিটি জমিদার বাড়িতে জলাশয় ও প্রার্থনা গৃহের উপস্থিতিকে এদেশীয় সংস্কৃতির একটি অংশ বলে চিহ্নিত করা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, জমিদারবাড়ি সংলগ্ন ধর্মীয় উপসনালয় নির্মানের উদাহরণ ঢাকা শহরের বাইরের স্থাপিত বাড়িগুলোতেই লক্ষ্যণীয়। উদাহরণস্বরূপ মুরাপাড়া জমিদারবাড়ি (নারায়নগঞ্জ) তেওতাঁ জমিদার বাড়ি (মানিকগঞ্জ), ভাওয়াল প্রাসাদ (গাজীপুর) ইত্যাদি প্রাসাদের কথা বলা যায়। কিন্তু ঢাকা শহরের অভ্যন্তরে নির্মিত আহসান মঞ্জিল, রূপলাল হাউজ বা রোজগার্ডেনে ধর্মীয় স্থাপনা অনুপস্থিত। এর মধ্যে আহসান মঞ্জিল ও রোজগার্ডেন হলঘর কেন্দ্রিক বৈশিষ্টে নির্মিত। এ থেকে এটি অনুমিত হয় যে, এই সময় জমিদারদের দ্বারা শহরে নির্মিত স্থাপনার ক্ষেত্রে হলঘর কেন্দ্রিক রীতিটি ছিল নির্মাতাদের কাছে অধিক পছন্দনীয়। শহর থেকে দূরবর্তী বাগানবাড়ি গুলোর জন্য অঙ্গনকেন্দ্রিক পরিকল্পণা ছিল বিশেষ প্রযোজ্য। গ্রাম ও শহরের সামাজিক ও প্রায়োগিক প্রয়োজনীয়তাকে গৃহ পরিকল্পণার জন্য দায়ী করা যায়। দেশীয় প্রভাব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে এদের অলংকরণের বিষয়বস্তু নির্বাচনে। প্রাসাদে অষ্টাদশ শতক হতে ইংল্যান্ডে চর্চিত অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলান ব্যবহৃত হলেও খিলানের উপরে স্টাকো নির্মিত নকশায় ও লতাগুল্ম গুলো একেবারে দেশজ। ইমারত শীর্ষে ক্ষুদ্র মিনারগুলোর শীর্ষ দেশে কলস ও অমলক এর ব্যবহার নিতান্তই দেশজ উপাদান। প্রাসাদের কর্নিশের ঠিক নিচে একসারি মারলন বা পদ্ম পাপড়ির নকশা মোগল আমল হতে বাংলার স্থাপত্যে একটি বহুল চর্চিত বিষয়। কার্নিশের ছাঁইচ নির্মানে যে ঠেকনা ব্যবহৃত হয়েছে তাতে পদ্ম পাতার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। খিলানের

উপরিভাগে বিভিন্ন দেশজ উপাদান যেমন আনারস, ডালিম ফল, নয়নতারাফুল ও শঙ্খ নকশা ইত্যাদি অলংকরণে ব্যবহৃত হয়েছে। খিলানে নির্মিত বহুখাজ সূঁচালো খিলান মোগল বৈশিষ্ট্যের কথা মনে করিয়ে দেয়।

উনিশ-বিশ শতকে নির্মিত ঢাকার জমিদারবাড়ি গুলো রায়ত ও শাসক শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী গোষ্ঠির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানকে বিধৃত করে। নিজস্ব জমিদারী অঞ্চলে তাদের তৈরী প্রাসাদ গুলো ছিল কাছারী, ভিতরবাড়ি, মন্দির, জলাশয় সহ একটি পূর্ণাঙ্গ কমপ্লেক্স যা ঐ অঞ্চলে সর্বোচ্চ সরকারি কর্মকর্তা ও ভূ-স্বামী হিসাবে তাদের প্রতিপত্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। অন্যদিকে রাজধানী শহরে তাদের নির্মিত ম্যানসনগুলো এ সময়কার জমিদারদের সামাজিক অবস্থান নির্ধারন করে। বাড়িগুলো বেশীরভাগই হলঘর কেন্দ্রিক যা তাদের সামাজিক যোগাযোগ ও কর্মকান্ডের পরিচয় বহন করে। উদাহরণস্বরূপ আহসান মঞ্জিল ও রূপলাল হাউজের বলরুম এবং রোজগার্ডেনের নাচঘরের কথা বলা যায় যা তৎকালীন জমিদারদের শহরে জীবনযাত্রা ও সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসাবেই নির্মিত হয়েছিল। স্থাপত্য নির্মানে ইউরোপীয় শাসকদের নির্মাণ কৌশল ও রীতিনীতি কিছুটা (নব্য ধ্রুপদী, গ্রেকো রোমান) অপরিবর্তিত ভাবে অনুকরণ করে তাঁরা আধুনিক স্থাপত্য ধারার সূচনা করলেও দেশীয় ধারাকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করতে পারেননি। স্থাপত্য পরিকল্পনায় ও অলংকরণে যা প্রতিভাত হয়ে উঠে। পাশ্চাত্য শিল্পধারার পাশাপাশি দেশীয় গুল্মলতা ও মোটিফের ব্যবহার তৎকালীন জমিদার শ্রেণীর দেশত্ববোধের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই এ সময়কার ঢাকার জমিদারবাড়ি গুলোকে বৈদেশিক অনুপ্রেরণায় নির্মিত ও দেশজ বৈশিষ্ট্যে পুষ্ট বাংলার আধুনিকতার সূচনাকারী স্থাপত্য হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

ফারসী (আকর) গ্রন্থ

Abul Fazl, Allami, *Ain-i-Akbari*, English Translation in Bibliotheca Indica Series, 3 vols. Calcutta: The Asiatic Society, vol.1/1873(by H. Blockman, revised and edited by D.C. Phillot, 1927;vols. II & III (by H.S. Jarret) 1891 and 1894. First reprint, Delhi: Crown Publishers, 1988.

Ali Yousuf, *Ahwal-i-Mohabbatjong*, Translated by J.N. Sarkar, Bengal Nawabs, Calcutta: Asiatic Society, 1952.

Jahangir, Nur-ud-din Muhammad. *Tuzuk-i-Jahangiri*, Translated by A. Rogers, edited by H. Beveridge. 2 vols.(First Published in 1909 – 1914). Second edition, Delhi: Munshiram Manoharlal Oriental Publishers.

Minahz-i-Siraj, *Tabakat-i-Nasiri*, Translated into Bengali and (edited) by Abul Kalam Mohammad Zakaria, Dhaka: Bangla Academy, 1983.

Nathan, Mirza, *Baharistan-i-Ghayabi*, vol-1, Translated by M.I. Borah,(1st ed.), Guahati: Narayani Handiqui Historical Institute, 1936.

English Books

Ahmed, Sharif uddin.(ed.), 2009. *Dhaka Past Present Future.* (Revised ed.), Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

………, ………..... . *Dacca- A Study in Urban History and Development, 1840-1885.* London: Curzon Press, 1986.

………, ………..... . *Dhaka- A Study in Urban History and Development, 1840-1921.* Second Revised (Ed.) Dhaka: Academic Press and Publishers Limited, 2003.

………….,……….. . *Building of a Capital City-Dhaka. 1905-1911.* Bangladesh Historical Studies, Dhaka,1995.

............, ... *Dacca: A study in Urban History and Development,* , London : 1986

Ahmed, Nazimuddin. *Mughal Dacca and the Lalbagh Fort, Dacca, 1982*

............, ... John Sunday (ed.), Buildings of the British Raj in Bangladesh, Dhaka : The University Press Limited, 1984.

..........., ..., Discover The Monuments of Bangladesh. John Sanday (ed.),Dhaka: The University Press Ltd, 1984

Ahmed, Rafiuddin. *The Bengal Muslims 1871-1906: A Quest for Identity.* Delhi: Oxford University Press, 1981.

Ahmed, Sufia. *Muslim Community in Bengal: 1884-1912.* London: Oxford University Press, 1974.

Akhter, Shirin.*The Role of the Zamindars in Bengal,* Dacca : Asiatic Society of Bangladesh, 1982.

Atiqullah, M. and Khan, F. Karim. *Growth of Dacca City: Population and Area, 1608-1981.* Dhaka: University of Dhaka,1965.

Azam, K.M. *The Panchayat System of Dhaka.* Dhaka: 1911.

Bahadur, Rai M.N. Gupta. *Land System of Bengal,* Calcutta : University of Calcutta, 1940.

Banerjee, Anil Chandra. *The Agrarian System of Bengal,* vol-I, Calcutta : K.P. Bagchi & Company, 1980.

Banerji, Tarini Das. (Comp.). *The Zamindars and the Rayat in Bengal.* Calcutta: W. Newmen and Co., 1883.

Banerjee, D.N. *Early Land Revenue System in Bengal and Bihar,* Calcutta : 1986.

Blockmann, H. *Contributions to History and Geography of Bengal.* Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1968.

Bowrey, Thomas. *Countries Round the Bay of Bengal.* Cambridge: Cambridge University Press, 1905.

Bradley-Birt, F. B. *Dacca: The Romance of an Eastern Capital.* London: Smith, Elder & Co.1906.

Brown, Percy. *Indian Art at Delhi,* Calcutta : Superintendent of Government Printing, 1903.

............,........... . *Indian Architecture (Buddhist and Hindu Periods),* 4th ed., Bombay : D.B. Taraporevala Sons & Co. Pvt. Ltd., 1959.

.............,.......... . *Indian Architecture (Islamic Period),* Bombay : D.B, Taraporevala Sons & Co. Pvt. Ltd., 1942.

Buchanan, D.H. *The Development of Capitalistic Enterprise in India.* New York: 1934.

Buckland, C.E. *Bengal Under Lieutenant Governors.* New Delhi: Deep Publications, 1976.

Chakravarti, P. B. *The Study of Antiquities in Dacca.* Dacca. 1920.

Dani, A.H. *Muslim Architecture in Bengal,* Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1961.

....., ..., *Dacca:A Record of its Changing Fortunes,*Dhaka Asiatic Press, 1962

Datta, Bimal Kumar. *Bengal Temples,* New Delhi : Munshiram Monoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1975.

De, Amalendu. *Roots of Seperatism in Nineteenth Century Bengal.* Calcutta: Ratna Prakashani, 1974.

Faaland, Just and Parkinson, J. R. *Bangladesh: The Test Case of Development Dhaka.* Dhaka: University Press Ltd. 1976.

Fletcher, Banister. *A History of Architecture (ed.,John Musgrove)*[19th Indian,ed.]Delhi,S.K.Jain for CBS Publishers,1992

Ghose, Loke Nath. *The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas Zamindars & Co.,* Part-1,2 Calcutta : J.N. Ghose and Co. Press, 1881

Gorvine, Albert. *Dacca Urban Division: A Proposal.* Lahore: Pakistan Administrative Staff College. 1963.

Gupta, Nirmal K. *Dacca : Old and New*, Dacca,N.P. 1940

Hasan, Syed Mahmudul, ed., *A City and Its Civic Body.* Dhaka: Dhaka Municipal Corporation, 1966.

……., ……, …………… *Muslim Antiquities of Dhaka.* Dhaka: Globe Library Private Limited. 2004

Hasan, Sayed Aulad. *Notes on the Antiquities of Dacca.* Dacca: 1912

Hedges, William. *The Diary of William Hedges, Esq.* London: Hakluyt Society, 1887.

Hollingbury, R.H. *The Zamindary Settlement of Bengal.* Kolkata: Brown and Company, 1879.

Hossain, Syud*Echoes from Old Dacca.* (Reprint), Dhaka: Hakkani Publishers. 2001.

Hossain, Anwar, *Dhaka Portrait, 1967- 1992: Images, Concept, Photographs, Designs and Layout.* Dhaka: A B Publication, 1992.

Islam, Sirajul. *Bengal Land Tenure,* Calcutta : K.P. Bagchi & Company, 1988.

……….,……… . *Permanent Settlement in Bengal - A Study of Its Operation 1790-1819,* Dacca : Bangla Academy, 1979.

……….,……. . *Bengal Land Tenure: The Origin and Growth of Intermediate Interest in the 19th Century.* Ratterdam: Comparative Asian Studies Programme, 1985.

Islam, Nazrul. *Dhaka: from City to Mega City; Perspectives on People, Places, Planning and Development Issue.* Dhaka: Urban Studies Programme. 1996.

James, J. R. *Some Aspects of Town and Country Planning in Bangladesh.* Dhaka: Ford Foundation, 1973.

K.P. Bagchi & Company. 1980. Baden-Powell, B.H. *The Land Systems of British India.* 3 Vols. Oxford: Clarendon Press, 1892.

King, Anthony D. *The Bangalow, the Production of a Global Culture.* London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1984

Karim, Abdul. *Dacca: the Mughal Capital.* Dhaka: Asiatic Society of Pakistan, 1964.

........,........ . *Murshid Quli Khan and His Times.* Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1963.

........,........ . *Social History of the Muslims in Bengal.* Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1959.

Losty, J.P, *Calcutta. City of Palaces (A Survey of the City in the Days of the East India Company. 1690-1858).* London: The British Library, 1990.

Lulani, G.A.K. *Dacca – Past and Present.* Allahabad: The Pioneer Press, 1911.

Mamoon, Muntassir. *Dhaka: Tale of a City,* (translated by Ahmed, Shaheen), Dhaka: Dhaka City Museum. 64 p. [NILGJ],1991.

.........., ..., *Source Materials of the Cultural of History of Dhaka City.* (translated by Siddharta, Jibandranath), Dhaka: International Center for Bangla Studies, 1991.

Musa, Md. Abu.2000. *History of Dhaka through Inscription and Architecture: A Portrait of the Sultanate Period.* Dhaka: Department of Archaeology, Ministry of Cultural Affairs, Government of Bangladesh. .

Mahmood, A.B.M. *The Revenue Administration of Northern Bengal (1765-1793),* Dacca : N.P.

Moreland, W.H.*The Agrarian System of Moslem India,* (2nd ed.), Delhi : Oriental Books Reprint Corporation, 1968.

Mukkopadhyay.Subhas Chandra, *The Agrarian Policy of the British in Bengal,* Allahabad : Chugh Publications, 1987.

Dhaka University Institutional Repository

Majumdar, Hridaynath.*The Reminiscences of Dacca.* Calcutta: The author, 1926.

Majumdar, R.C.*Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century.* Calcutta: Firma K.L Mukhopadhyay, 1960.

............,..... .*Story of Modern Bengal.* (Part 1), Calcutta: G. Bharudwaj & Co., 1978.

Mallick, A.R.*British Policy and the Muslims of Bengal 1757-1856.* Dhaka: Asiatic Society of Pakistan. 1961.

Mollah, M.K.U.*The New Province of Eastern Bengal and Assam.* Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1981.

Rahim, Muhammad Abdur. *Social and Cultural History of Bengal,* Karachi: Pakistan Publishing House, 1967.

Rai Monohan Chakrabarti Bahadur, *A Summery of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal, 1757-1916* ,Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1918.

Ray, Bankim Chandra. *The Bengal Zaminders,* Calcutta : Backland Press, 1904.

Saraswati, S.K.. *Architecture of Bengal,* Calcutta : G. Bharadwaj & Co., 1976.

Sarkar, J.N.. (ed.). *The History of Bengal,* vol-2, Dacca : The University of Dacca, 1948.

Sinha, Narendra Krishna. *The Economic History of Bengal,* Calcutta : Farma K.L.Pvt.Ltd,1968.

Stewart, Charles. *History of Bengal,* Calcutta : The Bangabasi Office, 1910.

Saif ul Haque, Raziul Ahsan and Kazi Khaled Ashraf (ed.). *Pundranagar to Sher-e-banglanagar : Architecture in Bangladesh.* Dhaka: Chetana Sthapatta Unnoyan Society, 1977.

Sutton-Page, Rev. W. *In City and Jungle: A Brief Survey of the work of the Baptist Missionary Society in the City and District of Dacca, Eastern Bengal.* London: Thaker Spink & Co., 1907.

Taifoor, S.M. *Glimpses of Old Dacca,* N.P. 1952

………, ….. *Glimpses of Old Dhaka.* (2nd ed.), Dacca: S.M. Perwez, 1956.

Tailor, James. *Topography and Statistics of Dacca,* Calcutta:n.p., 1840

Tyson, Geoffrey. *Bengal Chamber of Commerce and Industry 1853-1953 – A Centenary Survey.* Calcutta: 1952.

Wise, James. 1883. *Notes on the Races, Castes and Trads of Eastern Bengal.* London. Harrison & Sons.

Articles: Edited Books

Ahmed, Nizamuddin. 'Working Conditions in the Industries of Dhaka. In: *Dhaka Past Present Future,* 2nd ed., by Ahmed, Sharif uddin. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh. 2009.

Ahmed, Sharif uddin. 'Evaluation of Some Artisans, Craftsmen and Professional Classes of Dhaka City and their Settlements.' In: *Commercial History of Dhaka* Hassan, Delwar. (ed.) Dhaka: Dhaka Chamber of Commerce and Industry. 2008.

Hasan, Syed Mahmudul. 'Muslim Monuments of Dhaka.' In: *Dhaka Past Present Future,* ed. Ahmed, Sharif uddin. (2nd ed.), Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh. 2009

Husain, A.B.M.. (ed.), *Sonargaon-Panam,* Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1997.

……….,………….. (ed.), *Architecture, Cultural Survey of Bangladesh, vol-2,* Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, December, 2007.

Imamuddin, Abu H. Hasan, Shamim A. and Alam, Wahidul. Shakhari Patti: 'A Unique Old City Settlement, Dhaka.: In Architecture and Urban Conservation in the Islamic World, ed. by A. H. Imamuddin and K. R. Longeteig. Geneva: The Aga Khan Trust for Culture,1990.

Islam, Sirajul. 'Business History of Dhaka upto 1947; in Commercial History of Dhaka ed. by Hassan, Delwar. Dhaka: Dhaka Chamber of Commerce and Industry,2008.

.......,......... . (ed.), *History of Bangladesh (1704-1971).* 3 Vols. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1992

Karim, K. M. 'Naib Nazims of Dacca.' Abdul Karim Sahitya-Visarad Commemoration Volume. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1972.

Majlis, Najma Khan'Dhaka in Early Nineteenth Century Paintings.' In: *Dhaka Past Present Future,* (2nd ed., ed. by Ahmed), Sharif uddin. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2009.

Mohsin, K. M'Commercial and Industrial Aspects of Dhaka in the Eighteenth Century.' In: *Dhaka Past Present Future,(* 2nd ed.), Ahmed, Sharif uddin. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2009.

বাংলা বই

আবদুল্লাহ্, বদরুন্নেসা। *বড় বাড়ীর কথা*। ঢাকা : জুনায়েত ইব্রাহীম প্রকাশনী। ১৯৯৭।

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন । *ঢাকা : ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১*। ৩য় সংস্করন । ঢাকা : একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স। ২০০৬ ।

আলী তায়েশ, *মুনশী রহমান তাওয়ারিখে ঢাকা* (অনুবাদ ঃ আ. ম.স. শরফুদ্দীন আহমেদ), ঢাকা, ১৯৮৫

আহমেদ, আবুজজোহানুর, *উনিশ শতকের ঢাকার সমাজজীবন*, ঢাকা, ১৯৭৫।

.................., *বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল)*,(১ম খন্ড), রাজশাহী : ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।

ইসলাম, রফিকুল *ঢাকার কথা ১৬১০-১৯১০*, ঢাকা, ১৯৮২

ইসলাম, সিরাজুল। *বাংলার ইতিহাস ঃ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, ১৭৫৭-১৮৫৭, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

উমর, বদরুদ্দীন। *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক*, ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাদার্স, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০৮।

Dhaka University Institutional Repository

কবির, শাহরিয়ার। *সাধু গ্রেগরীর দিনগুলি*। ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ১৯৯৪।

করিম, আবদুল। *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*, (৩য় সংস্করণ), ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

... ...,... ... .. । ১৯৯৮। *মোগল রাজধানী ঢাকা*। অনুবাদক ছিদ্দিকী , মোহাম্মদ মুহিবউল্লাহ । ঢাকা , বাংলা একাডেমি ।

......., ... । *ঢাকাই মসলিন*, ঢাকা, ১৯৬৫।

খালেকুজ্জামান , মো: । *বিজন জনপদ থেকে রাজধানী ঢাকা*। ঢাকা: দিব্য প্রকাশ , ২০০২

গুপ্ত, রসিকলাল । *মহারাজ রাজবল্লভ সেন ও তৎসমকালবর্তী বাঙ্গালার ইতিহাসের স্থূল বিবরণ*, কলিকাতা ঃ সাথী প্রেস, তারিখ বিহীন।

গুপ্ত, সন্তোষ। *স্মৃতি বিস্মৃতির ঢাকা*। ঢাকা : নওরেজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৬।

চট্টোপাধ্যায়, নবকান্ত, *ঢাকা জেলার ভূগোল এবং সংক্ষেপে ঐতিহাসিক বিবরণ*, ঢাকা: ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলকাতা,১৮৬৮।

চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রমোহন । *বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা*, কলিকাতা ঃ সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৪।

চক্রবর্তী, রতন লাল। *বাংলাদেশের মন্দির*, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

জানা, প্রিয়নাথ । *বঙ্গীয় জীবনী কোষ*, (১ম খন্ড), কলিকাতা ঃ মাতৃভাষা পরিষদ, ১৯৭৫।

টেলর, জেমস। *কোম্পানী আমলে ঢাকা* । (অনুবাদক আসাদুজ্জামান , মোহাম্মদ) ঢাকা : বাংলা একাডেমী , ১৯৭৮।

দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ। *বাঙ্গালার ইতিহাস (সামাজিক বিবর্তন)*, কলিকাতা ঃ নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৮৩।

নাথান, মীর্জা *বাহারিস্তান ই গায়েবী* (অনুবাদ ঃ খালেকদাদ চৌধূরী), ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০০৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী প্রসন্ন । *বাঙ্গালার ইতিহাস (নবাবী আমল)*, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা ঃ ১৩১৫।

ব্রাডলী , বার্ট , এফ বি। প্রাচ্যের রহস্যনগরী। (অনুবাদক সিদ্দিকী , রহিম উদ্দিন) ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭।

রহমান, মুহাম্মদ মোখলেছুর । *স্থাপত্য পরিভাষা*, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

রহমান, হাকীম হাবীবুর । *ঢাকা পঞ্চাশ বছর আগে* (অনুবাদক করিম, মোহাম্মদ রেজাউল), ঢাকা: প্যাপিরাস,২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

রায়, জোতিন্দ্র মোহন। *ঢাকার ইতিহাস,* কলকাতা: (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরী, কলকাতা), ১৯১৩।

বেগম, রওশন আরা । *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ব বঙ্গের মুসলিম সমাজ*, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

রহমান, হাকিম হাবিবুর *আসুদ গান-ই-ঢাকা* (অনুবাদঃ আকরাম ফারুখ ও আ.ন.ম. রুহুল আমিন চৌধুরী), ঢাকা, ১৯৯১।

ভট্টাচার্য, নৃপেন্দ্র । *বাংলার ভূমি ব্যবস্থা, কলিকাতা* ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬৩।

ভদ্র, নবীন চন্দ্র *ভাওয়ালের ইতিহাস,* ঢাকা, ১৮৭৫।

মজুমদার, বামাচরণ। *বাঙ্গালার জমিদার*, কলিকাতা ঃ আন্তনী বাগান লেন, ১৩২০।

মিঞা, আব্দুল হাকিম। *আহসান মঞ্জিল ও ঢাকার নবাব- ঐতিহাসিক রূপরেখা*। ঢাকা : জ্যোতিপ্রকাশ, ২০০৩।

মামুন, মুনতাসীর । ঢাকা : *স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী* , (৩য় সংস্করন) ঢাকা : বাংলা একাডেমী ,২০০০।

......., ... । *পুরানো ঢাকা : উৎসব ও ঘরবাড়ি*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

......., ... । *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতি নগরী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

মজুমদার, কেদার নাথ *ঢাকার বিবরণ*, ঢাকা, ১৯১০।

মোহনরায়, যতীন্দ্র *ঢাকার ইতিহাস*, ঢাকা, ১৩১৯।

মুহাম্মদ আব্দুর রহিম প্রমুখ, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮১।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র। *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, (৫ম সংস্করণ), কলিকাতা ঃ জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭৭।

........................, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খন্ড, (৫ম সংস্করণ), কলিকাতা ঃ জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮।

........................, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খন্ড, ৩য় সংস্করণ কলিকাতা ঃ জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৮।

মন্ডল, সুশীলা। *বঙ্গদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ*, ১ম পর্ব, কলিকাতা ঃ মন্দির প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৩।

হোসেন, নাজির। *কিংবদন্তির ঢাকা*(তৃতীয় সংস্করণ), ঢাকা: থ্রিষ্টার কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লি: ১৯৯৫।

বাংলা সম্পাদিত বই

আউয়াল, ইফতিখার-উল-(সম্পাদিত), *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী : বিবর্তন ও সম্ভাবনা*। ঢাকা : বাংলাদেশ, জাতীয় জাদুঘর, ২০০৩।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, ঢাকা;* এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

......................., সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১),* ৩য় খন্ড, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০০।

চৌধুরী , আব্দুল মমিন (সম্পাদিত) *বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নগর* । ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ,১৯৯৬।

মামুন, মুনতাসীর (সম্পাদিত), *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ*, ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৫।

Gazetteers

Allen, B.C. Eastern Bengal District Gazetters: Dacca, Vol V. Allahabad,Bengal Secretariate Press, 1912

Imperial Gazetteer of India – Eastern Bengal and Assam. Delhi: Government Printing, India, 1932.

O'Malley, L.S.S, *Bengal District Gazetteers, Jessore.* Kolkata: Bengal Secretariat Book Depot, 1912.

.... Bengal *District Gazetteers: Dacca.* Kolkata: Bengal Secretariat Book Depot, 1912.

Rizvi, S.N.H. *East Pakistan District Gazetteer: Dacca.* Dhaka: Pakistan Government Press, 1959

......., ... (Ed). *East Pakistan District Gazetteers, Dacca,* Dacca 1969

গেজেটীয়ার

ঢাকা জেলা গেজেটীয়ার,(বৃহত্তর ঢাকা), উপনিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯৩,

Official Reports & Monographs

Ascoli, F.D. *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Dacca 1910-1917.* Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1917.

Bion, Rev. R. *Report on the Dacca and East Bengal Baptist Mission for the Year, 1872.* Calcutta, 1872.

Clay. A.L. *Principal Heads of the History and Statistics of the Dacca Division* (Report on Dhaka was written by A.L. Clay, Officiating Collector and Magistrate of Dhaka, July 1867. Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1868.

Calcutta University Commission. 1919. *The University of Dacca.* Being Chapter 30(3) of the Report. Calcutta: Government Press.

East Bengal Missionary Society. 1849. *Report of the East Bengal Missionary Society.* Dacca

Geddes, Patrick. *Report on Town Planning – Dacca.* Kolkata: 1911.

Government of Bengal. "Final Report on the Indigo Crop of Bengal" *Department of Land Records and Agriculture.* Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1901.

.... *Report on the Development of Western Education in Bengal.* Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1918.

.... *Report on the Internal Trade of Bengal, for 1881-82.* Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1883.

Government of Eastern Bengal and Assam (GOEBA). *Report of the Agriculture of Eastern Bengal and Assam for 1905-06.* Shillong: Eastern Bengal and Assam Secretariat Press, 1906.

Government of Bengal. *Report of the Dacca University Committee.* Calcutta: Government Press, 1912.

Dhaka University Institutional Repository

Geddes, Patrick. *Report on Town Planning Dacca, Calcutta,* N.P.1911

Gupta, G.N. *Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam.* Shillong: Eastern Bengal and Assamese Secretariat Printing Co., 1908.

Sen, A.C. *Agricultural Report of the Dacca District.* Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1885.

Taylor, James. *A Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacture of Dacca.* London: 1851.

……..,………*A Sketch of Topography and Statistics of Dacca.* Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1840.

বাংলা প্রবন্ধ, সংকলন গ্রন্থ ও বিশ্বকোষ

আহমেদ, তোফায়েল। *ঢাকার কারুশিল্প*। অন্তর্ভূক্ত : *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী : বিবর্তন ও সম্ভাবনা*, ইফতিখার-উল-আউয়াল সম্পাদিত। ঢাকা: *বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর*,২০০৩।

আহমেদ, মাহবুব। "বাংলাদেশের ভূমি বিন্যাস ব্যবস্থা", মুনতাসির মামুন সম্পাদিত, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ গ্রন্থে সংকলন*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৫।

আলী, মুহাম্মদ ইয়াকুব। *ঢাকার মহল্লাগুলির নামকরণের ইতিহাস*। মাহে নও, ১(১১)। ঢাকা: ১৯৫০।

ইসলাম, সিরাজুল এবং আখতার, শিরীন। "জমিদার", সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া, ৩য় খন্ড*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

চৌধুরী, আবদুল মমিন। "প্রাচীন বাংলার ভূমি ব্যবস্থা", মুন্তাসীর মামুন সম্পাদিত, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ গ্রন্থে সংকলিত*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৫।

ম্যাকাচ্চন, ডেভিড। "পূর্ব পাকিস্তানের মন্দির", ইতিহাস (*ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*), দ্বিতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা, ইতিহাস পরিষদ, ১৩৭৫।

যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ। "বরেন্দ্র অঞ্চল বা রাজশাহী বিভাগের ভৌগলিক ও ভূতাত্ত্বিক পরিচিতি", মুহঃ মমতাজুর রহমান ও অণ্যান্য সম্পাদিত, ***বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*** (রাজশাহী বিভাগ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য) গ্রন্থে সংকলিত, রাজশাহী : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ১৯৯৮।

রহিম, আব্দুর। "কোম্পানীর আমলে বাংলার মুসলমান জমিদারী", ইতিহাস (*বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা*), ৭ম বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৮০।

……………………., "স্থাপত্যশিল্প (মধ্যযুগ)", সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া, ১০ম খন্ড,* ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

সিংহ, কৈলাস চন্দ্র । "*বাংলায় দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস*", ভারতী, ১২৮৭।

সান্যাল, হিতেশ রঞ্জন। "বাঙ্গালীর ধর্মীয় স্থাপত্য চর্চা (পঞ্চদশ-সপ্তদশ শতক)", ইতিহাস (*ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*), ২য় সংখ্যা, ষষ্ঠ বর্ষ, ঢাকা, ইতিহাস পরিষৎ, ১৩৭৯।

হাসান, পারভীন। "স্থাপত্য ও চিত্রকলা" সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১) গ্রন্থে সংকলিত, ৩য় খন্ড, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০০।

……………………., "স্থাপত্যশিল্প (ঔপনিবেশিক যুগ)", *বাংলাপিডিয়া, ১০ম খন্ড*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

……………………, "বাংলার রাজা বা জমিদার শ্রেণী ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা", *গবেষণা পত্রিকা* (কলা অনুষদ), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় সংখ্যা, ১৯৯৭-৯৮।

……………………, "বরেন্দ্র অঞ্চলের রাজা ও জমিদার", মুহঃ মমতাজুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস (*রাজশাহী বিভাগ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য*) গ্রন্থে সংকলিত, রাজশাহী : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ১৯৯৮।

Theses Published

Azam, Md. Rafiq. '*Old Dhaka Cultural Centre (MURP Thesis).*' Dhaka: Dhaka Municipal Corporation, 1993.

Bhattasali, N. K. 'English Factory at Dacca.'in *Bengal Past and Present,* Vol-33. India. 1927.

Bhattasali, N. K. 'Some Facts About Old Dacca.' in *Bengal Past and Present,* Vol-51. India, 1936.

Bhattasali, N. K. 'Early Days of Mughal Rule in Dacca.' *Islamic Culture,* New Edition.Vol-2. United Kingdom. 1942.

Das gupta, Amraprasad. 'The Settlement of Dacca, Sylhet and Tipperah in 1772.' *Indian Historical Record Commission,* Vol-17, India, 1940.

Davidson, C. J. C. 'Dacca in 1840.' *Bengal Past and Present,* Vol-42. 1931.

Firminger, W. K. 'The Coming of the English to / Bengal 1630-1698.' *Selections from the Dacca* Review,Vol-4,1914.

Haque, F. A, '*Multi-Court Houses of Old Dhaka- A Study into Form and Context', (M. Arch Thesis).* Dhaka: BUET,1997.

Hasan, Sayid Aulad. 'Old Dacca.' *Selections from the ' Dacca Review,* Vol-1 , 1911.

Khan, Ghulam Ambia, 'Dacca Past and Present.'*East and West.* 10(3), Part-1,1911.

Khan, M, Siddique. 'Glimpses of Jahangir Nagar.' *Pakistan Quarterly,* 8(2),1958.

Rashid, Mahbubur. '*Development of Dacca River Port' (B. Arch Thesis).* Dhaka: BUET,1978.

Unpublished Thesis

Ali, Muhammad Yusuf. 'Bibliography of Works on the City and District of Dhaka'. M.A. Thesis. Department of Library Science, Dhaka: University of Dhaka, 1965.

Islam, Mafizul Chawdhury. 'The Regional Geography of Dacca with special Reference to its Agriculture and Industrial Activities'. M.A. Thesis. University of Aligarh, 1944.

অভিসন্দর্ভ

আলমগীর, মোঃ। *বাংলার মুসলমানদের সমাজ জীবনে ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান,* (পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ)। ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯৯।

Encyclopedia

Banglapedia. *Bangladesh Asiatic Society*, Dhaka 2003

Cultural Survey. Relevant vols. Bangladesh Asiatic Society, Dhaka 2007

Dani, A. H. Dacca. *Encyclopedia of Islam.* 1960.

Articles: Journal

Alam, A. K. M. Shamsul. Lalbagh Fort: The Splendours of Mughal Dhaka. *Jatree,* 6(3). Bangladesh,1990.

Ali, Md. Mohar. Nawab Shaista Khan and the English East India Company's Trade in Bengal. The Working of Parwana *Journal of the East Pakistan History Association,* 1 (1). Bangladesh,1968.

AH, S. M. Education and Culture in Dacca during the Last One Hundred years. *Muhammed Shahidullah. Felicitation Volume.* (ed. Muhammad Enamul Huq), Dacca: The Asiatic Society of Pakistan,1966.

Ahmed, Nafis. '*The landscape of the Dacca Urban Area*'. The Oriental Geographer, Vol. VII, No. I, 1963.

Ahmed, Sufia. 'Nawab Khawaja Salimullah.' *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* Dhaka,1976.

Ali, Abdul. A.F.M, 'Notes on the Early History of the English Factory at Dacca'. *Bengal Past and Present.* Vol. No. XXXII Calcutta, 1920.

Ali, Syed Murtaza. 'Education and Literature in Dacca'. in Azimusshan Haider (ed.), *A City and Its Civic Body,* Book 1 Dhaka: Dhaka Municipal Corporation, 1978.

Ascoli, F.D. 'The Jurisdiction of the District of Dacca from the Earliest Times' in*The Dacca Review,* N.P. 1917.

Banerji, S.C. `Naib Nazims of Dacca During the Company's Administration' 1778-1843; in Indian Historical Record Commission, Proceedings, vol XVl (1939), 1940

Bhattasali, N.K. 'Early Days of Mughal Rule in Dacca, Hyderabad: *Islamic Culture*, Vol. XVI. No. 4 (1942).

Chowdhury, Abdul Momin & H.Imam, Abu. Panam: An Adjunct of Sonargoan in Journal of Bengal Art, vol.3. Dhaka: International Centre for Study of Bengal Art, 1998

Imam, Shaheda Rahman and Mojumder, Sheikh Ahsan Ullah. Conservation and Preservation of Historical Buildings of Dhaka. *in Journal of Asiatic Society of Bangladesh. (Humanities),Dhaka:* 46(2). Bangladesh, 2001.

Hasan, Syed Aulad. 'Old Dacca'. in *Dacca Review*. Vol. IV August-September 1909.

Hasnath, Syed Abu and Haq, Saif-ul. 'Dhaka's Past, Present and Future.' *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, (Humanities),* 37(2). 1992.

Imam, Abu 'Origin of the Name Dhaka (Dacca)': in A Note. *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* Vol-3. Dacca,A.S.P.1958.

Islam, Sirajul. 'The Operation of the Sun-Set Law and Changes in the Landed Society of the Dhaka District, 1793-1817.' *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* 19(1). Dacca:A.S.B, 1974.

Karim, Abdul. 'An Account of the District of Dacca' Dated -1800. *Journal of the Asiatic Society of Pakistan, 1* (2). Dacca:A.S.P, 1962.

........,........... 'The Chronology of the early Naib Nazims of Dacca.' *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* 8(1). Dacca:A.S.P, 1963.

........,.......... (ed.). 'An Account of the District of Dacca dated 1800'. *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*. inVol. No. 7 Dacca:A.S.P, 1962.

Khan Ghulam Ambia. 'Dacca Past and Present'. in *East and West*, Mumbai. Vol. X, part I, No. 3 ,1911.

Khan, M. Siddiq. 'Life in Old Dacca'(Sketch of Social Life in Dhaka during the 19th Century). in *Pakistan Quarterly*. Vol. No. 9.).

Majlis, Najma Khan .`Stucco Decoration of Some Historical Buildings of Dhaka: An Appraisal (Late Nineteenth-Early Twentieth Century)' in *Journal of Bengal Art,* Vol-3,Dhaka: International Centre for Study of Bengal Art, 1998,

........,.......... . '19th Century Zaminder Baris (Manor Houses) of Bangladesh: some Observations. in *Journal of Bengal Art,vols 13 &14.* Dhaka (ICSBA), 2008-2009.

Mamoon, Muntassir. 'Sources of the History of the Dhaka City.'*The Bangla Academy Journal,* 20(1). Dhaka, 1993

Rahman, Mahbubur and Hoque, Ferdous Ara. "Form and Context of Multiple Courtyard Houses of Old Dhaka during the Late Nineteenth and Early Twentieth Century." *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, (Humanities),* Dhaka,42(2). Bangladesh. 1997.

Rankin, J.T. 'Dacca Diaries'.in *Journal of the Asiatic Society of Bengal.* Vol. No.16, Calcutta,1920.

Rahman, A. 1950. 'The Story of Dacca'. *Pakistan Quarterly,* 1 (2). Bangladesh.

Rankin, J. T. 1919. 'The Study of Antiquities in Dacca'. *Selections from the Dacca Review,* Vol-9. Bangladesh.

Serajuddin, A.M. 'Observation On District Studies in Bengal'. *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh* (Humanities), Vol. Nos. 24-26, (1979-81).

Sachse, F. M. 'The Passing of the French Factory in Dacca in 1774'. *Bengal Past and Present,* Vol-42, 1931.

Stapleton, H. E. 'The Antiquity of Dacca'. *Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal,* New Series, Vol-6. 1910.

Stapleton, H. E. 'On Certain Place Names in the Dacca District'. *Selections from the Dacca Review, (from Eastern Bengal Notes and Queries ed. by Stapleton, H.E.),* Vol-4, 1914.

Walter, Henry. 'Census of the City of Dacca'. *Asiatic Researches*, Calcutta. Vol. No. 17 ,1832.

Wise, James. Notes on Sunargaon, Eastern Bengal. *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* Vol-43. Calcutta. 1874.

Wise, James. 'The Barah Bhuyas of Bengal'. *Journal of / the Asiatic Society of Bengal,* Vol-44. Calcutta,1875.

Articles: Newspaper

Ahmed, LavinaAmbreen. ‘ Ruplal House: Urgent Need for Conservation’. *The Daily Star, Dhaka,* 21 May, 1999.

Fakhruddin, A. U. M. ‘Majestic Lalbagh Fort’. *The Weekend Independent, 2* August. Dhaka, 1996.

Haider, Azimusshan.. Dacca: History and Romance in Place Names. *The Pakistan Observer,* 5 May. Dacca, 1968

Taifoor, Syed Md. 1950 and 1951. ‘Glimpses of Old Dhaka’. *The Pakistan Observer,* January 4, 5; November 16, 17, 18; December 6, 30 of 1950 and January 22, February 19, March 4 of 1951. Bangladesh.

প্রবন্ধ, সংবাদপত্র

আহমদ, আবুয্ যোহা নূর। ‘ঢাকা ও ঢাকার নবাব খান্দান’। *মাসিক মোহাম্মাদী*, ৩৭ (৬, ৭, ৯, ১০ ও ১১), ৩৮ (২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭)। বাংলাদেশ, ১৩৭২ ও ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন। ‘ঢাকা : একটি নগর গড়ে উঠার কাহিনী।’ *সুন্দরম, ৩(৪)*, ১৯৮৯।

আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ।‘নবাব সলীমুল্লাহ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়’। *মাসিক ফসল*, ২৩ (৩৫)। ঢাকা, ১৯৮৯।

আখুনজাদা, রিয়াজুর রহমান খান, হাকিম হাবিবুর রহমান। *সাপ্তাহিক বিপ্লব*, ২৭ ফেব্রুয়ারী। বাংলাদেশ, ১৯৭০।

আলী, মোহাম্মদ সেকান্দর। ‘ঢাকার আগা সাদেক’। *মাসিক ফসল*, ২৪ (২৯-৩০)।ঢাকা, ১৯৮৯।

আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ। নওয়াব আব্দুর গণি ও নওয়াব আহসানউল্লাহ : জীবন ও কর্ম। ঢাকা : *ইসলামিক ফাউন্ডেশন*, ১৯৯৮।

খান, মুহাম্মদ সিদ্দিক, ‘প্রাচীন্ ঢাকা নগরীর মুসলিম সমাজ’। *মাহে নও*, ১৫(১২)। ঢাকা: ১৯৬৪।

চৌধুরী, আবদুল মমিন। ‘ঢাকার স্থাপত্য’। *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ৪র্থ সংখ্যা। ঢাকা, ১৯৭৮।

চৌধুরী, আফসান। ‘ প্রাচীন ঢাকা’। *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা*। ঢাকা:১৯৭৮।

বারী, মোঃ আব্দুল। ‘ঢাকায় প্রাচীন কীর্তি’। *মাসিক মোহাম্মাদী, ৩৬(৩)*। ঢাকা: ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

রহামান, ইদ্রিসুর। 'কালের সাক্ষী ঐতিহ্যবাহী পোগোজ স্কুল'। *সাপ্তাহিক রোববার*, ২৮(২৮)। ঢাকা: ২০০৬।

সেন, দীনেশচন্দ্র। ।' ঢাকা জেলার কয়েকটি প্রাচীন স্থান (সচিত্র)'। *প্রবাসী*, ১২(১)। কোলকাতা। ১৩১৯ বঙ্গাব্দ

Souvenir

Haider, Azimusshan. *A City and its Civic Body- A Souvenir to Mark the Centenary of Dacca Municipality, Dacca, 1966.*

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপত্য পরিভাষা

Abacus	শীর্ষ পীঠিকা
Abstract	বিমূর্ত, নির্বস্তুক
Acanthus leaf	অ্যাকান্থাসপত্র
Amleka	আমলকী নকশা
Asile	খিলানপথ, স্তম্ভপথ
Alcove	চোরকুঠরি
Apex	শীর্ষ, চূড়া
Arabesque	আরব্যনকশা (উদ্ভিজ ও জ্যামিতিক নকশা যাতে ফুল, লতা-পাতা ও পাক খাওয়া আঙ্গুর লতা ও কখনও কখনও ক্যালিগ্রাফি যুক্ত করা হয়ে থাকে)
Arcade	খিলানসারি
Arch	খিলান (একটি উন্মুক্ত স্থানকে বঙ্কিম আচ্ছাদন দিয়ে সংযুক্ত করা পরিসর যা ইট পাথর ইত্যাদি দ্বারা কৃত।)
Archaeology	প্রত্নতত্ত্ব
Archaeological site	প্রত্নস্থান
Architect	স্থপতি, স্থাপত্যবিদ
Arrow-slit	শরছিদ্র
Arcuate	খিলান নির্ভর (স্থাপত্য)
Arris	ইটের দুটো তলের মিলিত তীক্ষ্ণ প্রান্ত রেখা
Attic	চিলে কোঠা
Audience hall	হলকক্ষ, সভাকক্ষ, দরবার হল
Axis	অক্ষ
Balcony	ঝুলবারান্দা
Ballflower Design	ত্রিপত্রী নকশা যা পাশ্চাত্য স্থাপত্য থেকে নীত
Balustrade	রেলিং দ্বারা যুক্ত ছোট ছোট পিল্লা শ্রেনী বা ক্ষুদ্র চূড়া বা কলকি নকশা
Base	ভিত্তি, তলদেশ

Dhaka University Institutional Repository

Bastion	বুরুজ, দুর্গ প্রাচীরের বহির্গত অংশ যা পোস্তা বা ঠেকনা দ্বারা নির্মিত
Bay	খিলানপথ, স্তম্ভপথ
Beam	তীর; সর্দল; কড়ি বর্গা
Blind arch	বদ্ধ খিলান
Bond	গাঁথুনি
Bonding-stone	বন্ধনী প্রস্তর
Border	প্রান্ত; সীমা
Bracket	ঠেকনা, ঠেস
Brick	ইট
Brick work	ইটের গাঁথুনী
Builder	নির্মাতা,
Bulbus	কন্দাকৃতি
Baroque	পাশ্চাত্যের স্থাপত্য ও চিত্রকলায় ১৬শ থেকে ১৯শতকে প্রচলিত অতি নকশাধর্মী উপাদান যা রোমক শিল্পকলা থেকে উৎসারিত
Bust	আবক্ষমূর্তি
Buttress	পোস্তা, ঠেকনা, ঠেস
Capital	স্তম্ভশীর্ষ; স্তম্ভচূড়া
Carving	খোদাই কার্য
Cakra	ভারতীয় শিল্পে সূর্য্যের প্রতীক যা বিষ্ণুর অস্ত্রের প্রতিভূ
Ceiling	অভ্যন্তরীনছাদ
Chunam	দেওয়ালে শংখচূনের প্রলেপ
Chini-tikri	চীনামাটির (পেয়ালা) টুকরা দ্বারা আচ্ছাদিত নকশা
Circular	বৃত্তাকৃতি, গোলায়িত
Clerestoy Window	আলো ও বায়ু চলাচলের জানালা
Column	স্তম্ভ, গোলায়িত থাম
Composite column	ধ্রুপদী - গ্রীক শংকর শৈলীর স্তম্ভ
Corbel	ক্রমপ্রলম্বন; ক্রমসর নির্মাণ পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

Corinthian Column	করিন্থীয় স্তম্ভ যা গ্রীক ধ্রুপদী স্থাপত্যের তৃতীয় রীতি নির্ভর স্তম্ভ যার চূড়ার দুপাশে স্তম্ভকুন্ডল থাকে এবং স্তম্ভশীর্ষক নিচ থেকে অলংকৃত এ্যাকান্থাস পত্র দেখা যায়।
Cornice	কার্নিশ
Corridor	সংযোগপথ
Course	সারি সারি ইট পেতে যে গাথুনি তোলা হয়
Court	অঙ্গন, প্রাঙ্গন
Compound pier	একসারি স্তম্ভ মিলে তৈরী যার উপরের অংশে থাকে এনট্যেবলেচার
Console	প্রাচীন স্থাপত্যে ব্যবহৃত এক জাতীয় অলংকারীক ব্রাকেট
Chhotri	ভারতীয় স্থাপত্যে ব্যবহৃত একধরণের গম্বুজ। সাধারণভাবে ছাদেও উপর স্থাপিত অতিরিক্ত অলংকারিক উপাদান
Cupid	অন্ধপ্রেমের ধনুক হাতে দেবতা, পাশ্চাত্য শিল্পকলা হতে নীত
Courtyard	উন্মুক্ত প্রাঙ্গন
Cusp	খাঁজ
Cusped arch	খাঁজযুক্ত খিলান
Dado	ভীতের দেয়ালের নিম্নাংশ যার উপরদিকটা মোল্ডিং কওে অথবা রং এর রেখা দিয়ে এবং নীচের দিকটা স্কাটিং দিয়ে আলাদাথাকে।
Decoration	অলংকরণ
Dalan	সমান্তরাল ছাদ সম্বলিত স্থাপনা, ঔপনিবেসিক যুগে ভারতে এটির প্রচলন হয়
Dentil	দন্ত নকশা
Dome	গম্বুজ; একটি গোলাকার অথবা উপগোলাকার বা বহুভূজ ভিত্তির উপর স্থাপিত গোলাকার বা অর্ধগোলাকার ছাদ
Doric	ডরিক, গ্রীক ধ্রুপদী স্থাপত্যের প্রথম শ্রেনীকরন যার মূলে রয়েছে ভিত্তিহীন ভারি গোলায়িত সরাসরি দন্ডায়মান স্তম্ভ। এ স্তম্ভের শীর্ষদেশে অর্ধগোলাকার বাটি সদৃশ পাথরের পাটা থাকে।
Drawing room	অভ্যর্থনা কক্ষ, বৈঠকখানা

Dhaka University Institutional Repository

Dressing room	বেশকক্ষ, সাজঘর, পোষাকঘর
Drum	পিপা (গম্মুজের)
Elevation	উচ্চতা, একটি সৌধের সম্মুখভাগের ড্রইং
Elongated	লম্বিত
Enclosing wall	বেষ্টনী প্রাচীর
Enclosure	প্রাচীর বেষ্টিত স্থান
Engrailled arch	খাঁজখিলান
Epigraph	শিলালিপি
Entablature	স্থাপত্যের উর্ধ্বাংশের অন্যতম ক্রমবিভাগের তিনটি স্তর । প্রথম অংশ হল আর্কিট্রেভ; মধ্যংশ ফ্রিজ এবং সর্বোপরি কর্ণিশ
Epitaph	সমাধি লেখ
Extrados	খিলান পৃষ্ঠ
Facade	ফাসাদ (ফরাসী), গৃহমুখ, ইমারতের সম্মুভভাগ
False arch	মেকি খিলান
False door	মেকি দরজা
Fanlight	ফ্যানলাইট
Figure	রেখাচিত্র, অবয়ব
Finial	শীর্ষদন্ড
Flashbeam	মেকি আড়কাঠ
Floor	মেঝে
Fluted	শিরাল, পলকাটা
Flying buttress	ঝুলন্ত ঠেস, ঝুলন্ত পোস্তা
Foil	ভাঁজ
Foiled arch	খাজযুক্ত খিলান
Foliated	উৎকীর্ণ পত্রালংকার শোভিত
Foundation	ভিত, ভিত্তি
Fountain	ফোয়ারা, ঝরণা

Dhaka University Institutional Repository

Four-centred	চতুর্কেন্দ্রিক
Frame	কাঠামো
Fresco	দেয়ালচিত্র
Frieze	পাড়নকশা
Gable roof	চালাছাদ; দোচালা ছাদ
Gate	তোরণ; ফটক; দ্বার
Gilt	স্বর্ণমন্ডিত, গিল্টিকরা
Glass mosaic	প্লাস্টার অথবা অন্য কোন জমির উপর রঙ্গিন কাচের টুকরা দ্বারা নকশাকৃত অলংকরণ
Grill	জাফরি
Ground plan	ভূমিনকশা
Guest House	অতিথিশালা
Hall	হলকক্ষ, অভ্যর্থনা কক্ষ
Hemispherical dome	গোলাকার গম্বুজ
Hexagon	ষড়ভূজ ক্ষেত্র
Hexagonal	ষড়ভূজাকৃতি
Horizontal	অনুভূমিক
Horse- shoe arch	অশ্বনালাকৃতি খিলান
Impost	খিলান প্রান্ত স্থাপনের বহির্গত স্থান
Inlay	ভিতরে বসানো (খোদাই করে) ভিন্ন রংএর পাথর অথবা ধাতু
Inscription	লিপি, বিশেষত: খোদাই করা অথবা উৎকীর্ণ তারিখ ইত্যাদি লিপি/সনাক্তকারী
Interior	অভ্যন্তর
Intrados	খিলানগর্ভ
Ionic	আইওনিক, (আইওনীয়) ভিত্তি ও চূড়া সম্বলিত গোলায়িত শিরাল স্তম্ভ যা পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী স্থাপত্যের দ্বিতীয় রীতি।
Iwan	ঈওয়ান, উন্মুক্ত খিলানছাদ

Jalli design	ইট অথবা পাথর দ্বারা নির্মিত ফোকর নকশা
Kachari	জমিদারদের রাজস্ব আদায়ের অফিস; কোন কোন সময় কাচারি বা কাছারি জমিদারদের বহিরাঙ্গনে নির্মিত হত। এটিকে বহির্বাড়িও বলা হতো।
Kalasa motif	পূর্ন কলস নকশা, যা থেকে উদ্ভিজ উত্থিত। এটি জীবন ও প্রাচুর্যের প্রতিক
Kangura	কাঙ্গুরা, কাঙ্গুরা নকশা ক্রমশ সরু ধাপ বিশিষ্ট নকশা
Key stone	বন্ধনী প্রস্তর, শীর্ষ- ভূসোয়াঁ, চূড়াবন্ধনী
Kiosk	ছত্রি
Kirtimukh	ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের একটি বিষয় যা সিংহের মুখোশ সম্বলিত একটি রূপকল্প
Lantern	চতুর্দিকে জানালা বিশিষ্ট ছোট বুরুজ
Lantern ceiling	চাঁদোয়া ছাদ
Lattice	জালি, জাফরি
Lattice window	জানালা
Lintel	সর্দল
Lion- gate	সিংহ দ্বার; ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত ভাস্কর্য
Low relief	স্বল্পোদ্ভুত
Medal	মেডেল, ম্যাডেল
Marble	মার্বেল, মর্মর
Mason	রাজমিস্ত্রি
Masonry	রাজমিস্ত্রির কাজ
Material	উপকরণ, উপাদান
Merlon	পত্রাকৃতি নকশা
Minar	মিনার (আযান দেয়ার স্থান)
Moat	পরিখা
Mortar	জোড়ক মসলা
Mosaic	দেয়াল, মেঝে ইত্যাদিতে ভেজা প্লাস্টারের উপর রঙ্গিন মার্বেল ও পাথর কুচি বসানো পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

Mosque	মসজিদ
Motif	অলংকরণ চিহ্ন বা বিষয়বস্তু
Moulding	ছাঁদ, ছাঁচনকশা
Neo-classical style	পাশ্চাত্যের নব্য ধ্রুপদী শৈলী
Niche	কুলঙ্গি;তাক
Oblong	লম্বাকৃতি
Octagonal	অষ্টকোণী, অষ্টভূজাকৃতি
Open court	উন্মুক্ত অঙ্গন, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, আঙ্গিনা
Orders of Architechture	পাশ্চাত্য ধ্রুপদী রীতির স্থাপত্যে ব্যবহৃত ডরিক, আয়নিক, করেন্থিয়ান ও কম্পোজিট স্তম্ভ।
Oriel window	উদগত জানালা
Outer wall	বহিপ্রাচীর, বর্হিদেয়াল
Painting	চিত্রকলা, রঙচিত্র
Palace	প্রাসাদ, রাজবাড়ি
Palladian style	প্যালাদীয় রীতি যা ভেনিসীয় স্থপতি আন্দ্রে প্যালাদীও (১৫০৮-১৫৮০) প্রচলন করেন। উপর্যক্ত রীতি অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে জনপ্রিয় হয়েছিল।
Panel	প্যানেল, খোপ নকশা, পাটাভাগ
Parapet	বপ্র, ছাদপাঁচিল
Pavilion	চন্দ্রাতপ
Pedestal	স্তম্ভপদ
Pediment	(ছাদের উপরিস্থিত) ত্রিকোণাকার কাঠামো
Pendentive	পেনডেন্টিভ, গম্বুজ নির্মানের সহায়ক বক্র ত্রিকোনাকার অংশ
Pier	চতুষ্কোনী স্তম্ভ
Pilaster	পোস্তা, আয়তাকার স্তম্ভ (সাধারণ দেয়াল হতে বহির্গত)
Pillar	স্তম্ভ, খুঁটি
Plan	ইমারতের নকশা
Platform	প্লাটফরম, মঞ্চ, বেদি

Dhaka University Institutional Repository

Plate	আলোকচিত্র
Plaster	আস্তর, পলেস্তারার আস্তরণ
Plinth	ভিত, পীঠ
Pointed arch	কৌণিক খিলান
Porch	অলিন্দ, চাঁদনি
Portal	দ্বারপথ
Portico	তোরণ, অলিন্দ, চাঁদনি
Projected	অভিক্ষিপ্ত, সামনে বর্ধিত
Railing	রেলিং, বেড়া
Rampart	দুর্গপ্রাকার
Reception Hall	অভ্যর্থনা হলঘর
Recess	কুলঙ্গি
Relief	কাঠ, পাথর বা কোন ধাতুর ইত্যাদির সমতল পৃষ্ঠে নতোন্নত খোদাইকৃত নকশা
Replica	অনুকৃতি
Ribbed	শিরাল
Rococo	১৮৩০ এর দশক থেকে ইউরোপের স্থাপত্য ও অলংকরণ শিল্পে ব্যবহৃত প্রস্তর শীলাগাত্র, উদ্ভিদ ও ঝিনুকের প্রাকৃতিক নকশা থেকে নীত
Ribbed dome	শিরাল গম্বুজ
Roof	ছাদ
Rosette	গোলাপ নকশা
Row	সারি
Sand stone	বেলে পাথর
Sculpture	ভাস্কর্য
Screen	অন্ত:পট পর্দা
Segmental arch	আংশিক বৃত্তাকার খিলান
Semi-circular	অর্ধবৃত্তাকৃতি

Semi-circular arch	অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলান
Shaft	স্তম্ভদন্ড
Slab	ফলক
Soffit (of arch)	খিলানগর্ভ
Solid	নিরেট
Solmanica	পাঁকানো দড়ির মতো স্তম্ভ
Spandrel	খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমি
Springing line	উত্থান রেখা
Spiral	পেঁচানো
Spiral stair	পেঁচানো সিঁড়ি
Stair	সিড়ি, সোপান, সোপানশ্রেণী
Stucco	একধরণের পলেস্তারা, যা কাদামাটি, চুন-বালি মিশ্রনযুক্ত হয়; এটিকে পঙ্কের কাজও বলে
Tapering	ক্রমহ্রাসমান
Tendril	লতাতন্তু; বিসর্পিল লতানকশা
Texture	দেওয়াল, মেঝে ইত্যাদির উপরতলের আস্তরন
Thakur- dalan	সমান্তরাল ছাদবিশিষ্ট মন্দির যা ইন্দো ভারতীয় স্থাপত্যে দেখা যায়
Tie-beam	বন্ধন তীর
Tower	বুরুজ, চূড়া (বড়)
Tri-foiled arch	ত্রিখাজ যুক্ত খিলান
Trippled-aisled entrance	ত্রি-খিলান দ্বার, ত্রি-খিলান বিশিষ্ট প্রবেশপথ, ত্রি-খিলানপথ
Trophy design	উৎকীর্ন করে অথবা চিত্রের মাধ্যমে স্থাপত্যে পতাকা, শিরস্থান, যুদ্ধাস্ত্রের প্রতীক সম্বলিত নকশা।ঔপনিবেসিক আমলে জমিদারবাড়িতেও এ নকশা দেখা যায়
Turret	ক্ষুদ্র চূড়া
Tunel-vault	নলাকৃতি খিলান ছাদ
Two-centered	দ্বিকেন্দ্রিক

Dhaka University Institutional Repository

Undulating	তরঙ্গায়িত
Tympanum	খিলানপটহ
Vault	নলাকৃতি ছাদ
Venetian blind	ভেনিসীয় খড়খড়ি
Ventilator	বায়ুরন্ধ্র
Vertical	উল্লম্ব
Voussoir	খিলান নির্মানে ব্যবহৃত কীলাকৃতির ইট, পাথর ইত্যাদি।
Wall-face	প্রাচীরগাত্র বা দেয়ালগাত্র
Wooden Screen	কাঁঠের অন্ত:পট পর্দা
Yard	অঙ্গন

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

Dhaka University Institutional Repository

জমিদার বাড়ীর তালিকা

১.	রূপলাল হাউজ	ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।
২.	আহসান মঞ্জিল	ইসলামপুর, ঢাকা।
৩.	রোজ গার্ডেন	টিকাটুলী, ঢাকা।
৪.	সূত্রাপুর জমিদারবাড়ি	সূত্রাপুর, ঢাকা।
৫.	রেবতী মোহন লজ	ঢাকা
৬.	শঙ্খনিধি লজ	ঢাকা
৭.	ভজহরি লজ	ঢাকা
৮.	সাভার জমিদার বাড়ি	সাভার, ঢাকা।
৯.	নবাবগঞ্জ জমিদার বাড়ি	নবাবগঞ্জ, ঢাকা।
১০.	রধারমন রায়ের বাড়ি	নবাবগঞ্জ, ঢাকা।
১১.	জজ বাড়ি	নবাবগঞ্জ, ঢাকা।
১২.	শিবরাম পরিবার (তেলীবাড়ি)	নবাবগঞ্জ, ঢাকা।
১৩.	আর, এন হাউজ	নবাবগঞ্জ, ঢাকা।
১৪.	আন্দার কোটা কুঠিবাড়ি	নবাবগঞ্জ, ঢাকা।
১৫.	ভাওয়াল রাজবাড়ি	জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৬.	বলধার জমিদারবাড়ি	বাড়ীয়া, গাজীপুর।
১৭.	পূবাইল জমিদারবাড়ি	পূবাইল, গাজীপুর।
১৮.	শ্রীফলতলী জমিদারবাড়ি	কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
১৯.	বলিয়াদী জমিদারবাড়ি	কালিয়াকৈর, গাজীপুর
২০.	কাশিমপুর জমিদারবাড়ি	সদর, গাজীপুর।
২১.	দত্তপাড়া জমিদারবাড়ি	টঙ্গী, গাজীপুর।

Dhaka University Institutional Repository

২২. তেওতাঁ জমিদারবাড়ি	শিবালয়, মানিকগঞ্জ।
২৩. বালিয়াটি জমিদারবাড়ি	সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ।
২৪. বেতিলা জমিদারবাড়ি	বেতিলা, মানিকগঞ্জ।
২৫. মাচাইন জমিদারবাড়ি	মাচাইন, মানিকগঞ্জ।
২৬. ধানকোরা জমিদারবাড়ি	ধানকোরা, মানিকগঞ্জ।
২৭. মুরাপাড়া জমিদারবাড়ি	রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।
২৮. পানাম নগর	সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ।
২৯. সর্দার বাড়ি	সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ।
৩০. ভূইয়া বাড়ি	আড়াই হাজার, নারায়নগঞ্জ।
৩১. সর্দার বাড়ি	আড়াই হাজার, নারায়নগঞ্জ।
৩২. তেলী বাড়ি	আড়াই হাজার, নারায়নগঞ্জ।
৩৩. বালাপুর জমিদার বাড়ি	সদর, নরসিংদী।
৩৪. পালবাড়ি	টঙ্গীবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ।
৩৫. ঘোষালবাড়ি	টঙ্গীবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ।
৩৬. মধ্যের বাড়ি	শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।
৩৭. বিজয়করের জমিদার বাড়ি	টঙ্গীবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ।
৩৮. টোকানি পালের বাড়ি	মিরকাদিম, মুন্সিগঞ্জ।
৩৯. পূর্ণচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়	সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।
৪০. ঈশ্বর পালের বাড়ি	শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।
৪১. যদুনাথ প্রাসাদ	শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।
৪২. লাবু বাবুর বাড়ি	লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।
৪৩. মদনমোহনের আখড়া	টঙ্গীবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ।
৪৪. মন্ডল বাড়ি	টঙ্গীবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ।
৪৫. বোসদের জমিদার বাড়ি	সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. তারা প্রাসাদ রায়ের বাড়ি	শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।
৪৭. কলমার জমিদার বাড়ি	লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।
৪৮. জিতু ব্যাপারীর বাড়ি	টঙ্গীবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ
৪৯. পুলিন কৃষ্ণ রায় হাউজ	সদর, মুন্সিগঞ্জ।